الطريق إلى البلاغة

এসো বালাগাত শিখি

মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ
শিক্ষক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য
মাদরাসাতুল মাদীনাহ্ আশ্‌রাফাবাদ
লালবাগ, ঢাকা - ১৩১০

প্রকাশনায়

মোহাম্মদী লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

প্রকাশকঃ
মোহাম্মদ এমরান উল্লাহ্
মোহাম্মদী লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

(সর্বস্বত্ব লেখকের)

প্রথম প্রকাশ–
রমযান, ১৪১৯ হিজরী
ডিসেম্বর, ১৯৯৮ ইংরেজী

মুদ্রণে– মোহাম্মদী প্রিন্টিং প্রেস
৪৯, হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা- ১২১১

কম্পিউটার কম্পোজঃ
দারুল কলম কম্পিউটার
মাদরাসাতুল মাদীনাহ্ আশ্‌রাফাবাদ, লালবাগ, ঢাকা-১৩১০

হাদিয়া ঃ ১০০ টাকা মাত্র

পরিবেশনায়

লতীফ বুক করপোরেশন
চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

মোহাম্মদী কতুবখানা
৩৯/১ নর্থ ব্রুক হল রোড বাংলাবাজার, ঢাকা

মোহাম্মদী বুক হাউস
৫০ বাংলাবাজার (চকমার্কেট), ঢাকা - ১১০০

উৎসর্গ

আমার কল্পনার সেই তালিবুল ইলমের উদ্দেশ্যে, যার জিন্দেগী কোরবান হবে ইলমের জন্য, শুধু ইলমের জন্য।

যার লক্ষ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি।

ইলমে নবী, আমলে নবী ও আখলাকে নবী অর্জন করাই হবে তার সাধনা, সারা জীবনের সাধনা।

খেজুর পাতার জীর্ণ চাটাইয়ে বসেও ময়ূর সিংহাসনের শাহানশাহকে যে ছাড়িয়ে যাবে চিন্তার উচ্চতায়, হৃদয়ের প্রশস্ততায় এবং ঈমান ও বিশ্বাসের দৃঢ়তায়।

আমার কল্পনার সেই তালিবুল ইলমের পবিত্র হাতে এ ক্ষুদ্র উপহার তুলে দিয়ে আমি ধন্য হতে চাই।

কিন্তু মৃত্যুর আগে আমি কি পাবো তার দেখা ?

মাদানী নেছাবের অন্যান্য বই

(١) الطريق إلى العربية في ثلاثة أجزاء

(٢) الطريق إلى النحو

(٣) الطريق إلى الصرف

(٤) الأيات المنتخبة

(٥) التمرين الكتابي على الطريق إلى العربية

للمطالعة

(١) حياة الرسول صلى الله عليه وسلم

(٢) الباحث عن الحق

(٣) فوق الصليب

(٤) أحد .. أحد

ভূমিকা

আল হামদুলিল্লাহ, ছুম্মা আল-হামদুলিল্লাহ। রাব্বে কারীমের অসীম রহমতে আগামী রমযানে মাদরাসাতুল মাদীনাহর জন্মলাভের এক দশক পূর্ণ হতে চলেছে এবং এই শুভ মুহূর্তে الطريق إلى البلاغة প্রথম খণ্ড আত্মপ্রকাশ করছে।

আল্লাহ তাআলার খাছ ফজল ও করম, অতঃপর আম্মা আব্বার দুআ এবং আসাতিযায়ে কেরামের ছোহবত ও তারবিয়াত থেকে যে সকল চিন্তা ও চেতনা এবং জ্ঞান ও ভাবনা হৃদয়ে অংকুরিত হয়েছে তার বাস্তবায়নের সুমহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে দশটি সুচিন্তিত কর্মসূচী নিয়ে মাদরাসাতুল মাদীনাহ জন্মলাভ করেছে। বস্তুত মাদরাসাতুল মাদীনাহ কোন 'স্থূল অস্তিত্বের' নাম নয়; বরং আল্লাহ প্রদত্ত কিছু চিন্তা ও কর্মসূচী এবং তার বাস্তবায়ন প্রচেষ্টারই নাম مدرسة المدينة। আর এ পথে যারা নিবেদিত প্রাণ তারাই হলো أنصار مدرسة المدينة

যাই হোক, মাদরাসাতুল মাদীনাহর 'দশ কর্মসূচীর' অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হলো যুগের চাহিদা ও প্রয়োজন এবং বিজাতীয় শিক্ষার আগ্রাসন মুকাবেলার সুদূর প্রসারী উদ্দেশ্যে المنهج المدني বা মাদানী নেছাব নামে একটি পূর্ণাঙ্গ তালীমী নেছাব প্রণয়ন, যার শিক্ষাকাল ও স্তর বিন্যাস হবে নিম্নরূপ–

(ক) مرحلة الابتدائية (বা প্রাথমিক স্তর) চার বছর।

(খ) مرحلة المتوسطة (বা মাধ্যমিক স্তর) চার বছর।

(গ) مرحلة العالية (বা উচ্চ স্তর) তিন বছর।

(ঘ) مرحلة الإعادة (বা পুনঃঅধ্যয়ন স্তর) দুই বছর। (একজন শিক্ষার্থী العالية এর পূর্বেও এ স্তরে ভর্তি হতে পারে।)

(ঙ) مرحلة التخصص في العلوم (বা বিষয় ভিত্তিক উচ্চতর শিক্ষার স্তর) তিন বছর। মোট ষোল বছর।

সুতরাং এ সত্য সকলকে আত্মস্থ করতে হবে যে, মাদানী নেছাব তথাকথিত সর্টকোর্স জাতীয় কোন 'পদার্থ' নয়, বরং আমরা যে মহান নেছাবে তালীমের ক্ষুদ্র ফসল সেই দরসে নেযামীর 'প্রাণ ও প্রেরণা' সযত্নে সংরক্ষণপূর্বক শুধু পদ্ধতিগত সংস্কার সাধনই হলো মাদানী নেছাবের উদ্দেশ্য।

পরিবর্তনশীল বর্তমানের মাধ্যমে গৌরবময় অতীত এবং মর্যাদাপূর্ণ ভবিষ্যতের মাঝে সংযোগ রক্ষাই হলো দরসে নেযামীর মূল শিক্ষা এবং মহান আকাবীরগণের দীক্ষা, আর মাদানী নেছাবের উদ্দেশ্য হলো এর সুরক্ষা। আল্লাহ কবুল করুন এবং মাকবুল করুন। আমীন!

হয়ত কোন দিন প্রয়োজন হবে, তাই কথাগুলো প্রসংগত আজ 'কাগজের বুকে' আমানত রাখা হলো। কেননা (মরহুম মাওলানা মন্‌জুর নোমানীর ভাষায়) কাগজ অতি দুর্বল কিন্তু বড় বিশ্বস্ত।

তবে জীবন যদি বিশ্বাস ভংগ না করে এবং আল্লাহর তাওফীক যদি সংগ দান করে তাহলে 'মাদানী নেছাব কি ও কেন' নামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে এর পরিচয় ও রূপরেখা তুলে ধরার নিয়ত রয়েছে, ইনশাআল্লাহ।

এখন মূল প্রসংগে ফিরে আসি। المنهج المدني (বা মাদানী নেছাব) এর متوسطة স্তরের জন্য যে ক'টি গ্রন্থ প্রণয়ন অপরিহার্য তন্মধ্যে الطريق إلى البلاغة হচ্ছে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিতাব।

আল্লাহর কালাম কোরআনের মূল إعجاز হলো বালাগাত। সুতরাং বালাগাতের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও রুচি অর্জন ছাড়া কালামুল্লাহর إعجاز অনুধাবন করা সম্ভব নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই বালাগাত জ্ঞান ও অলংকার রুচি আমাদের মাঝে ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং علم البلاغة এর চর্চা ও অধ্যয়নে শৈথিল্য ও অনুদ্যম দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, যা খুবই উদ্বেগজনক। আশা করি চিন্তাশীল সকলেই উদ্বিগ্নচিত্তে এই সুরতেহাল প্রত্যক্ষ করছেন এবং সম্ভাব্য সমাধানও চিন্তা করছেন। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র চিন্তা ও বিনীত প্রচেষ্টার ফসল

الطريق إلى البلاغة কিতাবখানা সংশ্লিষ্ট সকলের খিদমতে পেশ করছি।

'প্রত্যেক শাস্ত্রের প্রথম কিতাব মাতৃভাষায় হওয়া বাঞ্ছনীয়'– মাদানী নেছাবের এই মৌলিক চিন্তার সাথে সংগতি রেখে প্রথমে বিষয় বস্তুর আলোচনা এবং বিভিন্ন উদাহরণের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা বাংলায় করা হয়েছে; তবে উচ্চতর শাস্ত্র হিসাবে মূল বক্তব্যটুকু خلاصة الكلام নামে আরবীতে উপস্থাপন করা হয়েছে। নেছাবী কিতাবের ক্ষেত্রে এ অভিনব পদ্ধতির প্রয়োগ আমাদের পাক ভারত উপমহাদেশে সম্ভবতঃ এটাই প্রথম তবে গত দু' বছর মাদরাসাতুল মাদীনায় এর পঠন-পাঠনের যে পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে তাতে আশা করা যায় যে, বালাগাত শাস্ত্রের সাথে শিক্ষার্থীদের সুনিবিড় পরিচয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বইটি ইনশাআল্লাহ প্রত্যাশিত সুফল প্রদান করবে।

প্রথম খণ্ডে علم المعاني অংশটুকু শুধু এসেছে। অন্য খণ্ডে البيان ও البديع আলোচনা করার এবং সেই সাথে প্রয়োজনীয় تمرينات সম্বলিত একটি সহায়ক গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা রয়েছে। আল্লাহ তাওফীক দান করুন।

মাদানী নেছাবের সুদীর্ঘ কাজ এখনো চিন্তা ও স্বপ্নের আকারেই রয়ে গেছে। জানি না তার বাস্তব রূপ দেখে যেতে পারবো কি না কিংবা কোন 'বিশ্বস্ত বন্ধুর' হাতে দায়িত্ব অর্পণ করে যেতে পারবো কি না। সময় ও স্বাস্থ্য যেমন দ্রুত ফুরিয়ে আসছে এবং যন্ত্রণা ও নিঃসংগতাবোধ যেভাবে কর্মোদ্যম গ্রাস করে চলেছে তাতে বড় আশংকা হয়, আবার আল্লাহর অসীম রহমত ও করুণার কথা স্মরণ করে আশার ঝিলিকও দেখতে পাই।

ইলম ও ইলমী মেহনত যারা ভালোবাসেন তাদের খিদমতে মুখলিছানা দু'আর জন্য দরদপূর্ণ আবেদন রইল। আল্লাহ যেন আরব্ধ সকল কাজ সুসম্পন্ন করার তাওফীক দান করেন এবং ঈমান ও আমানের সাথে দুনিয়া থেকে তুলে নেন। আমীন। হে আল্লাহ! তোমার যে বান্দা গায়েবানা আমীন বলবে তাকেও তুমি উত্তম জাযা দান করো।

মুহতাজে রহমতে হক
আবু তাহের মেছবাহ
১৩ / ৮ / ১৯ হিঃ

একটি কথা– মাদরাসাতুল মাদীনাহ এবং মাদানী নেছাব-এর ন্তা ও দর্শন (সম্ভবতঃ সবটুকু না বুঝেও) যিনি শুধু বিশ্বাস ও ভক্তির ভিত্তিতে মুহব্বত করেন তিনি আমার প্রিয় দোস্ত হাবীবুল্লাহ। কঠিন ও জটিল রোগে তিনি এখন মুমূর্ষ অবস্থায় শয্যাশায়ী। গতকাল হাসপাতালে তাকে যখন الطريق إلى البلاغة এর কপি প্রেসের জন্য প্রস্তুত হয়েছে বলে জানালাম। তিনি তখন বললেন, হায়াত মাওতের কথা তো বলা যায় না, কপিটা হাসপাতালে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। এই 'দ্বীনী সম্পদ' আমি নিজের চোখে দেখে যেতে চাই, তারপর আমিই প্রেসে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো।

বলুন, এ মুহব্বতের জাযা আল্লাহ ছাড়া কে দিতে পারেন!

আমি তার হায়াত ও ছিহ্হতের জন্য সকলের খেদমতে দুআ প্রার্থী।

– আবু তাহের মেছবাহ
১৪ / ৮ / ১৯ হিঃ

গুরুত্বপূর্ণ যে সকল কিতাব থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে

১. البلاغة العربية ঃ লেখক, আব্দুর রহমান হাসান হাবান্নাকা আল-মাদানী (দুখণ্ডে সমাপ্ত বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনামূলক অত্যন্ত মূল্যবান বালাগাত গ্রন্থ।)

২. البلاغة فنونها و أفنانها ঃ ডঃ ফজল হাসান আব্বাস।

৩. البلاغة تطور و تاريخ ঃ ডঃ শাওকী যায়ফ(বালাগাতের ক্রম বিবর্তনের ইতিহাস সম্বলিত মূল্যবান গ্রন্থ)

৪. المنهاج الواضح للبلاغة ঃ আল উস্তায হামিদ আওনী

প্রাচীন উৎসগ্রন্থগলোর সার নির্যাস রূপে রচিত।

৫. علوم البلاغة ঃ আহমদ মুস্তফা আলমারাগী।

৬. علم المعاني ঃ ডঃ আব্দুল আযীয আতীক।

৭. فن البلاغة ঃ ডঃ আব্দুল কাদির হোসায়ন।

৮. البلاغة العربية في ثوبها الجديد ঃ বাকরী শায়খ আমীন।

৯. موسوعة البلاغة

১০. المفصل في علم البلاغة

১১. دروس البلاغة

১২. البلاغة الواضحة

(প্রায়োগিক বালাগাতের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত, অনুশীলন ভিত্তিক গ্রন্থ)

১৩. تلخيص المفتاح

১৪. مختصر المعاني

১৫. دلائل الإعجاز

১৬. جواهر البلاغة ঃ আহমদ আল-হাশিমী।

بسم الله الرحمن الرحيم

محتويات الكتاب

تعريف علم البلاغة ١
الفصاحة و البلاغة ٣
فصاحة الكلمة ٣
(تنافر الحروف، الغرابة مخالفة القياس)
فصاحة الكلام ٥
(تنافر الكلمات، ضعف التاليف، التعقيد اللفظي و المعنوي)
فصاحة المتكلم ١٠
تعريف البلاغة ١٠
بلاغة الكلام ١١
بلاغة المتكلم ١٣
علم المعاني ١٦

الباب الأول

في الخبر و الإنشاء ١٨
معاني الجملة الإسمية و الفعلية ٢١
أغراض الخبر ٢٤
طرق إلقاء الخبر ٢٩
إخراج الكلام عن مقتضى الظاهر ٣٢
الكلام على الإنشاء ٣٦
أقسام الإنشاء الطلبي ٣٩
مبحث الأمر ٣٩
مبحث النهي ٤٤
مبحث الإستفهام ٤٧
(هل و همزة الاستفهام)
بقية أدوات الإستفهام ٥٢
مبحث التمني ٥٦
(معنى الترجي، أداة التمني و أدوات الترجي)
مبحث النداء ٦٩

الباب الثاني

الذكر و الحذف ٧٥
(دواعي الذكر)
الحذف و أقسامه ٨٤
دواعي الحذف ٨٦

الموضوع الصفحة

الباب الثالث

التقديم و التاخير ٩٣
(مواضع التقديم)

الباب الرابع

في التعريف و التنكير ١٠٥
العلم ١١١
اسم الإشارة ١١٤
الموصول ١٢٢
المعرف بأل ١٢٩
الإضافة ١٣٥
النكرة ١٣٩

الباب الخامس

في التقييد ١٤٢
التقييد بالتوابع ١٤٥
التقييد بالنعت ١٤٦
غرض التقييد بالتوكيد ١٤٧
غرض التقييد بعطف البيان ١٤٨
غرض التقييد بالبدل ١٤٩
التقييد بضمير الفصل ١٥٠
التقييد بالشرط ١٥٢
(الفرق بين إن و إذا - معنى لو)

الموضوع الصفحة

الباب السادس

في القصر ١٦٠
قصر صفة على موصوف و عكسه ١٦٢
القصر الحقيقي - القصر الإضافي ١٦٤

الباب السابع

الفصل و الوصل ١٧٠
مواضع الفصل ١٧١
مواضع الوصل ١٨٩

الباب الثامن

في الإيجاز و الإطناب و المساواة ١٨٤
أقسام الإيجاز ١٩١
الإطناب و دواعيه ١٩٩
الخاتمة ٢٢١
(في إخراج الكلام عن مقتضى الظاهر)

بسم الله الرحمن الرحيم

علم البلاغة

আমরা এখন যে শাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করবো সে শাস্ত্রের নাম عِلمٌ البَلاغَة বাংলায় এর নাম 'অলংকারশাস্ত্র'

যে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন শুরু করার পূর্বে উক্ত শাস্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত কিছু জরুরী বিষয় জেনে রাখা দরকার, যাতে উক্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও চর্চা সহজ হয়।

সুতরাং প্রথমেই আমরা বালাগাত শাস্ত্রসম্পর্কিত কিছু জরুরী বিষয় আলোচনা করবো।

আরবী ভাষার সাথে বেশ কিছু শাস্ত্রের সম্পর্ক রয়েছে, এগুলোকে عُلوم العَرَبِيَّةِ বলা হয়। যেমনঃ

علم الصرْف - علم النحْو - علم الإمْلاء - علم العَروض - علم البلاغة

ইত্যাদি।

علم الصرف এর সম্পর্ক হলো শব্দ কাঠামোর সংগে।

علم النحو এর সম্পর্ক হলো বাক্য কাঠামোর সংগে।

علم الإملاء এর সম্পর্ক হলো হস্তলিপির সংগে।

علم العروض এর সম্পর্ক হলো কবিতা ও ছন্দের সংগে।

علم البلاغة এর সম্পর্ক হলো ভাব ও মর্মের সুন্দর ও সঠিক প্রকাশের সংগে।

علم البلاغة এর পরিচয়

علم البلاغة মূলতঃ البيان – المَعاني ও البَديع! এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত। এ জন্য তাকে عُلوم البلاغة ও বলা হয়। অর্থাৎ বালাগাতশাস্ত্রের তিনটি শাখার স্বতন্ত্র রূপ বিবেচনা করে علوم البلاغَة এবং তিনটি শাখার সম্মিলিত রূপ বিবেচনা করে علم البلاغة বলা হয়।

সুতরাং البَيان – المعاني ও البديع - এই তিনটি বিষয়ের আলাদা আলাদা পরিচয় জানলে علم البلاغة এর পরিচয় জানা হয়ে যাবে।

তবে মৌলিকভাবে বলা হয় যে, যে নিয়মাবলী অনুসরণ করলে মনের ভাব ও মর্ম শুদ্ধ, বিশুদ্ধ ও সুন্দর ভাষায় স্থান, কাল ও পাত্রের উপযোগী রূপে প্রকাশ করা যায় সেই নিয়মাবলী জানাকে علم البلاغة বলে।

এবার علم البلاغة এর তিনটি শাখার আলাদা আলাদা পরিচয় পেশ করা যাক।

علم المَعاني :

যে সকল নিয়ম-কানুন অনুসরণ করলে শব্দ ও বাক্য তথা মানুষের যাবতীয় কথা مُقتَضَى الحالِ অনুযায়ী হয়, অর্থাৎ স্থান, কাল ও পাত্রের চাহিদা অনুযায়ী হয়।

এ শাস্ত্রের মৌলিক আলোচ্যবিষয় হলো, বাক্য কত প্রকার এবং সেগুলোর উদ্দেশ্য কি কি? বাক্যের কোন্ অংশ অগ্রগামী এবং কোন্ অংশ পশ্চাদবর্তী হবে, কোন্ অংশ উহ্য এবং কোন্ অংশ উক্ত হবে, কোন্ শব্দের মূল অর্থ কি এবং ব্যবহৃত অর্থ কি? তদ্রূপ দুটি বাক্য কখন সংযুক্ত হবে, কখন বিযুক্ত হবে, ইত্যাদি।

علم البيان :

যে সকল নিয়ম-কানুন অনুসরণ করলে একটি ভাব ও মর্মকে বিভিন্ন রূপে প্রকাশ করা যায়। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট অর্থটি স্পষ্ট হয়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন হয়। যেমন, রাশেদ অতিথিপরায়ণ-এই বাক্যে উদ্দিষ্ট অর্থটি স্পষ্ট। পক্ষান্তরে রাশেদের বাড়ীতে দিন-রাত রান্না হয়-এ বাক্যে উদ্দিষ্ট অর্থটি প্রচ্ছন্ন।

এ শাস্ত্রে উপমা, রূপকার্থ ও ইঙ্গিতার্থ[১] নিয়ে আলোচনা করা হয়।

علم البديع :

যে নিয়ম কানুন অনুসরণ করলে مُقْتَضَى الحالِ অনুযায়ী কথিত كلام এর শব্দগত ও অর্থগত সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

বালাগাতের মূল উদ্দেশ্য হল, কালাম ও কথা مقتضى الحال অনুযায়ী হওয়া। কালামের শব্দগত ও অর্থগত সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হলো পার্শ্ব বিষয়।

সুতরাং عِلم المعاني ও علم البَيان হলো মূল উদ্দেশ্য, আর علمُ البَدِيعِ হলো পার্শ্ব উদ্দেশ্য।

الفَصاحَةُ وَ البَلاغَةُ

এবার আমরা فَصاحَة ও بَلاغَة শব্দ দুটি সম্পর্কে আলোচনা করবো।

فصاحة শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো সুস্পষ্টতা ও সুপ্রকাশ। তাই যখন ভোরের আলো ফুটে উঠে এবং সব কিছু স্পষ্ট হয়ে যায় তখন বলা হয়- أَفْصَحَ الصُّبْحُ (ভোর ফর্সা হলো।) তদ্রূপ শিশু যখন সুস্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলে তখন বলা হয়- أَفْصَحَ الصَّبِيُّ في مَنْطِقِه (শিশুটি স্পষ্ট উচ্চারণে কথা বলেছে।)

علم البلاغة বা অলংকারশাস্ত্রের পরিভাষায় فَصاحة শব্দটি كَلِمَة - كلام ও متكلم এর وَصْف বা বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয় এবং বলা হয়, كَلِمَة فَصِيحَة (বিশুদ্ধ শব্দ) كلام فَصِيح (বিশুদ্ধ কথা) مَتَكلِّم فصيح (বিশুদ্ধভাষী)

সুতরাং আমরা যথাক্রমে فَصاحَةُ الكلام - فَصاحَةُ الكَلِمَة ও فَصاحَةُ المتَكَلِّم সম্পর্কে আলোচনা করবো।

فصاحَةُ الكَلِمة

غَرابَة ও مُخالَفَة القِيَاسِ، تَنافُرُ الحروفِ এই তিনটি فصاحة الكلمة অর্থ

---

১ (ক) রাশেদ সিংহের মত সাহসী- এখানে রাশেদকে সিংহের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে।

(খ) মাথা পিছু এক টাকা দাও- এখানে মাথাকে মানুষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা রূপক অর্থ।

(গ) রাশেদের বাড়ীতে দিনরাত রান্না হয়। এর অর্থ সে খবু অতিথি পরায়ন। এটা ইঙ্গিতার্থ।

দোষ থেকে কোন শব্দের মুক্ত হওয়া। সুতরাং فصاحة الكلمة বুঝতে হলে এ তিনটি বিষয় আমাদের বুঝতে হবে।

১। تنافر الحروف (বর্ণগুচ্ছের অমিল) অর্থ কোন শব্দের এমন অবস্থা যা শ্রুতিকটুতা ও উচ্চারণকঠিনতা সৃষ্টি করে।

শব্দ যখন تنافر الحروف থেকে মুক্ত হয় তখন তার উচ্চারণ সহজ ও শ্রুতিমধুর হয়। পক্ষান্তরে কোন শব্দে تنافر الحروف থাকলে তার উচ্চারণ কঠিন ও শ্রুতিকটু হয়। সুতরাং تنافر الحروف হলো শব্দের একটি দোষ।

দেখ, دِيْمَة ও مُزْنَة শব্দ দুটির অর্থ হলো বর্ষণশীল মেঘ। بُعَاق শব্দটি একই অর্থবিশিষ্ট।

প্রথম শব্দদুটির উচ্চারণ সহজ ও শ্রুতিমধুর, কিন্তু بعاق শব্দটির উচ্চারণ তুলনামূলক কঠিন ও শ্রুতিকটু।সুতরা প্রথম শব্দদু'টি تنافر الحروف থেকে মুক্ত, কিন্তু শেষ শব্দটিতে تنافر الحروف রয়েছে।

বাংলায় অদ্ভূত ও কিম্ভূতকিমাকার শব্দ দুটি সমার্থক, কিন্তু দ্বিতীয় শব্দটির উচ্চারণ কঠিন ও শ্রুতিকটু।

২। مخالفة القياس অর্থ কোন শব্দ صرف এর নিয়মবহির্ভূত হওয়া। যেমন ধরো, বিখ্যাত কবি মুতানাব্বী তার এক কবিতায় بُوْقٌ এর جَمْعُ القِلَّة বা নিম্ন-বহুবচন রূপে بُوْقَات ব্যবহার করেছেন। অথচ صرف এর নিয়ম অনুযায়ী بوق এর جمعُ القِلة হওয়ার কথা ছিল أَبْوَاق – সুতরাং শব্দটি فصيح নয়, তাতে فصاحة নেই।

তদ্রূপ অন্য এক কবি আপন পুত্রদের নিন্দা করে বলেছেন–

إِنَّ بَنِيَّ لَلِئَامٌ زَهَدَة + مَا لِيْ فِي صُدورِهِمْ مَوْدِدَة

অথচ صرف এর নিয়ম অনুযায়ী مَوْدِدَة শব্দটি ইদগামের সাথে مَوَدَّة হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং صرف এর নিয়মবহির্ভূত হওয়ার কারণে শব্দটি فصيح হলো না।

৩। غَرابَة অর্থ শব্দটি অপরিচিত হওয়া এবং তার ব্যবহার বিরল হওয়া। যেমন, تَكَأْكَأَ ও اِجْتَمَعَ শব্দ দুটি সমার্থক। কিন্তু اجتمع শব্দটি যেমন বহুল

ব্যবহৃত ও বোধগম্য تَكَأْكَأَ শব্দটি তেমন নয়। সুতরাং اِجْتَمَعَ শব্দটি غَرَابَة থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে فصيح কিন্তু تَكَأْكَأَ শব্দটিতে غَرَابَة থাকার কারণে তা فصيح নয়।

মোটকথা, আলোচ্য শব্দগুলোতে فصاحة না থাকার কারণ হচ্ছে تَنَافُرُ الحُروفِ কিংবা مُخالَفَةَ القِياس কিংবা غرابة

فَصَاحَةُ الكَلَامِ

فصاحة الكلام : কোন কালাম فصيح হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো কালামের প্রতিটি কালিমা فصيح হওয়া। তাই

مُبَارَكُ الاسْمِ أَغَرُّ اللَّقَبْ + كَرِيمُ الجِرِشَّى شَرِيْفُ النَّسَبْ

এ কালামে فصاحة নেই। কেননা এখানে একটি শব্দ فصيح নয়। তবে কোন্ শব্দটি কি দোষের কারণে فصاحة বিহীন হয়েছে সেটা তোমরা খুঁজে বের করো।

فصاحة الكلام এর জন্য দ্বিতীয় শর্ত হলো কালামটি تَنافُرُ الكَلِمَاتِ থেকে মুক্ত হওয়া।

تنافر الكلمات অর্থ বাক্যস্থ প্রতিটি কালিমার আলাদা উচ্চারণ সহজ ও শ্রুতিমধুর হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোর একত্র উচ্চারণ কঠিন ও শ্রুতিকটু হওয়া।

উদাহরণ রূপে নিম্নোক্ত কবিতাটি দেখো–

وَ قَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرٌ + وَ لَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرٌ

হারবের কবর এক নির্জন ভুমিতে, হারবের কবরের ধারে কাছে আর কোন কবর নেই।

এখানে প্রতিটি শব্দ আলাদাভাবে فصيح কেননা প্রতিটি শব্দের আলাদা উচ্চারণ সহজ ও শ্রুতিমধুর। অর্থাৎ কোন শব্দেই تنافر الحروف নেই। কিন্তু হরফগুলো নিকট মাখরাজের হওয়ার কারণে শব্দগুলোর একত্র উচ্চারণ কঠিন ও শ্রুতিকটু হয়ে গেছে।

একইভাবে নিম্নোক্ত কবিতাটি দেখ–

كَرِيمٌ مَتَى أَمْدَحْهُ أَمْدَحْهُ وَ الْوَرَى مَعِيْ + وَ إِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُهُ وَحْدِيْ

(তিনি) এমন মহানুভব ও সর্বজন প্রিয় যে, আমি যখন তার প্রশস্তি গাই গোটা সৃষ্টি তখন আমার সাথে সুর মিলায় কিন্তু কখনো যদি নিন্দা করি তখন আমি একাই করি।

এখানে ح ও ه এ দুটি হরফে হালক্বীর একত্র সমাবেশ ও পুনরুক্তির কারণে কঠিন ও শ্রুতিকটু হয়েছে। অথচ প্রতিটি শব্দের আলাদা উচ্চারণ কঠিনও নয়, শ্রুতিকটুও নয়। বলাবাহুল্য যে, أَمْدَحْهُ কথাটির পুনরুক্তি না হলে কোন অসুবিধা ছিল না। যেমন কোরআন শরীফে فَسَبِّحْهُ বাক্যটিতে ح ও ه দুটি হরফে হালক্বী একত্র হয়েছে। কিন্তু পুনরুক্তি না ঘটায় তাতে تنافر الكلمات হয়নি।

বাংলায় تنافر الكلمات এর উদাহরণ হিসেবে 'কাচা গাব পাকা গাব' কথাটা পেশ করা হয়ে থাকে।

কোন কালাম فصيح হওয়ার জন্য তৃতীয় শর্ত হলো ضعف التاليف থেকে মুক্ত হওয়া।

ضَعْفُ التَّالِيْفِ অর্থ نحو বা ব্যাকরণের সুপ্রচলিত নিয়ম থেকে বাক্যের বিচ্যুতি ঘটা। যেমন ব্যাকরণের একটি স্বীকৃত নিয়ম এই যে, ضَمِيرُ الغَائِبِ এর مَرْجِع সর্বদা উচ্চারণে কিংবা মর্যাদায় অগ্রবর্তী হবে। উভয় ক্ষেত্রে পরবর্তী হতে পারবে না। যেমন, دَعَى الوَلَدُ صَدِيقَه এখানে ه যমীরের مرجع হলো الولد শব্দটি। আর তা উচ্চারণের দিক থেকে যেমন ه যমীর থেকে অগ্রবর্তী তেমনি মর্যাদার দিক থেকেও ه যমীর থেকে অগ্রবর্তী। কেননা ফায়েলের মর্যাদাগত অবস্থান মাফউলের পূর্বে।

আবার দেখ, دَعَى صديقه الوَلَدُ বাক্যটিতেও ব্যাকরণের বিচ্যুতি ঘটেনি। কেননা যমীরের مرجع উচ্চারণে পরবর্তী হলেও অবস্থানগত মর্যাদার দিক থেকে পূর্ববর্তী হয়েছে। কেননা ফায়েলের মর্যাদাগত অবস্থান মাফউল থেকে অগ্রবর্তী। তদ্রূপ دَعَى الولَدَ صديقُه বাক্যটিতেও নিয়মের বিচ্যুতি ঘটেনি। কেননা যমীরের مرجع তথা الولد শব্দটি মাফউল হওয়ার কারণে অবস্থানগত মর্যাদার দিক থেকে যমীরের পরে হলেও উচ্চারণে তা যমীর থেকে অগ্রবর্তী হয়েছে। সুতরাং এই তিনটি বাক্য ضعف التاليف থেকে মুক্ত হওয়ার কারণে فصيح হয়েছে। অবশ্য

প্রথম বাক্যটি সর্বোত্তম। কিন্তু নিম্নোক্ত কবিতাটি লক্ষ্য কর–

جَزَى بَنُوه أَبالغَيْلانِ عَنْ كِبَر + وَ حُسْنِ فِعْلٍ كَمَا يُجْزَى سِنِمَّارُ

আবুল গায়লানকে তার পুত্ররা তার বার্ধক্য ও সদাচার সত্ত্বেও এমন (মন্দ) প্রতিদান দিয়েছে যেমন সিন্‌মার (এর মত লোকদের)-কে যুগে যুগে দেওয়া হয়।

এখানে بنوه এর যমীর أبالغيلان এর দিকে راجع হয়েছে। অথচ তা উচ্চারণেও যমীর থেকে পশ্চাদ্‌বর্তী আবার অবস্থানগত মর্যাদার দিক থেকেও যমীর থেকে পশ্চাদ্‌বর্তী। কেননা أبالغيلان হলো مفعول আর بنوه হলো ফায়েল। আর মাফউলের মর্যাদাগত অবস্থান ফায়েলের পরে। সুতরাং ضعف التاليف এর কারণে আলোচ্য পংক্তিটি فصيح নয়।

فصاحة الكلام এর জন্য চতুর্থ শর্ত হলো কালাম التَّعْقِيدُ اللَّفْظِيُّ থেকে মুক্ত হওয়া।

تعقيد لَفْظِي অর্থ বিন্যাসগত বিশৃংখলার কারণে[১] বাক্যের উদ্দিষ্ট অর্থ অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হয়ে যাওয়া। উদাহরণ হিসাবে কবি মুতানাব্বীর নিম্নোক্ত কবিতাটি দেখ–

جَفَخَتْ وَ هُمْ لا يَجْفَخونَ بِهابِهِمْ + شِيَمٌ عَلَى الحَسَبِ الأَغَرِّ دَلائِلُ

অভিজাত বংশ মর্যাদার প্রমাণ যে সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য তা তাদেরকে নিয়ে গর্ব করে কিন্তু তারা সেগুলো নিয়ে গর্ব করে না।

এখানে বাক্যের প্রকৃত বিন্যাস হবে নিম্নরূপ–

جَفَخَتْ بِهِمْ شِيَمٌ دَلائِلُ عَلَى الحَسَبِ الأَغَرِّ وَ هُمْ لا يَجْفَخُوْنَ بِها

দেখ, **فعل** ও **فاعل** সংলগ্ন থাকার কথা, কিন্তু এখানে উভয়ের মাঝে বেশ দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। তদ্রূপ بهم এর تعلق হলো جفخت এর সংগে, অথচ উভয়ের

---

[১] যেমন ধর, বাক্যের কোন শব্দকে তার নিজস্ব স্থান থেকে আগে বা পরে নিয়ে যাওয়া কিংবা যে শব্দ দুটি একত্র থাকার কথা ছিল সে দুটিকে فصل বা পৃথক করা, যার কারণে বাক্যটির অর্থ দুর্বোধ্য হয়ে যায়।

মাঝে فصل হয়েছে। আবার على الحسب الأغر এর تعلق হলো دلائل এর সংগে। অথচ সেটাকে دلائل এর উপর অগ্রবর্তী করা হয়েছে। এ ধরনের একাধিক বিন্যাসগত বিশৃংখলা বা تعقيد لفظي এর কারণে বাক্যের উদ্দিষ্ট অর্থ অস্পষ্ট ও দূর্বোধ্য হয়ে গেছে।

বাংলায় এর উদাহরণ হলো, তিনি বিশিষ্ট বাংলাদেশের লেখক, এ বাক্যটি فصيح নয়। কেননা ‘বিশিষ্ট’ বিশেষণটির সম্পর্ক লেখকের সংগে। অথচ এখানে উভয়ের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করায় تَعقِيدِ لفظي এর কারণে তার উদ্দিষ্ট অর্থ বোঝা কষ্টকর হয়ে গেছে। এর ফাসীহ্ রূপ হলো, তিনি বাংলাদেশের বিশিষ্ট লেখক।

কোন কালাম ফাসীহ্ হওয়ার জন্য পঞ্চম ও সর্বশেষ শর্ত হলো- تَعقِيدِ مَعْنَوِي থেকে মুক্ত হওয়া।

تعقيد معنوي অর্থ কোন ভাব প্রকাশের জন্য অপ্রচলিত مَجاز (রূপকার্থ) এবং অপ্রচলিত كِنايَة (ইংগিতার্থ) ব্যবহার করা, যার ফলে উদ্দিষ্ট অর্থ বোঝা কষ্টকর হয়ে পড়ে।

উদাহরণ দেখ-

১. لِسان শব্দটির حقيقي অর্থ হলো জিহ্বা। শব্দটিকে مَجازي (ও রূপক) ভাবে ভাষা অর্থেও ব্যবহার করা হয়। যেমন কোরআন শরীফে এসেছে-

وَ مَا اَرْسَلْنا مِنْ رَسولٍ اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِه

আমি কোন রাসূল প্রেরণ করিনি কিন্তু এমন অবস্থায় যে, তিনি তার জাতির ভাষায় কথা বলতেন।

এটা শুদ্ধ ও বিশুদ্ধ ব্যবহার। কেননা لسان কে রূপকভাবে ভাষা অর্থে ব্যবহার করার সুপ্রচলন রয়েছে। لسان -এর এই مجازي বা রূপক অর্থটি সুপ্রচলিত।

কিন্তু কেউ যদি لسان কে রূপকভাবে গুপ্তচর-অর্থে ব্যবহার করে বলে, نَشَرَ المَلِكُ أَلْسِنَتَـه فِي المَدِيْنَةِ তাহলে কালাম فصيح হবে না। কেননা لسان -কে রূপকভাবে গুপ্তচর অর্থে ব্যবহারের প্রচলন নেই। لسان এর এই রূপক অর্থটি

অপ্রচলিত। বরং عين শব্দটিকে রূপকভাবে গুপ্তচর অর্থে ব্যবহার করার প্রচলন রয়েছে। সুতরাং نَشَرَ الْمَلِكُ أَلْسِنَتَه বললে কালাম ফাসীহ হবে না। কেননা অপ্রচলিত مجاز ব্যবহার করার কারণে কালামের উদ্দিষ্ট অর্থটি এখানে অস্পষ্ট হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে نَشَرَ الْمَلِكُ عُيُوْنَه বললে কালাম ফাসীহ হবে। কেননা এখানে সুপ্রচলিত مجاز ব্যবহার করার কারণে উদ্দিষ্ট অর্থ সবার কাছেই পরিষ্কার।

২. جُمُودُ الْعَيْنِ অর্থ চক্ষু জমাট বেঁধে যাওয়া। এর ইংগিতার্থ হলো, কাঁদতে গিয়ে চোখে পানি না আসা। جمود العين এর এই ইংগিতার্থটি সুপ্রচলিত। সুতরাং কেউ যদি বলে بَكَيْتُ عَلَى مَوْتِ الْحَبِيْبِ حَتَّى جَمَدَتْ عَيْنَايَ (বন্ধুর শোকে এত কেঁদেছি যে, আমার চোখ জমাট বেঁধে গেছে। অর্থাৎ চোখে আর পানি আসছে না।) তাহলে কালাম ফসীহ হবে। কেননা جَمَدَتْ عَيْنَايَ দ্বারা এমন অর্থের দিকে كِنَايَة (বা ইংগিত) করা হয়েছে যা সুপ্রচলিত; ফলে বাক্যের উদ্দিষ্ট অর্থ সকলের নিকটই পরিষ্কার।

جمود العين এর আরেকটি ইংগিতার্থ হলো, দুঃখের অবসান ও আনন্দ লাভ। কিন্তু এই ইংগিতার্থটি সুপ্রচলিত নয়। সুতরাং কেউ যদি اِنْتَهَتْ أَيَامُ البكاءِ وَ جَمَدَتْ عَيْنَايَ বলে এ দিকে ইংগিত করে যে, কান্নার দিন শেষ হয়ে গেছে এবং সুখের দিন এসে গেছে। তাহলে কালাম ফাসীহ হবে না। কেননা جمود العين দ্বারা সুখ ও আনন্দের দিকে ইংগিত করার প্রচলন নেই। সুতরাং একটি অপ্রচলিত كناية ব্যবহার করার কারণে কালামের অর্থ অস্পষ্ট হয়ে যাবে।

দেখ, একজন কবি তার মনের এই ভাব প্রকাশ করতে চান যে, আমি যা কামনা করি সব সময় দেখি তার উল্টো হয়। প্রিয়জনের মিলন কামনা করলে বিচ্ছেদ ঘটে এবং হাসি আনন্দ কামনা করলে দুঃখ আর কান্না জুটে। তাই এখন থেকে আমি প্রিয়জনের বিচ্ছেদ কামনা করবো, যাতে মিলন হয় এবং শুধু অশ্রুপাত করবো যাতে সুখ লাভ হয়। বড় সুন্দর ভাব, কিন্তু এই ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন–

سَأَطْلُبُ بُعْدَ الدارِ عنكم لِتَقْرُبُوا + وَ تَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدَا

আমি তোমাদের ব্যাপারে আবাস-দূরত্ব কামনা করবো, যাতে সান্নিধ্য লাভ

হয়। সদা অশ্রুপাত করবো যাতে চক্ষুদ্বয় জমাট বাঁধে (অর্থাৎ সুখ লাভ হয়)।

ফলে তার কবিতা غير فصيح হয়ে গেছে। কেননা جمود العين দ্বারা সুখ লাভের প্রতি ইংগিত করার প্রচলন নেই। এই অপ্রচলিত كناية বা ইংগিতার্থ ব্যবহার করার কারণে কবির উদ্দেশ্য বোঝা কষ্টকর হয়ে পড়েছে।

বাংলায় আমরা বলি, মাথাপিছু এক টাকা দাও। এখানে মাথাকে রূপক ভাবে মানুষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর প্রচলন রয়েছে। সুতরাং تعقيد معنوي না থাকার কারণে বাক্যটি فصيح হয়েছে। কিন্তু যদি বলা হয়, হাতপিছু এক টাকা দাও। তাহলে কালাম ফাসীহ্ হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে হাতকে রূপকভাবে মানুষ অর্থে ব্যবহার করার প্রচলন নেই। সুতরাং تعقيد معنوي এর কারণে বাক্যটির فصاحة নষ্ট হয়ে যাবে।

তদ্রূপ লোকটির হাত খুব লম্বা কথাটার ইংগিতার্থ হলো, সে খুব দানশীল। এই অর্থটি সুপ্রচলিত। এ অর্থে বাক্যটির ব্যবহার ফাছীহ হবে। কিন্তু যদি 'তার হাত খুব লম্বা' কথাটি দ্বারা এ দিকে ইংগিত করা হয় যে, সে খুব মারপিট করে, তাহলে কালাম ফাছীহ হবে না। কেননা বাক্যটির এই ইংগিতার্থ অপ্রচলিত, সুতরাং তাতে تعقيد معنوي দেখা দেবে।

فصاحة المتكلم

فصاحة المتكلم অর্থ যে কোন বিষয়ে كلام فصيح দ্বারা উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্ম প্রকাশ করার যোগ্যতা। এ যোগ্যতা যার মাঝে রয়েছে তাকে فصيح বলা হয়।

بلاغة এর পরিচয়

এবার আমরা بَلَاغَة শব্দটি সম্পর্কে আলোচনা করবো।

بلاغة এর আভিধানিক অর্থ হলো পৌঁছা, উপনীত হওয়া। যেমন বলা হয় بَلَغَ الصَّبِيُّ السَّابِعَةَ مِنْ عُمُرِه (ছেলেটি সপ্তম বছর বয়সে উপনীত হয়েছে।) কিংবা بَلَغَ الرَّكْبُ المدينةَ (কাফেলা শহরে পৌঁছেছে।)

পরিভাষায় بلاغة শব্দটি كلام ও متكلم এর صفة বা বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়।

بلاغة الكلام

بلاغة الكلام অর্থ, স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা অনুযায়ী ফাসীহ কালাম দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা।

অর্থাৎ যে স্থানে ও যে সময়ে আমি কথা বলছি এবং যাদের সম্পর্কে বা যাদের সম্বোধন করে কথা বলছি, আমার কথা যেন সেই স্থান, সেই সময় এবং সেই লোকদের উপযুক্ত হয়।

স্থান-কাল-পাত্রকে আরবীতে حال বলে এবং স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদাকে مقتضى الحال বলে।

حال (বা স্থান-কাল-পাত্র) মানে এমন অবস্থা যা মানুষকে একটি বিশেষ রূপে কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করে। আর কথা বলার সেই বিশেষ রূপটিকে বলে مقتضَى الحال (বা স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা)

উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হতে পারে।

প্রিয়জনের সাথে কথা বলার সুযোগ পেলে তুমি কি দু'একটি সংক্ষিপ্ত কথা বলে থেমে যাবে, না মন খুলে অনেক কথা বলবে? নিশ্চয় অনেক রকমের কথা বলতে তোমার ইচ্ছা হবে। তাই আল্লাহ যখন হযরত মূসা (আঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন, وَما تِلْكَ بِيَمينِكَ يا مُوسى উত্তরে হযরত মূসা (আঃ) هِيَ عَصايَ বলে থেমে যাননি। বরং প্রিয়তমের সংগে কথা বলার সুযোগ পেয়ে কথা দীর্ঘ করলেন এবং إطناب এর ছুরতে কথা বললেন।

মোটকথা, خِطابُ الحبيبِ (বা প্রিয়জনের সংগে আলাপ) হলো একটি حال (বা অবস্থা) যা মানুষকে إطناب -এর আকারে কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং خطاب الحبيب হলো حال এবং কালামের এই বিশেষ রূপ তথা إطناب হলো مقتضَى الحال ।

আবার দেখো, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি অল্প কথাতেই পুরো বিষয় বুঝে ফেলেন, মন খুলে বলতে হয় না, সুতরাং তার সাথে সংক্ষিপ্ত কথা বলাই হবে উচিত। এখানে ذَكاءُ المخاطَبِ (বা সম্বোধিত ব্যক্তির বিচক্ষণতা) হচ্ছে حال (বা অবস্থা) যা متكلم কে সংক্ষেপে এবং إيجاز এর ছুরতে কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করে।

সুতরাং ذكاء المخاطب হচ্ছে حال এবং إيجاز (বা সংক্ষেপণ) হচ্ছে مقتضى الحال.

حال এর مقتضى (বা স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা) রক্ষা করাকে مُطَابَقَةُ الكلامِ لِمُقْتَضَى الحال বলে।

কথা যত সুন্দর হোক যদি তা مقتضى الحال (বা স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা) অনুযায়ী না হয় তাহলে بلاغة এর স্তর থেকে নেমে যায় এবং সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

যেমন ধরো, কবি আবু নজম একবার খলিফা হিশাম বিন আব্দুল মালিকের দরবারে কবিতা বললেন। তাতে তিনি সূর্যোদয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন–

صَفْرَاءُ كَادَتْ وَلَمَّا تَفْعَلِ + كَأَنَّهَا فِي الأُفُقِ عَيْنُ الأَحْوَلِ

পূর্বদিগন্তে সূর্য যখন মাত্র উদিত হয়, এখনো সম্পূর্ণ উদিত হয়ে সারেনি, তখন মনে হয় যেন দিগন্তে দৃশ্যমান টেরা লোকের চোখ।

এ কারণে কবিকে জেলখানায় যেতে হয়েছিলো। কেননা খলিফার চোখ ছিল টেরা। তাই তিনি ভাবলেন, কবি বুঝি তাকে কটাক্ষ করেছেন।

দেখো, সদ্য উদিত সূর্যকে টেরা চোখের সংগে উপমা দেয়াটা খুবই চমৎকার। কিন্তু مقتضى الحال অনুযায়ী না হওয়ায় কবির এই দুরবস্থা হলো।

আরেকটা উদাহরণ দেখ, বাদশাহ সাইফুদ্দৌলার মাতৃবিয়োগ হলো এবং কবি মুতানাব্বী তাকে সান্ত্বনা দিলেন কবিতায়। এক পর্যায়ে তিনি বললেন–

صَلاَةُ اللّٰهِ خَالِقِنَا حَنُوطٌ + عَلَى الوَجْهِ المُكَفَّنِ بِالجَمَالِ [১]

আমাদের স্রষ্টা আল্লাহর রহমত হউক সেই সুন্দর মুখের হানুত, সৌন্দর্য হলো যার কাফন।

শুভ্র কাফনের আবরণে আবৃত মুখমণ্ডল এবং সৌন্দর্যের আবরণে আবৃত মুখমণ্ডলের উপমা কী অপূর্ব! কিন্তু বাদশাহ নাখোশ হলেন। মাতার সৌন্দর্য

১। মৃতদেহকে দীর্ঘদিন তাজা অবস্থায় রাখার জন্য এক প্রকার সুগন্ধির প্রলেপ দেয়া হয়; এটাকে আরবীতে 'হানুত' বলে।

সম্পর্কে আলোচনা করা তাঁর পছন্দ হলো না। কবি এখানে حال এর مقتضى রক্ষা করেননি।

بلاغة المتكلم

بلاغة المتكلم অর্থ যে কোন বিষয়ে كلام بليغ দ্বারা মনের ভাব ও মর্ম প্রকাশের স্বভাবযোগ্যতা। এ যোগ্যতা য়ার মাঝে রয়েছে তিনি হলেন بليغ

মোটকথা, একজন بليغ কে অবশ্যই স্বভাবযোগ্যতা, সূক্ষ্ম রুচি ও সৌন্দর্যবোধের অধিকারী হতে হবে, যাতে তিনি স্থান-কাল-পাত্র ও তার চাহিদা অনুধাবন করতে পারেন। সুন্দর ও অসুন্দরের পার্থক্য বুঝতে পারেন এবং এমন শব্দ ও মর্ম এবং ভাব ও ভাষা চয়ন করতে পারেন যা শ্রোতার মনে পূর্ণ রেখাপাত করে এবং তার অন্তরে গভীর আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। ফলে বক্তা ও শ্রোতার মাঝে ভাব ও বক্তব্যের ক্ষেত্রে পূর্ণ একাত্মতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

অর্থাৎ কালাম ফাসীহ হওয়া এবং বক্তব্য مقتضى الحال বা স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা মুতাবিক হওয়া বালাগাতের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়, প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্র। এক কথায় বালাগাতের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ভাষার যাদু বিস্তার করে শ্রোতার মন জয় করা এবং নিজের ভাব ও মর্ম শ্রোতার অন্তরের অন্তস্তলে পৌঁছে দেয়া। এ বিষয়ে যিনি যত বেশী পারদর্শী তিনি তত বড় بليغ

এ ক্ষেত্রে একজন বালীগ ও একজন অংকন শিল্পীর মাঝে তেমন কোন পার্থক্য নেই। শুধু এই যে, بليغ শব্দমালার সাহায্যে শ্রোতার অন্তর-জগতে প্রবেশ করেন। আর অংকন শিল্পী রং তুলীর সাহায্যে দর্শকচিত্ত জয় করেন। এ ছাড়া অন্য সব বিষয়ে তারা অভিন্ন।

কেননা শিল্পী যখন ছবি আঁকার চিন্তা করেন তখন প্রথমে তিনি কল্পিত ছবির উপযোগী রং ও বর্ণ চয়ন করেন। অতঃপর তুলির সাহায্যে সব কটি রং ছবির গায়ে এমন সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সুবিন্যস্ত করেন যা দর্শকের দৃষ্টি মুগ্ধ করে এবং অনুভূতিকে দোলা দেয়।

তদ্রূপ بليغ যখন কোন কবিতা বা প্রবন্ধ রচনা করতে কিংবা কোন বক্তব্য পেশ করতে চান তখন প্রথমেই তিনি বিষয়টির বিভিন্ন দিক চিন্তা করেন অতঃপর এমন ভাবে শব্দ চয়ন করেন যা অধিকতর শ্রুতিমধুর এবং এমন

প্রকাশ শৈলী গ্রহণ করেন যা অধিকতর সাবলীল ও আবেদনপূর্ণ এবং এমন সকল প্রসংগ উত্থাপন করেন যা বিষয়বস্তুর সাথে অধিকতর সংগতিপূর্ণ।

এভাবে একদিকে শিল্পীর দর্শকমণ্ডলী ছবি ও তার রং প্রয়োগের সৌন্দর্য ও কুশলতায় বিমুগ্ধ হন, অন্য দিকে بليغ এর শ্রোতাবর্গ ভাব ও মর্ম এবং ভাষা ও শব্দের যাদুতে বিমোহিত হন।

بلاغة শাস্ত্রের চর্চায় পূর্ণ আত্মনিয়োগের মাধ্যমে তুমিও হতে পারো বালাগাত জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তেমন উজ্জ্বল ভবিষ্যতই তোমার জন্য আমরা কামনা করি।

خلاصة الكلام

الفَصاحةُ فى اللُّغَةِ : الظُّهورُ و البَيانُ، تقول أفصحَ الصبحُ .

و في الاصطلاحِ : تَقَعُ وَصْفًا لِلكلمَةِ و الكلامِ وَ المتكلمِ .

فَفَصاحةُ الكلمَةِ سَلامَتُها مِنْ تنافُرِ الحُروفِ وَ مخالَفَةِ القِياسِ وَ الغَرابَةِ .

فَتنافُرُ الحروفِ وَصْفٌ في الكلمَةِ يُوْجِبُ ثِقْلَها على السَّمْعِ وَ صُعوبَةَ أَدائِها بِاللِّسانِ .

وَ مخالَفَةُ القياسِ هِيَ أَنْ تكونَ الكلمةُ غيرَ جاريةٍ على القانونِ الصَّرْفِيِّ .

وَ الغرابَةُ هِيَ أن تكونَ الكلمةُ غيرَ ظاهرةِ المَعْنَى .

فَالكلِمَةُ الفصيحَةُ هِيَ السالِمَةُ مِنْ تنافُرِ الحروفِ الجارِيَةُ على القانونِ الصرْفِيِّ البَيِّنَةُ فى مَعْناها المفهومَةُ العَذْبَةُ السَّلِسَةُ .

و فصاحة الكلامِ سلامَتُه من تنافُرِ الكَلِماتِ وَ مِنْ ضَعْفِ التاليفِ و مِنَ التعقيدِ لَفظِيًّا كانَ أَوْ مَعْنَوِيًّا معَ فصاحَةِ كَلِمَاتِه .

وَ تنافُرُ الكَلِماتِ أَنْ تكونَ كلِماتُ الكلامِ عندَ اتِّصالِ بَعْضِها بِبَعْضٍ ثقيلَةً على السَّمْعِ صَعْبَةً على اللسانِ معَ سُهولَتِها عندَ الانفصالِ .

وَ ضَعْفُ التاليفِ هو خروجُ الكلامِ عَنْ قَواعِدِ اللُّغَةِ المشهورَةِ، كَرُجوعِ الضميرِ على مُتأخِّرٍ لَفْظًا وَ رُتْبَةً .

وَ التعقيدُ اللفظِيُّ هو خَفاءُ المَعْنَى بِسَبَبِ تَقْديمٍ أَوْ تأخيرٍ أو فَصْلٍ .

وَ التعقيدُ المعنَوِيُّ هو خَفاءُ المعنى بِسبَبِ اسْتِعمَالِ مَجازاتٍ وَ كِناياتٍ لا يُفْهَمُ المرادُ بها .

و فصاحةُ المتكلِمِ هي مَلَكَةُ التعبيرِ عَنِ المَقْصودِ بكلامٍ فصيحٍ فى أَيِّ غَرَضٍ كانَ .

و البلاغة فى اللغةِ : الوُصول وَ الانتِهاءُ : تقول بَلَغَ الرَّكْبُ المدينةَ .

و فى الاصطلاح تَقَعُ وَصْفًا للكلامِ و المتكلِمِ .

فبلاغة الكلام مُطابَقَتُه لِمُقْتَضَى الحالِ مَعَ فصاحَتِه .

وَ الحالُ مَا يَدعو المتكلمَ على أَنْ يُورِدَ عِبارَتَه على صورةٍ مخصوصَةٍ .

و مقتضَى الحال هو الصورَةُ المخصوصَةُ التى تُورَدُ عليها العِبارَةُ .

و يَخرج الكلام عن حَدِّ البلاغَةِ إذا جاءَ فى غيرِ مَكانِه و لو كانَ فى نَفْسِه حَسَنًا خَلَّاباً .

و بلاغةُ المتكلِمِ هى مَلَكَةُ التعبيرِ عَنِ المقصودِ بكلامٍ بليغٍ فى أَيِّ غَرَضٍ كانَ.

وَ لا بُدَّ للبليغِ أن يكونَ على صَفاءِ الاستِعْدادِ الفِطْرِيِّ وَدِقَّةِ النَّظَرِ وَ سَلامَةِ الذَّوْقِ لِإدْراكِ الجَمالِ حَتى يَتَمَكَّنَ مِنَ التفكيرِ فى المَعانِي الجليلَةِ ثم يَختارُ من الأَلْفاظِ أَخَفَّها على السمْعِ و أَقواها أَثَراً وَ أَرْوَعَها جَمَالاً حتى يفعلَ الكلامُ فى نُفوسِ سامعيه فِعْلَ السِّحْرِ الحَلالِ .

علم المعاني

যে তিনটি শাখার সমন্বয়ে بلاغة শাস্ত্র গঠিত তন্মধ্যে একটি হলো علم المعاني এখন আমরা علم المعاني এর পরিচয় পেশ করছি।

একথা তুমি আগেই জেনে এসেছো যে, কোন কালাম بليغ হওয়ার জন্য مقتضى الحال বা স্থান কাল পাত্রের চাহিদা অনুযায়ী হওয়া শর্ত।

কোন কোন ক্ষেত্রে বাক্যের কোন শব্দকে অগ্রবর্তী করা কিংবা পশ্চাদ্‌বর্তী করা حال এর مقتضى বা স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা হয়ে থাকে। তদ্রূপ বাক্যের কোন শব্দকে উহ্য করা কিংবা উল্লেখ করা مقتضى الحال বা স্থান কাল পাত্রের চাহিদা হয়ে থাকে। তদ্রূপ কখনো কখনো حال এর مقتضى বা চাহিদা হয়ে থাকে লফযকে মারিফা বা নাকিরা রূপে ব্যবহার করা। সুতরাং যখন আমরা আরবী লফয গুলোর বিভিন্ন حال বা অবস্থা জানতে পারবো তখন সেই حال বা অবস্থা গুলোর চাহিদা অনুযায়ী কথা বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। علم المعاني অধ্যয়ন করলে আমরা আরবী লফযের বিভিন্ন অবস্থা জানতে পারবো এবং সেই অবস্থা গুলোর আলোকে কালামকে مقتضى الحال অনুযায়ী বলতে সক্ষম হবো।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, যে ইলম দ্বারা আরবী লফযের ঐ সকল অবস্থা জানা যায় যা অনুসরণ করলে কালাম مقتضى الحال অনুযায়ী হয় তাকে علم المعاني বলে।

أحوال اللفظ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো تعريف - تنكير ، وصل - فصل ، تاكيد - عدم تاكيد ، تقديم - تاخير ، ذكر - حذف ، ইত্যাদি।

علم المعاني অধ্যয়ন করলে আমরা লফযের এই সমস্ত অবস্থা জানতে পারবো এবং এগুলোর সাহায্যে কালামকে مقتضى الحال বা স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা মুতাবিক করতে পারবো।

সুতরাং এ বিষয়টাও পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, অবস্থার বিভিন্নতার কারণে কালামের ছূরত বা রূপও বিভিন্ন হতে পারে। যেমন ধরো, তুমি মিথ্যাবাদী নাকি

সত্যবাদী এ সম্পর্কে مخاطب এর কোন ধারণা নেই; এ বিষয়ে সে ধারণামুক্ত, তখন তুমি কালামকে تاكيد যুক্ত না করে বলবে أنا صادق কিন্তু যদি সে তোমার সত্যবাদী হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে এবং ভিন্ন ধারণা পোষণ করে তখন তুমি তার বিশ্বাস অর্জনের জন্য তাকীদের সাথে বলবে إني صادق কিন্তু এতেও যদি তার অবিশ্বাস দূর না হয়, অবিশ্বাসের মাত্রা যদি প্রবল হয় তাহলে তুমি অতিরিক্ত তাকীদযুক্ত করে বলবে إني لَصادِق । দেখো, অবস্থার বিভিন্নতার কারণে কালামের রূপ বিভিন্ন হলো।

কোরআন শরীফ থেকে একটি উদাহরণ দেখো। ইরশাদ হয়েছে–

و إِنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أرِيدَ بِمَنْ فِي الأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِم رَبُّهم رَشَدا.

এখানে أم এর পূর্বে ও পরে কালামের রূপ ভিন্ন। أم এর পূর্বে রয়েছে أُرِيدَ ফেয়েলে মাজহূল আর পরে রয়েছে أَرادَ ফেয়েলে মারূফ। অথচ شر ও خير উভয়টির ইরাদাকারী বা ফায়সালাকারী হলেন আল্লাহ। কিন্তু আল্লাহর দিকে شر এর نِسبة শোভনীয় নয় বলে مجهول ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে أم এর পরে রয়েছে আল্লাহর দিকে خير এর নিসবত যা শোভনীয়, তাই فعل معروف ব্যবহার করা হয়েছে। যে حال বা অবস্থার কারণে কালামের রূপ বিভিন্ন হলো সেটা হলো أم এর পূর্বে আল্লাহর দিকে شر -এর নিসবত করা এবং أم এর পরে আল্লাহর দিকে خير এর নিসবাত করা।

علم المعاني এর সমগ্র আলোচনাকে আটটি অধ্যায়ে এবং একটি পরিশিষ্টে বিভক্ত করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের আলোচনাও সেভাবে অগ্রসর হবে।

خلاصة الكلام

عِلْمُ المَعَانِي : هو عِلْمٌ يُعْرَفُ به أَحْوالُ اللفظِ العربِيِّ التى بِها يُطابَقُ الكلامُ مقتَضَى الحالِ .

وَ تَختلِف صُوَرُ الكلامِ لِاخْتِلاف الأَحْوالِ .

الباب الأول

فى الخبر و الإنشاء

كلام বা جملة দু' প্রকার– خبر ও إنشاء

আলোচ্য অধ্যায়ে কালামের এ দু'প্রকার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হবে। তবে আলোচনাটি যাতে সহজবোধ্য হয় সে জন্য প্রথমে আমরা جملة বা বাক্যের মূল কাঠামো সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে চাই।

আশা করি এ কথা তুমি জানো যে, যে কোন جملة বা বাক্যের মূল স্তম্ভ দুটি। এ দুটি স্তম্ভ ছাড়া বাক্য কাঠামোর অস্তিত্বই বিদ্যমান হতে পারে না। স্তম্ভ দুটি হলো مسند ও مسند إليه সামনের উদাহরণ দুটি লক্ষ্য করো–

وَقَفَ المعلّمُ – المعلم وَاقِفٌ এখানে وَقَفَ ও وَاقِفٌ শব্দদ্বয়ে وُقوف-এর অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। এই وُقوف কে আমরা المعلم এর দিকে إسناد বা সম্পৃক্ত করেছি। সুতরাং وقف বা واقف শব্দ দুটি (যাদের মাঝে وقوف অর্থটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে) হলো مسند এবং المعلم শব্দটি مسند إليه আর উভয়ের মাঝের এই সম্পৃক্তিকে বলে إسناد।

মোটকথা إسناد হলো একটি গুণগত অবস্থা যা مسند ও مسند إليه এর মাঝে বিদ্যমান। এটার কোন উচ্চারণ রূপ নেই। পক্ষান্তরে مسند ও مسند إليه হচ্ছে শব্দযোগে উচ্চারিত বিষয়।

একথাও তুমি জানো যে, جملة اسمية এর ক্ষেত্রে مسند إليه হচ্ছে مبتدأ এবং مسند হচ্ছে خبر – পক্ষান্তরে جملة فعلية এর ক্ষেত্রে مسند হচ্ছে فعل এবং مسند إليه হচ্ছে فاعل ।

এবার আমরা মূল আলোচনায় অগ্রসর হই। যে কোন جملة বা كلام হয় خبر

হবে কিংবা إنشاء হবে। তাই خبر ও إنشا এর পরিচয় জানা দরকার।

১.যে كلام 'সত্তাগতভাবে' صِدْق وَ كِذْب (তথা সত্য ও মিথ্যা) হওয়ার সম্ভাবনা রাখে তাকে খবর বলে।

খবরের পরিচয়ের ক্ষেত্রে 'সত্তাগতভাবে' কথাটা যুক্ত করার কারণ এই যে, যদি আমরা مُخْبِر বা খবরদাতার দিকে তাকাই কিংবা বাস্তবতার দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে যে, কোন কোন কালাম অবধারিতরূপে সত্য; মিথ্যা হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। যেমন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বাণী। তদ্রূপ– এক হলো দুইয়ের অর্ধেক, আসমান আমাদের উপরে বিদ্যমান, পৃথিবী আমাদের নীচে বিদ্যমান– এ জাতীয় বাক্যসমূহ। তদ্রূপ কোন কোন কালামের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, তা অবধারিতরূপে মিথ্যা, সত্য হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। যেমন, ভণ্ড নবীদের কথা এবং জ্ঞান উপকারী নয়, মূর্খতা উপকারী– এ জাতীয় বাক্যসমূহ।

মোটকথা, যদি খবরদাতার দিকে কিংবা বাস্তবতার দিকে তাকাই তাহলে উপরে প্রথমোক্ত বাক্যগুলো ধ্রুব সত্য এবং দ্বিতীয়োক্ত বাক্যগুলো অবধারিত রূপে মিথ্যা। সত্য ও মিথ্যা উভয়টির সম্ভাবনা এগুলোতে নেই। পক্ষান্তরে যদি আমরা খবরদাতার দিকে কিংবা বাস্তবতার দিকে না তাকাই, বরং শুধু مسند ও مسند إليه দ্বারা গঠিত নিছক একটি جملة হিসাবে তাকাই তাহলে তাতে আমরা সত্য ও মিথ্যা উভয়টির সম্ভাবনাই দেখতে পাবো। আর খবরের সত্য ও মিথ্যার সম্ভাবনাপূর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক বিষয় নয় বরং খবরের মূল সত্তাই হলো লক্ষ্যণীয়। এজন্য পরিচয় বর্ণনার ক্ষেত্রে 'সত্তাগতভাবে' কথাটা যুক্ত করা হয়েছে। আশা করি বিষয়টি তুমি বুঝতে পেরেছো। আলোচনাটা কয়েকবার পড়ো; তাহলে আরো ভালোভাবে বুঝবে।

এখন প্রশ্ন হলো خبر সত্য বা মিথ্যা হওয়ার অর্থ কি?

এর উত্তর এই যে, যে খবরের مَضمون বা সার-বিষয় বাস্তব অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ সে খবর হলো صادق বা সত্য। পক্ষান্তরে যে খবরের সার-বিষয় বাস্তব অবস্থার সাথে সংগতিপূর্ণ নয় সে খবর হলো كاذِب বা মিথ্যা। বিষয়টিকে

আরো বিশদরূপে এভাবে বলা যেতে পারে যে, যে কোন جملة خبرية তে দুটি نسبة রয়েছে। একটি نسبة কালাম থেকে বোধগম্য হয়। এটাকে نِسْبَةِ كلامِيَّة বলে। পক্ষান্তরে আরেকটি নিসবত আমরা বাস্তব অবস্থা থেকে আহরণ করি। এটাকে نِسبَة وَاقِعِيَّة বা نِسْبَة خارِجِيَّة বলা হয়।

যেমন, محمودٌ مُسافِرٌ বাক্য থেকে আমরা ثُبوتُ السَّفَرِ لِمَحمودٍ এই نسبة পেলাম। এটা হলো نسبة كلامية পক্ষান্তরে মাহমুদের বাস্তব যে অবস্থা সেটা হলো نسبة خارجية যদি বাস্তবে সে মুসাফির হয়ে থাকে, তাহলে نسبة كلامية ও نسبة خارجية উভয়টি অভিন্ন হলো। সুতরাং خبر টি صادق বা সত্য হলো। পক্ষান্তরে বাস্তবে যদি সে মুসাফির না হয়ে থাকে তাহলে نسبة كلامية ও نسبة خارجية ভিন্ন হয়ে গেলো। সুতরাং خبر টি كاذب হলো। মোটকথা, صِدْقُ الخَبَر এর অর্থ হলো خبر টি বাস্তবের সাথে সংগতিপূর্ণ হওয়া এবং كِذْبُ الخَبَر এর অর্থ হলো خبر টি বাস্তবের বিপরীত হওয়া।

২। যে কালাম সত্য ও মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না তাকে إنشاء বলে।

আসল কথা হলো, إنشاء এর ক্ষেত্রে কোন نسبة خارجية নেই। সুতরাং তার সাথে نسبة كلامية এর মিল অমিল হওয়ার প্রশ্নই আসে না, অথচ صدق ও كذب এর অর্থই হলো উভয় نسبة এর মিল বা অমিল হওয়া।

خلاصة الكلام

يَنقسِم الكلام إلى خَبرٍ وَ إنشاءٍ، فالخبرُ قَوْلٌ يَحْتَمِل الصِّدْقَ وَ الكِذْبَ لِذَاتِه و الإنشاءُ قَوْلٌ لا يحتَمِل صِدْقًا وَ لا كِذْبًا (أى لا يجوز أن يقالَ لقائِلِه إنه صادِقٌ فِيهِ أَوْ كاذِبٌ) إِذْ لا وَاقِعَ للإنشاءِ حَتَّى يُطابِقَه أَوْ لا يُطابِقَه

وَ المرادُ بِصِدْقِ الخَبَرِ أَنْ تُطابِقَ النِّسْبَةُ المفهومَةُ مِنَ الكلامِ النسبَةَ الخارِجِيَّةَ و بِكِذْبِ الخَبَرِ أن تكونَ النسبةُ الكلامِيَّةُ غيرَ مطابِقَةٍ للنسبةِ الخارجِيَةِ .

فان كانَتِ النسبةُ المفهومَةُ مِنْ قَوْلِنا محمودٌ مسافِرٌ مطابِقَةً لما فى الخارِجِ فهو صادق وَ إلا فَكَذِبٌ

وَ لِكُلِّ جملةٍ رُكْنانِ أَساسِيَّانِ لا بُدَّ منهما فى تَكْوِينِها و هما المسند ١ و المسند إليه ٢.

وَ ما زادَ عليهما مِنْ مفعولٍ وَ حالٍ و تمييزٍ و غيرِها فهو قَيْدٌ زائِدٌ

معاني الجملة الاسمية و الفعلية

বালাগাত অধ্যয়নকারীর জন্য جملة اسمية ও جملة فعلية এর অর্থগত পার্থক্য জেনে রাখা খুবই দরকার। এখানে আমরা সে প্রসংগই আলোচনা করবো।

جملة اسمية মূলগতভাবে مسند إليه ও مسند এর মাঝে শুধু একটি نسبة বা حكم সাব্যস্ত করে। উক্ত نسبة অব্যাহত থাকা না থাকার বিষয়টি তার মূল অর্থের অন্তর্ভুক্ত নয়।

যেমন- محمود مسافر বাক্যটি শুধু একথা বোঝাবে যে, সফর বিষয়টি মাহমুদের জন্য সাব্যস্ত। কিন্তু সফরের ঘটন-কাল কিংবা সফরের অব্যাহততা সম্পর্কে বাক্যটির কোন বক্তব্য নেই, এ সম্পর্কে বাক্যটি নিরব।

তবে কখনো কখনো কালামের পূর্বাপর অবস্থা থেকে এমন কিছু قَرائِن বা আলামত ও অনুষংগ পাওয়া যায়, যা বাক্যস্থ نسبة বা حكم টির دوام ও অব্যাহততা প্রমাণ করে। যেমন ধরো, বাক্যটি প্রশংসা, নিন্দা, হিকমত, উপদেশ, ধমকি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বলা হলো, তখন এই অনুষংগের কারণে বাক্যের মূল অর্থের সাথে دوام বা অব্যাহততার মাত্রা যুক্ত হবে।

উদাহরণ স্বরূপ, কবি نضر بنْ جؤيبة স্বগোত্রের দানশীলতার প্রশংসা করে বলেন।

لا يَأْلَفُ الدرهمُ المضروبُ صُرَّتَنا + لٰكِنْ يَمُرُّ عليها وَ هْوَ مُنْطلقٌ

টাকশালের তৈরী দিরহাম আমাদের থলিয়া পছন্দ করে না। তাই এসে [illegible] দেয়।

আমাদের আলোচ্যক্ষেত্র হচ্ছে وهو منطلق এই جملة إسمية টি।

কবি বলতে চান, আমাদের দিরহামগুলোর জন্য انطلاق বা ছুটে চলার حكم অব্যাহত রূপে সাব্যস্ত। অর্থাৎ সর্বদা অভাবী লোকদের প্রয়োজন পূরণের জন্য সেদিকে ছুটে চলে। পূর্ববর্তী পংক্তিতে সেদিকে ইংগিত রয়েছে–

إنا إذا اجْتَمَعَتْ دَراهِمُنا + ظَلَّتْ إلى طريقِ المعروفِ تَسْتَبِقُ

আমাদের দিরহামগুলো কোনদিন এসে জড়ো হলে তৎক্ষণাৎ দান ও সদাচারের পথে 'কে কার আগে' ছুটে যায়।

وَ إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيمٍ আয়াতটি এ পর্যায়ের। অর্থাৎ প্রশংসার ক্ষেত্রে বাক্যটির উচ্চারণ دوام ও استمرار তথা স্থায়িত্ব ও অব্যাহততা প্রমাণ করে।

তদ্রূপ নিন্দার ক্ষেত্রে هم لُؤَمَاءُ এবং উপদেশের ক্ষেত্রে إن اللهَ معَ الصّٰبِرِينَ এবং চিরন্তন সত্য বর্ণনার ক্ষেত্রে العِلْمُ نافِعٌ বাক্যগুলো সম্পর্কে একই কথা। অর্থাৎ বিভিন্ন অনুষংগের কারণে বাক্যগুলো ثُبوتُ الحُكْمِ عَلَى الدَّوامِ وَ الاستِمْرَارِ বুঝিয়েছে।

جملة فعلية মূলতঃ তৈরী হয়েছে সংক্ষিপ্তাকারে নির্দিষ্টকালে কোন ঘটনার সংঘটন বোঝানোর জন্য।

যেমন ধরো, طَلَعَتِ الشَّمْسِ বাক্যটি সূর্যের জন্য বিগতকালে طلوع বা উদয় সাব্যস্ত করেছে এবং طَلَعَتْ শব্দটি কাঠামোগত ভাবেই কাল বুঝিয়েছে, এজন্য আলাদা কোন শব্দ ব্যবহার করতে হয়নি। পক্ষান্তরে "طَالِعٌ" ইসমটি ব্যবহার করলে নির্ধারিত কাল বোঝানোর জন্য أَمْسِ কিংবা غدًا কিংবা الآنَ এই জাতীয় সহযোগী শব্দের প্রয়োগ জরুরী হতো।

তবে فعل টি যদি مضارع হয় তখন قرائن তথা আলামত ও অনুষংগ যুক্ত হলে সেটা পুনঃপৌনিকতা[১] ও অব্যাহততার অর্থ প্রদান করে।

আল কোরআনের আয়াত দেখ–

إِنَّا سَخَّرْنَا الجِبالَ معه يُسَبِّحْنَ بِالعَشِيِّ وَ الإِشْرَاقِ

আমরা পাহাড়সমূহকে তার অনুগত করে দিয়েছি। এরা সন্ধ্যা-সকাল তাসবীহ পাঠকরে।

১। অর্থাৎ বারংবারতা

এখানে يسبحن এই فعل مضارع টি বোঝাচ্ছে যে, পাহাড়সমূহ থেকে তাসবিহ ক্রিয়াটি বারংবার অব্যাহত রূপে ঘটে চলেছে।

তদ্রুপ কবি তারীফ বিন তামীম আল-আম্বরীরর নিম্নোক্ত কবিতা পংক্তিটি দেখ–

أَوَ كُلَّما وَرَدَتْ عكاظَ قَبِيلَةٌ + بَعَثوا إِلَيَّ عَرِيْفَهُمْ يَتَوَسَّمُ

ব্যাপার কি! যখন ওকায মেলায় কোন গোত্র দল আগমন করে তখনই তারা আমার কাছে তাদের নকীবকে পাঠিয়ে দেয়, আর সে (আমাকে চিনে রাখার জন্য) বারংবার অব্যাহতভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। (যাতে হারাম মাসের পর আমাকে হত্যা করতে পারে।)[২]

যেহেতু বীরত্ব ও সাহসিকতা বিষয়ে আত্মপ্রশংসার জন্য কবিতাটি বলা হয়েছে সেহেতু يتوسم শব্দটিকে الاستمرار التجددي বা পুনঃপৌনিকতা ও অব্যাহততার অর্থে গ্রহণ করতে হচ্ছে। কেননা তাতেই কবির বাহাদুরি ও গুরুত্ব প্রকাশ পায়।

خلاصة الكلام

الخبرُ قِسمان : اِسميَّةٌ وَ فِعليَّةٌ ·

فالاسميةُ تُفِيد (بِأَصْلِ وَضْعِها) ثُبوتَ الحُكْمِ فَحَسْبُ بِلا نَظَرٍ إلى تَجَدُّدٍ و لا إلَى اسْتِمرارٍ ·

و قد تُفيد الدوامَ و الاستمرارَ بِدَلالَةِ القَرائِنِ، كَأَنْ تكونَ فى مَوْضِعِ مَدْحٍ أو ذم أو حِكْمَةٍ أو نحوِ ذلك ·

الجملة الاسمية انما تفيد الدوامَ و الاستمرارَ بِدلالَةِ القَرائنِ إذا كان خَبَرُها مُفرداً أو جملةً اسميةً، أما إذا كان خبرُها جملةً فعلية فإنها تفيد التجدُّدَ ·

و الفعليةُ موضوعَةٌ لِإفادَةِ الحُدوثِ فى زَمنٍ معيَّنٍ مَعَ الاختصارِ نحوُ طلع الشمسُ و تَطلع الشمسُ

---

[২] কেননা আমি প্রত্যেক গোত্রের কোন না কোন লোককে হত্যা করেছি।

و إذا كانَ الفعلُ مضارِعًا فقد تُفيد الاستمرارَ التجدُّدِيَّ كما فى قولِ طَرِيفٍ و هو يَتَمدَّحُ بِجَرائَتِهِ و شَجاعَتِهِ

أَوَ كُلَّما وَرَدَتْ عكاظَ قبيلَةٌ + بَعَثوا إِلَيَّ عَرِيفَهم يتوسَّمُ

أغـراض الخبـر

মনে করো, রাশেদের আব্বা সফর থেকে এসেছেন কিন্তু রাশেদ তা জানতে পারেনি। এমতাবস্থায় রাশেদকে তুমি এই বলে খবর দিলে- قَدِمَ أبوكَ مِنَ السَّفَرِ এখানে তোমার উদ্দেশ্য কি? তোমার উদ্দেশ্য হলো রাশেদকে جملة এর حكم ও সার-বিষয় তথা قُدوم أبيه সম্পর্কে অবহিত করা এবং এই বিষয়ে তার অজ্ঞতা দূর করা।

কিন্তু আগে থেকেই যদি রাশেদ তার আব্বার সফর থেকে ফিরে আসার কথা জেনে থাকে তখন তাকে লক্ষ্য করে তোমার قَدِمَ أبوك من السفَرِ বলার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হলো; جملة এর حكم তথা قدوم أبيه সম্পর্কে তুমিও যে অবগত তা রাশেদের জানা ছিল না, এ অজানা বিষয়টি প্রকারান্তরে তাকে জানিয়ে দেওয়া।

মোটকথা متكلم এর কথিত جلمة এর حكم সম্পর্কে مخاطَب যদি অনবহিত থাকে তাহলে উদ্দেশ্য হলো حكم টি সম্পর্কে তাকে অবহিত করা। তখন উক্ত حكم টিকে فَائِدَةُ الخَبَرِ বলা হবে। পক্ষান্তরে مخاطَب যদি جملة এর حكم সম্পর্কে আগেই অবগত থাকে তাহলে উদ্দেশ্য হবে مخاطَب কে একথা জানানো যে, আলোচ্য حكم সম্পর্কে متكلم অবগত রয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত حكم কে لازِمُ فائدَةِ الخَبَرِ বলা হবে।

আরেকটা বিষয় লক্ষ্য কর, প্রথম ক্ষেত্রে যদিও তোমার উদ্দেশ্য হলো مخاطَب কে বাক্যস্থ حكم সম্পর্কে অবহিত করা কিন্তু অনিবার্য ভাবে مخاطَب এটাও জেনে যাচ্ছে যে, متكلم বিষয়টি সম্পর্কে অবগত রয়েছে। অর্থাৎ অনিবার্যভাবে جملة -এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি এখানে অর্জিত হয়ে যাচ্ছে।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শুধু একটি কাজই হচ্ছে, অর্থাৎ مخاطِب কে একথা জানানো যে, متكلم বাক্যস্থ حكم সম্পর্কে অবগত। কিন্তু প্রথম উদ্দেশ্যটি অর্থাৎ বাক্যস্থ حكم সম্পর্কে مخاطِب কে জ্ঞান দানের বিষয়টি এখানে সম্ভব নয়। কেননা সেটা তো আগে থেকেই مخاطِب এর জানা রয়েছে।

আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করো قَدِمَ أبوك من السفَر উদাহরণে مخاطِب এর জানা ও না জানা হিসাবে বাক্যের দুটি উদ্দেশ্যের যে কোনটি হতে পারে। পক্ষান্তরে أَنْتَ تعمَل كُلَّ يومٍ فى حديقَتِك এ জাতীয় বাক্যে প্রথম উদ্দেশ্যটি হতে পারে না। কেননা এ বিষয়টি مخاطِب এর না জানার প্রশ্নই আসে না। সুতরাং এ জাতীয় বাক্য শুধু দ্বিতীয় উদ্দেশ্যেই বলা যেতে পারে।

(ক) এবার সামনের উদাহরণটি দেখ, দিনের আলোতে হোঁচট খাওয়া ব্যক্তিকে তুমি বললে الشمسُ طالِعَةٌ – এখানে কি এটা বলা যায় যে, مخاطِب কে তুমি جملة এর حكم তথা طُلوعُ الشمسِ সম্পর্কে অবহিত করতে চাচ্ছো? কিংবা এ বিষয়ে তুমি যে অবহিত সেটা مخاطِب কে জানাতে চাচ্ছো? না, এ দুটি উদ্দেশ্যের কোনটিই এখানে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এটাতো সকলেরই জানা বিষয়। সুতরাং এখানে বাক্যটি উচ্চারণের অন্য কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। অর্থাৎ مخاطِب কে তুমি দিনে দুপুরে সূর্যের আলোতে হুঁচট খাওয়ার কারণে তিরস্কার করতে চাচ্ছো।

(খ) আবার দেখো– যে ব্যক্তি পরীক্ষায় তোমার কৃতকার্য হওয়ার বিষয়টি জানে (এবং তুমি যে জানো এটাও জানে) তার উদ্দেশ্যে তুমি বললে, نجحتُ فى الامتحانِ – এখানে খবর প্রদানের মূল দুটি উদ্দেশ্যের কোনটিই সম্ভব নয়। সুতরাং বোঝা গেল যে, বাক্যটি উচ্চারণের ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। আর সেটা হলো আনন্দ প্রকাশ করা।

(গ) আবার দেখো, হযরত যাকারিয়া (আঃ) আল্লাহকে সম্বোধন করে বলছেন–

رَبِّ اِني وَهَنَ العظْمُ مني و اشتَعلَ الرأسُ شَيْبًا *

এখানে فائدةُ الخبرِ কিংবা لازمُ فائدةِ الخبرِ কোনটাই উদ্দেশ্য নয়, কেননা হযরত যাকারিয়া (আঃ) তো জানেন যে, কোন কিছুই আল্লাহর আগোচরে নয়।

সুতরাং এখানে নিজের দুর্বলতা ও চরম দুর্দশা প্রকাশ করাই হলো উদ্দেশ্য।

(ঘ) আবার দেখো, পুত্রশোকে কাতর জনৈক বেদুঈন কবি বলেছেন–

لَمَّا دعوتُ الصَّبْرَ بعدَك وَ الأَسٰى + أجابَ الأَسٰى طَوْعًا و لم يُجِبِ الصبْرُ
فَإِنْ يَنْقَطِعْ مِنك الرَّجاءُ فَإِنَّهُ + سَيَبْقٰى عليكَ الحزنُ مَا بَقِيَ الدهْرُ

তোমাকে হারানোর পর শোক ও ধৈর্যকে আহ্বান জানালাম। শোক তো সে ডাকে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিলো, কিন্তু ধৈর্য মোটেই সাড়া দিল না।

তোমাকে ফিরে পাওয়ার আশা যদি বিলীন হয়ে থাকে (তাহলে হোক) কিন্তু তোমাকে হারানোর শোক চিরকাল জাগরূক থাকবে।

আশা করি তুমি পরিষ্কার বুঝতে পারছো যে, এখানে শোক প্রকাশ করা ছাড়া কবির অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। কেননা মৃত ব্যক্তি তো সম্বোধনযোগ্যই নয়।

(ঙ) আবার দেখো, হযরত উম্মে মারয়াম (আঃ) আশা করেছিলেন যে, তার পুত্র সন্তান হবে এবং তাকে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাসের সেবায় ওয়াকফ করে দেবেন। কিন্তু যখন তিনি কন্যা সন্তান প্রসব করলেন তখন আশাভংগের কারণে তাঁর খুব দুঃখ হলো। সেই দুঃখানুভূতি প্রকাশ করে তিনি বললেন–

رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثٰى (হে প্রতিপালক! এ দেখি, কন্যাসন্তান প্রসব করলাম!)

বলাবাহুল্য যে, এখানে কাঙ্ক্ষিত জিনিস হাতছাড়া হওয়ার এবং আশাভংগ হওয়ার কারণে দুঃখ ও আফসোস প্রকাশ করা ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য নয়।

(চ) আবার দেখো, ইবরাহীম ইবনুল মাহদী খলীফা আল মামুনের উদ্দেশ্যে কেমন 'মন নরম করা' কবিতা বলেছেন–

اَتيتُ جُرْمًا شَنِيعًا + وَ أنتَ لِلْعَفْوِ أَهْلُ
فَإِنْ عفوتَ فَمَنٌّ + وَ إِنْ قُتِلْتُ فَعَدْلُ [١]

١। قُتِلْتُ ও قَتَلْتَ দু'টোই হতে পারে; তবে ছন্দগত কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু বালাগাতের দিক থেকে বিচার করে অধিকতর উপযুক্ত কোনটি নির্ণয় করো, পিছনের একটি درس স্মরণ করো।

স্বীকার করি, আমি গুরুতর অপরাধ করে ফেলেছি। তবে ক্ষমা করা আপনার শান। যদি ক্ষমা করেন তাহলে আপনার অনুগ্রহ, আর কতল করা হলে তা হবে আপনার ইনছাফ।

এখানে جملة এর حكم সম্পর্কে-খলীফা আল মামুনকে অবহিত করা কিংবা এ সম্পর্কে নিজের অবহিতি খলীফাকে জানানো উদ্দেশ্য নয়, কেননা দু'টো বিষয়ই খলিফার জানা রয়েছে। তাছাড়া জীবনাশংকায় ভীত সন্ত্রস্ত কবির তাতে কোন লাভ-ক্ষতি নেই। বরং অপরাধের স্বীকৃতি ও প্রশংসার মাধ্যমে খলীফার অন্তরে অনুগ্রহ ও করুণার উদ্রেক করা এবং কৃপা প্রার্থনা করাই হলো উদ্দেশ্য।

(ছ) এবার সামনের উদাহরণটি দেখো–

أَحْسِنْ إلى الناسِ، فَإنَّ الناسَ يشكُرونَ المُحْسِنَ

সাদচার করো। কেননা মানুষ সদাচারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়।

এখানে أَحْسِنْ إلى الناسِ এই আদেশ বাক্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, النـاسَ يشـكرونَ المحسِنَ দ্বারা متكلم এর উদ্দেশ্য হচ্ছে مخاطبَ কে মানুষের প্রতি সদাচারে উদ্বুদ্ধ করা।

(জ) মৃত্যু সম্পর্কে গাফিল ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যদি বলা হয় أَلَا كلُّ نفْسٍ ذائِقَةُ الموتِ। তাহলে এ বাক্যের কি উদ্দেশ্য হতে পারে? বলাবাহুল্য যে, উপদেশ দানই হলো এখানে উদ্দেশ্য।

(ঝ) একদল লোকের কৃপণতা সম্পর্কে জনৈক বেদুঈনের মন্তব্য হলো–

قَوْمٌ إذا أَكَلُوا أَخْفَوا حديثَهم

এরা এমন স্বভাবকৃপণ যে, খেতে বসে ফিসফিস করে কথা বলে। (পাছে তাদের কথা শুনে কেউ না আবার দস্তরখানে এসে পড়ে)।

বলাবাহুল্য যে, এখানে নিন্দা করাই হলো উদ্দেশ্য।

তদ্রূপ দেখো, জাহেলী যুগের কবি আমর বিন কুলছুম স্বগোত্রের বীরত্ব সম্পর্কে আত্মগর্ব করে বলছেন–

إذا بَلَغَ الفِطامَ لَناصَبِيٌّ + تَخِرُّ له الجَبابِرُ ساجِدِينا

আমাদের কোন শিশুর যখন দুধ ছাড়ার সময় হয় তখন থেকেই প্রতাপশালীরা তার সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে।

তাহলে আমরা একথা বলতে পারি যে, جملة خبرية এর মূল উদ্দেশ্য দু'টি। তবে অন্যান্য উদ্দেশ্যেও جملة দ্বারা خبر প্রদান করা হয় যা কালামের পূর্বাপর থেকে কিংবা পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বুঝে আসে।

خلاصة الكلام

الأَصْلُ فى الخَبَرِ أَنْ يُلْقَى لِأَحَدِ غَرَضَيْنِ

الأول : إفادةُ المخاطَبِ الحُكْمَ الذى تَضَمَّنَتْهُ الجملةَ و ذلك إذا كانَ المخاطَبُ جاهلًا بِذلك الحكمِ، و يُسمّٰى ذلك الحكمُ فائدَةَ الخبرِ .

الثاني : إفادةُ المخاطَبِ أنَّ المتكلِّمَ عالِمٌ بالحكمِ، و ذلك إذا كان المخاطَبُ عالِمًا بِالحُكْمِ قَبْلَ الإخبارِ به و يُسَمّٰى الحكمُ لازمَ فائدَةِ الخَبَرِ .

و قد يُلْقَى الخبرُ لِأَغراضٍ أخرى تُفْهَم من السِّياقِ و قَرائِنِ الأحوالِ، منها :

(أ) التوبيخ (ب) إظهار الفرَح (جـ) إظهار الضَّعْفِ (د) إظهار الأَسٰى و الحزنِ
(هـ) إظهار الأسف و الحسرة على فائِتٍ (و) الاسترحام (ح) الحثّ على شيءٍ
(ط) الذمّ (ي) الفخر (ك) الوعظ و الإرشاد و غير ذلك .

طرق القاء الخبر

আরবী ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পরিমিতি বোধ। তাই একজন আরব যখন মনের কোন ভাব প্রকাশ করেন তখন তিনি অতি যত্নের সাথে লক্ষ্য রাখেন যেন তার কথা প্রয়োজন পরিমাণ হয়, সামান্য কম বেশী না হয়। কেননা বেশী হলে তা হবে عبَث বা অর্থহীন আর কম হলে তা হবে ভাব ও উদ্দেশ্যের সুপ্রকাশের ক্ষেত্রে مُخِل বা বিঘ্ন সৃষ্টিকারী।

এ প্রসংগে বর্ণিত আছে যে, বিখ্যাত দার্শনিক আলকিন্দী একবার আবুল আব্বাস আল-মুবাররাদ-এর মজলিসে বললেন– إني لَاَجِدُ فى كَلامِ العَرَبِ حَشْوًا (আরবদের ভাষায় অপ্রয়োজনীয় শব্দ প্রয়োগ দেখা যায়।) যেমন, কখনো তারা বলে– عبد الله قائم কখনো বলে– إن عبدَ الله قائم আবার কখনো বলে– إن عبد الله لَقائم – দেখুন, এখানে অর্থ ও উদ্দেশ্য তো এক, কিন্তু শব্দ বেশ-কম হচ্ছে।

আবুল আব্বাস মৃদু হেসে বললেন, আপনি বুঝতে পারেননি। আসলে তিনটি বাক্যে শব্দের পরিমাণ যেমন বিভিন্ন তেমনি সেগুলোর অর্থ, উদ্দেশ্য ও ব্যবহারক্ষেত্রও বিভিন্ন। যেমন, প্রথম বাক্যটির উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ অবস্থায় আব্দুল্লাহ-র قيام সম্পর্কে খবর প্রদান করা আর দ্বিতীয় বাক্যটি আব্দুল্লাহ-র قيام সম্পর্কে প্রশ্নকারীর প্রশ্নের উত্তরে ব্যবহৃত। পক্ষান্তরে তৃতীয় বাক্যটি ঐ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে উচ্চারিত যে عبد الله -র قيام বা দাঁড়ানোর বিষয়টি অস্বীকার করে বলতে চায় যে, আব্দুল্লাহ দাঁড়িয়ে নেই। এ জবাব শুনে দার্শনিক সাহেব লাজবাব হয়ে গেলেন।

এ ঘটনা থেকে বোঝা গেল যে, কোন খবর প্রদানের পূর্বে مخاطَب এর চিন্তা ভাবনার প্রকৃতি সম্পর্কে متكلم এর স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে এবং সেই অনুপাতে খবর প্রদানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন جملة বলতে হবে। ঠিক যেমন চিকিৎসক রোগীর শিরায় হাত রেখে রোগের মাত্রা বুঝে অষুধের মাত্রা নির্ধারণ করে থাকেন।

তোমার مخاطَبকে যে কোন খবরই তুমি দিতে চাও না কেন, সে খবর সম্পর্কে সাধারণভাবে مخاطَب এর তিন অবস্থার কোন একটি অবস্থা হবে।

প্রথমতঃ جملة এর অন্তর্ভুক্ত যে حكمটি مخاطَب কে তুমি জানাতে চাও সে

সম্পর্কে তার চিন্তা কোন রকম পূর্বধারণা থেকে মুক্ত; অর্থাৎ এ সম্পর্কে তার কিছুই জানা নেই। এটা হলো সাধারণ অবস্থা। এ অবস্থায় তাকীদবাচক কোন অব্যয় যুক্ত না করে সাধারণ جملة ব্যবহার করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ আলোচ্য حكم টির হাঁ-না সম্পর্কে مخاطب এর চিন্তা দ্বিধাগ্রস্ত। ফলে প্রকৃত বিষয় জানবার একটা আগ্রহ তার মাঝে কাজ করছে। এ অবস্থায় তাকীদের অব্যয়যুক্ত جملة ব্যবহার করা উত্তম, যাতে مخاطب এর চিন্তা-দ্বিধা বিদূরীত হয় এবং আলোচ্য حكم টি তার চিন্তায় স্থির হয়ে যায় এবং বিপরীত চিন্তাটি সে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে।

তৃতীয়তঃ আলোচ্য হুকুমটি مخاطب অস্বীকার করছে এবং তার চিন্তা বিপরীত حكم গ্রহণ করে বসে আছে। এ অবস্থায় তাকীদের অব্যয়যুক্ত جملة ব্যবহার করা আবশ্যক হবে।

উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আরো স্বচ্ছ রূপে তোমার সামনে তুলে ধরছি।

মনে করো, তোমার বন্ধু রাশেদের ভাই পরীক্ষায় সহপাঠীদের মাঝে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এই সুখবর রাশেদের কাছে এখনো পৌছেনি। তুমি তাকে সুখবরটি দিতে চাও। এটা সাধারণ অবস্থা। সুতরাং তাকীদমুক্ত সাধারণ বাক্য দ্বারা তাকে খবর দিতে হবে। যেমন–

فازَ أخوك فى الامتحانِ عَلى أنْدادِه

এ পর্যায়ের খবরকে ابتدائي বলে।

কিন্তু যদি সে কোন অনির্ভরযোগ্য সূত্রে খবরটি পেয়ে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে তবে নিশ্চয় সে সঠিক খবরটি জানার জন্য উৎসুক হবে। এমতাবস্থায় সাধারণ তাকীদ-বাক্য যোগে খবর প্রদান করাই হবে উত্তম, যাতে সে দ্বিধামুক্ত হয়ে সুখবরটি গ্রহণ করে নিতে পারে। যেমন إن أخاك فازَ فى الامتحانِ على أنداده

এ পর্যায়ের খবরকে طلبي বলে।

পক্ষান্তরে যদি তোমার বন্ধু কোন কারণে পরীক্ষায় তার ভাইয়ের কৃতকার্যতার বিষয়টি অস্বীকার করে বিপরীত ধারণা করে বসে থাকে তাহলে তার অস্বীকৃতি ও ভুল ধারণা দূর করার জন্য তাকীদযুক্ত বাক্যযোগে খবর প্রদান করা তোমার জন্য জরুরী হবে। যেমন– إن اخاك لَفائِزٌ على أقْرانِه – এ পর্যায়ের খবরকে إنكاري বলে।

তবে মনে রাখতে হবে, আলোচ্য হুকুম সম্পর্কে مخاطب এর إنكار ও অস্বীকৃতির মাত্রা যত বেশী হবে তাকীদের মাত্রাও সে অনুসারে বৃদ্ধি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সুন্দরতম উদহারণটি আমরা তোমার সামনে তুলে ধরছি আল কোরআন থেকে। হযরত ঈসা (আঃ) আন্তাকিয়াবাসীদের মাঝে সত্য প্রচারের জন্য তাঁর তিনজন শিস্যকে দূত রূপে প্রেরণ করেছিলেন। আন্তাকিয়ার অধিবাসীরা তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। দূতগণ আন্তাকীয়দের অস্বীকৃতির জবাবে প্রথমবার বললেন, اِنَّا اليكم لَمُرْسَلون – তবু যখন তারা প্রত্যাখ্যান করলো তখন দ্বিতীয়বার তারা বললেন,

رَبُّنا يَعْلَم إنا إليكم لَمرسلون

দেখ, প্রথমবার দূতগণ তাদের বক্তব্যকে ان ও اسمية দ্বারা তাকীদ করেছেন। অতঃপর তাদের অস্বীকৃতির গুরুতর অবস্থা দেখে অতিরিক্ত তাকীদ রূপে কসম ও لام الابتداء যোগ করেছেন।

خلاصة الكلام

حَيْثُ أَنَّ الغرَضَ مِنَ الإخبارِ هو إفادَةُ المخاطَبِ يَنْبَغِي لِلمتكلم أن يكونَ كلامُه على قَدْرِ الحاجَةِ لا يَزيد و لا يَنْقُص و أَنْ يرَى حالَ المخَاطَبِ، و للمخاطَبِ ثلاثُ حالاتٍ .

(أ) أن يكونَ خالِيَ الذهنِ من الحُكْمِ، و فى هذه الحالِ يُلْقَى إليه الخبرُ خالياً مِنْ اَدَواتِ التوكيدِ و يُسَمّى هذا الضرْبُ من الخبَرِ ابْتِدائِياًّ .

(ب) ان يكونَ متردِّدًا فى الحكمِ طالِبًا أن يعرفَ حقيقَةَ الأمرِ، و فى هذه الحال يَحْسُنُ توكيدُ الخبرِ له لِيزولَ تردُّدُه و يَقِفَ على حقيقةِ الأمر، و يسمّى هذا الضربُ طلبيا .

(ج) أن يكونَ مُنْكِراً لِلحكمِ، و فى هذه الحال يجب أن يُؤَكَّدَ الخبرُ بِمُؤَكِّدٍ أو أكثرَ على حَسَبِ دَرَجَةِ الإنكار، و يسمى هذا الضربُ إنكارِيًّا .

لِتَوْكيدِ الخبَرِ أَدَواتٌ كثيرة منها إِنَّ و أَنَّ و القَسَمُ و لام الابتداءِ و نُونَا التوكيدِ و أَحْرُف التنبيهِ، و الحروف الزائدة و قَدْ و أَمَّا الشرطيَّةُ .

إخراج الكلام عن مقتضى الظاهر

পিছনের আলোচনা থেকে এ কথা তুমি জানো যে, কোন حكم সম্পর্কে مخاطب যদি خالي الذهن (বা ধারণামুক্ত) হয় তাহলে খবরটি তাকে তাকীদমুক্ত সাধারণ বাক্যযোগে প্রদান করতে হবে। আর যদি جملة এর حكم বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হয় এবং প্রকৃত বিষয় জানতে উৎসুক হয় তাহলে খবরটিকে তাকীদযুক্ত রূপে পেশ করাই উত্তম হবে। পক্ষান্তরে مخاطب যদি جملة এর حكم বা বিষয়বস্তুটি অস্বীকার করে তাহলে جملة কে তাকীদযুক্ত করা আবশ্যক হবে।

এটাই হলো مخاطب এর বাহ্যিক অবস্থার দাবী এবং مخاطب এর বাহ্যিক অবস্থার দাবী রক্ষা করে কথা বলাকে إخراج الكلام على مقتضى ظاهر الحال বলা হয়।

কিন্তু متكلم কখনো কখনো مخاطب এর মাঝে এমন কিছু বিশেষ সূক্ষ্ম অবস্থা দেখতে পান যাতে তিনি مخاطب এর বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত কথা বলতে বাধ্য হন। এখানে আমরা এ বিষয়টি তোমার সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করবো।

(ক) মনে করো, বেনামাজী মুসলমানকে লক্ষ্য করে একজন আলিম বললেন, يا أخي الصلاة واجبة – বলাবাহুল্য যে, নামাজ না পড়লেও মুসলমান হিসাবে লোকটি অবশ্যই জানে যে, নামাজ আল্লাহর ফরয হুকুম। সুতরাং مخاطب এর বাহ্যিক অবস্থার দাবী হলো এ বিষয়ে তাকে খবর প্রদান না করা। কেননা বিষয়টি সম্পর্কে তো সে পূর্ব হতেই অবগত। কিন্তু কি কারণে আলিম সাহেব مقتضى الحال (বা বাহ্যিক অবস্থার দাবী) উপেক্ষা করে مخاطب কে খবরটি দিতে গেলেন? আসলে তিনি مخاطب এর নামায ফরয হওয়ার কথা জেনেও সে অনুযায়ী আমল না করার অবস্থা দেখতে পেয়েছেন। তাই তাকে جملة এর حكم সম্পর্কে অজ্ঞ লোকের পর্যায়ে ধরে নিয়ে নামায ফরয হওয়ার খবর দেয়া হয়েছে। কেননা যে জানে না আর যে জেনেও আমল করে না তারা উভয়েই সমান। যেন তাকে বলা হলো, তোমার অবস্থা প্রমাণ করে যে, নামায ফরয হওয়ার খবর তোমার জানা নেই, কেননা জানা থাকলে তো নামায তরক করার কথা নয়। সুতরাং জেনে নাও যে, নামায হলো ফরয। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলা হয়–

تَنزيلُ العالِمِ بالحُكْمِ مَنزِلَةَ الجاهِلِ به لِعَدَمِ جَرْيِه على مقتضَى العِلْمِ

তদ্রূপ পিতামাতার সাথে অসদাচরণকারীকে যদি তুমি هما والداك বলো তাহলে যেন তুমি ধরে নিয়েছো যে, এরা দুজন তার পিতামাতা, এ কথা সে জানে না। কেননা জানলে তো অসদাচরণ করার কথা নয়।

(খ) এবার নীচের আয়াতটি লক্ষ্য করো–

ولا تُخاطِبنى في الذين ظَلموا اِنَّهم مُغْرَقون

(জালিমদের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলতে এসো না। অবশ্যই তাদেরকে ডুবিয়ে দেয়া হবে।)

দেখো, জালিমদের সম্পর্কে প্রদত্ত حكم তথা إغراقُ الظالمين সম্পর্কে مخاطَب এর চিন্তা ও যেহেন কোন রকম পূর্বধারণা ও দ্বিধা থেকে মুক্ত ছিল। সুতরাং খবরকে তাকীদমুক্ত রাখাই ছিলো مخاطَب এর বাহ্যিক অবস্থার দাবী কিন্তু আয়াত শরীফ তাকীদসহ এসেছে। এখন প্রশ্ন হলো– مقتضَى ظاهِرِ حالِ المخاطَبِ এর বিপরীত করার কারণ কি?

কারণ এই যে, আল্লাহ পাক যখন নূহ (আঃ)কে তাঁর বিরোধিতাকারীদের সম্পর্কে (সুপারিশমূলক) কোন কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন তখন এই নিষেধবাণী مخاطِب এর অন্তরে জালিমদের পরিণতি সম্পর্কে জানবার আগ্রহ সৃষ্টি করাই স্বাভাবিক। যেন مخاطَب এখন তাদের পরিণতি সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে জানতে চাচ্ছে যে, তাদের উপর ডুবিয়ে দেয়ার হুকুম জারি হয়েছে কি না। এভাবে দ্বিধাও পূর্বধারণা থেকে মুক্ত مخاطَب কে দ্বিধাগ্রস্ত প্রশ্নকারীর পর্যায়ে ধরে নিয়ে তাকীদসহ জবাব দেয়া হয়েছে– إنهم لمغرقون!

বলাবাহুল্য যে, পূর্ববর্তী নিষেধ বাক্যটি مخاطَب এর অন্তরে প্রশ্নও কৌতুহল সৃষ্টি করেছে। তাহলে তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, পূর্বধারণা থেকে মুক্ত مخاطَب কে দ্বিধাগ্রস্ত প্রশ্নকারীর স্তরে গণ্য করার জন্য শর্ত হলো পূর্বে এমন কোন বাক্য বা বক্তব্য থাকা যা مخاطَب এর অন্তরে পরবর্তী جملة এর حكم সম্পর্কে প্রশ্ন ও কৌতুহল সৃষ্টি করে। যেমন, আলোচ্য আয়াতে ولا تخاطبنى فى الذين ظلموا বাক্যটি রয়েছে।

وَ مَا اُبَرِّئُ نفسي اِنَّ النفسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ এই আয়াতটি সম্পর্কে একই কথা। اَمْرُ النفسِ بالسُّوءِ সম্পর্কে مخاطب সম্পূর্ণ রূপে خالي الذهن রয়েছে।

কিন্তু তার পূর্ববর্তী و ما ابرئ نفسي বাক্যটি এদিকে ইংগিত করে যে, সামনে নফস সম্পর্কে কোন অপ্রীয় حكم সাব্যস্ত করা হবে। ফলে مخاطب এর অন্তরে حكم টির ধরন জানবার আগ্রহ সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। এ কারণে তাকে কৌতুহলী প্রশ্নকারীর পর্যায়ে রেখে তাকীদযুক্ত খবর প্রদান করা হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলে- تَنزِيلُ غيرِ السائلِ مَنزِلَةَ السائلِ المتردِّدِ .

(গ) কবি হাজাল বিন নাযলাহ আল কায়সীর কবিতা দেখ-

جَاءَ شقيقٌ عارِضًا رُمْحَه + إنَّ بَنِيْ عَمِّك فيهم رِماحٌ

শাকীক কিন্তু অস্বীকার করছে না যে, তার প্রতিপক্ষ চাচাত ভাইদের হাতে বর্শা রয়েছে। বরং প্রতিবেশী হিসাবে এবং উভয়পক্ষে যুদ্ধাবস্থা বিদ্যমান থাকার কারণে সেটা সে ভাল করেই জানে। কিন্তু এভাবে বর্শা আড়াআড়ি রেখে অপ্রস্তুত অবস্থায় চলে আসাটা তার চূড়ান্ত বেপরোয়া ভাব প্রমাণ করে; যেন সে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত্র মনে করছে। এ অবস্থার কারণে তাকে অস্বীকারকারীর পর্যায়ে ধরা হয়েছে এবং খবরটিকে তাকীদযুক্ত রূপে পেশ করা হয়েছে; প্রকৃত অস্বীকারকারীর বেলায় যেমন করা হয়ে থাকে।

ثم اِنَّكم بَعْدَ ذلك لَمَيِّتون আয়াতটি সম্পর্কে একই কথা। সম্বোধিতগণ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত حكم তথা তাদের মৃত্যুর বিষয়টি অস্বীকারকারী ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মাঝে অস্বীকারের আলামত দেখতে পেয়েছেন। কেননা নেক আমলের মাধ্যমে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের পরিবর্তে তারা গাফলতের মাঝে ছিল। এ কারণেই তাদেরকে মৃত্যুর সম্ভাবনা অস্বীকারকারীদের স্তরে নামিয়ে এনে খবরটিকে তাকীদযুক্ত করে তাদের উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে تَنزِيلُ غَيْرِ المُنْكِرِ مَنزِلَةَ المنكرِ لِظُهورِ علاماتِ الإنكارِ বলে।

(ঘ) "আবার দেখো, আল্লাহ পাকের একত্ব অস্বীকারকারী মুশরিকদের সম্বোধন করে وَ اِلٰهكم اِلٰهٌ واحِد বলা হয়েছে। অথচ এখানে مقتضى الظاهر অনুযায়ী খবরটিকে তাকীদযুক্ত করার কথা ছিলো। কেননা তাদের সামনে এমন সব সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ রয়েছে যে, তাতে চিন্তা করলেই অস্বীকৃতির পরিবর্তে আল্লাহর একত্ব তারা মেনে নিতে পারতো।

মোটকথা, অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান থাকার কারণে তাদের অস্বীকারকে

বিবেচনায় আনা হয়নি, বরং অনস্বীকারের অবস্থায় যেমন তাকীদবিহীন جملة ব্যবহার করা হয় তাদের ক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে।

তদ্রূপ ইলমের উপকারিতা অস্বীকারকারীর উদ্দেশ্যে العلم نافع বাক্যটি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একই কথা। আর বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলে– تَنزيلُ المنْكِرِ مَنزِلَةَ غيرِ المنْكِرِ لِوُضوحِ الدلالة .

خلاصة الكلام

إذا أُلْقِيَ الخبرُ لِخَالِي الذهنِ بلا توكيدٍ، و كذا إذا أُلْقِيَ الخبرُ للسائِلِ المتردِّد مُؤَكَّدا اسْتِحْسانًا و كذا إذا أُلقِيَ الخبرُ لِلْمُنْكِرِ مُؤَكَّداً وُجوبًا كان ذلك الخبرُ جارِيًا على مقتضَى الظاهرِ .

و قد يَجْرِي الخبرُ على خِلافِ ما يَقْتَضِيه الظاهِرُ لِأَسْبابٍ يَلْحَظُها المتكلم في مخاطَبِه .

فَيُنزَّلُ العالِمُ بالحكمِ منزلةَ الجاهِلِ به، إذا لم يَعْمَلْ بِعلمِه .

و ينزَّلُ خالِيَ الذهنِ منزلةَ السائِلِ المتردِّد، إذا تقَدَّمَ فى الكلام مَا يُشير إلى حكمِ الخبرِ .

و يَجْعَلُ غيرَ المنكرِ كالمنكرِ لِظُهور أَماراتِ الإنكار عليه .

و يَجْعَلُ المنكرَ كغيرِ المنكرِ، إن كان لَدَيْهِ دَلائِلُ لو تَأَمَّلَها لَارْتَدَعَ عن إنكاره

الكلام على الإنشاء

إنشاء শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো উদ্ভাবন ও সৃষ্টি। যেমন- أَنْشَأَ اللّٰهُ الخَلْقَ .

পরিভাষায় إنشاء অর্থ এমন বাক্য উচ্চারণ করা যা সত্য বা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না।[১]

কখনো কখনো উচ্চারিত বাক্যটিকেও إنشاء বলে।

এবার নীচের উভয় প্রকার উদাহারণগুলো লক্ষ্য করো।

১। (ক) মিথ্যাবাদীকে বলা হলো- أُصْدُقْ دائِمًا

(খ) পাপাচারীকে লক্ষ্য করে বলা হলো- لا تَعْصِ ربَّك .

(গ) هل تدرس اللغةَ العربيةَ

(ঘ) ليتَ راشدًا وَ فَى بِوَعْدِه

(ঙ) يا غافلًا عن الموتِ تَنَبَّهْ

২. (ক) ما أجملَ القَصْرَ الشامِخَ

(খ) نِعم المرءُ الصَّدوقُ و بِئْسَ المرءُ الكَذوب

(গ) لَعَمْرُ كَ ما بِالعقلِ يُكْتَسَبُ الغِنَي و لا بِاكتسابِ المال يُكتَسَبُ العقلُ

(ঘ) لَعلَّ اخاك ماجدًا متواضِع

(ঙ) عَسٰى اَنْ تكرَهوا شيئًا و هو خير لكم

উভয় ভাগের বাক্যগুলো إنشاء - কেননা এর قائل কে সত্যবাদী বা মিথ্যাবাদী বলা যায় না। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে, প্রথম ভাগের বাক্যগুলো দ্বারা কোন না কোন বিষয় অর্জিত হওয়ার চাহিদা করা হয়েছে, আর চাহিদা করার সময় উক্ত বিষয়টি বিদ্যমান ছিল না। যেমন মিথ্যাবাদীর কাছ

---

[১] কেননা সত্য বা মিথ্যা হওয়ার অর্থ হলো বাক্যস্থ نسبة كلامية টি বাস্তবে বিদ্যমান نسبة واقعية এর অনুরূপ হওয়া বা না হওয়া। অথচ إنشاء এর ক্ষেত্রে শুধু نسبة كلامية রয়েছে। উক্ত نسبة এর কোন বাস্তব রূপ বিদ্যমান নেই। সুতরাং উভয় নিসবতের মাঝে মিল বা অমিল হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

থেকে সত্য বলার বিষয়টি চাহিদা করা হয়েছে। আর তখন মিথ্যাবাদীর মাঝে এ গুণটি বিদ্যমান ছিল না। তদ্রূপ পাপাচারীর কাছ থেকে عَدَمُ الْعِصْيَانِ বা নাফরমানী না করার বিষয়টি চাহিদা করা হয়েছে, আর বলাবাহুল্য যে, তখন তার মাঝে عدم العصيان গুণটি বিদ্যমান ছিল না।

তদ্রূপ তৃতীয় উদাহরণে مضمون الجملة সম্পর্কে অবগতি লাভের চাহিদা করা হয়েছে আর বলাবাহুল্য যে উক্ত বিষয়ে তখন متكلم এর অবগতি ছিল না। তদ্রূপ চতুর্থ বাক্যে রাশেদের ওয়াদা পূরণের বিষয়টি অর্জিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাও চাহিদা করা হয়েছে; যা তখনো পর্যন্ত অর্জিত হয়নি।

আর পঞ্চম বাক্যে نداء এর মাধ্যমে মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীন ব্যক্তির মনোযোগ তলব করা হয়েছে আর বলাবাহুল্য যে, উক্ত সময় متكلم এর প্রতি مخاطب এর মনোযোগ বিদ্যমান ছিল না।

মোটকথা পাঁচটি বাক্যের প্রতিটি বাক্যে এমন একটি বিষয় অর্জিত হওয়ার চাহিদা করা হয়েছে যা উক্ত সময় বিদ্যমান ছিল না। এ ধরণের إنشاء কে طلبي বলে।

আশা করি উপরের আলোচনা থেকে তুমি বুঝতে পেরেছো যে, إنشاء طلبي প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার[১] যথা– أمر، نهي، استفهام، تمني، نداء

দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করো। প্রথম ভাগের মত এগুলোও إنشاء তবে পার্থক্য এই যে, এখানে কোন বিষয় অর্জিত হওয়ার চাহিদা করা হয়নি। এজন্য এগুলোকে غير طلبي বলা হয়।

إنشاء غير طلبي প্রকাশের বহু মাধ্যম রয়েছে। প্রথম উদাহরণে فعل التعجب টি মাধ্যম হয়েছে। দ্বিতীয় উদাহরণে فعل المدح و الذم এবং তৃতীয় উদাহরণে قسم এবং শেষ দুটি উদাহরণে أَدَوَاتُ الرَّجَاءِ (সম্ভাবনাবাচক অব্যয়) ব্যবহার করা হয়েছে। কখনো কখনো صيغ العقود বা চুক্তি প্রকাশক শব্দও ব্যবহৃত হয়। যেমন– بعتُ و اشتريتُ

তবে إنشاء غير طلبي বালাগাত শাস্ত্রের আলোচনাভুক্ত বিষয় নয়। তাই এ সম্পর্কে এর বেশী কিছু বলার প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে إنشاء طلبي যেহেতু বালাগাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেহেতু আমরা পাঁচ প্রকার إنشاء طلبي এর প্রতিটি প্রকার সম্পর্কে পৃথক পৃথক অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করবো।

خلاصة الكلام

الإنشاءُ فى اللغةِ الإيجادُ و الاختراعُ و فى الاصطلاحِ هو إلقاءُ الكلامِ الذي لا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَ الكِذْبَ، لِأَنَّه ليسَ له نِسْبَةٌ خارجِيَّةٌ تُطابِقُها النسبةُ الكلامِيَّةُ أو لا تَطابِقها، و قد يُطْلَقُ على نَفْسِ الكلام الذى له هذه الصفة .

و ينقسم الكلام الإنشائي إلى قسمين طلبيٍّ وَ غَيْرِ طلبيٍّ .

الطلبيُّ ما يُطْلَبُ به أمرٌ غيرُ حاصلٍ وقتَ الطلَبِ، و يكونُ بِالأَمْرِ و النهيِ و الاستفهامِ و التمني و النداءِ .

و غير الطلبي هو انشاءٌ لا يُطْلَبُ به أمرٌ، و من أنواعِه التعجُّبُ و المدحُ و الذمُّ و القَسَمُ و افعالُ الرجاءِ و العُقود .

أقسام الإنشاء الطلبي

مبحث الأمر

أمر বা আদেশের জন্য আমরা বিভিন্ন প্রকার শব্দ ব্যবহার করে থাকি।

اعبد ربك বাক্যটি দেখো, এখানে আদেশ করার জন্য স্বয়ং فعل الأمر ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু ليعبدوا ربهم বাক্যে আদেশ করার জন্য لام الأمر যুক্ত فعل مضارع ব্যবহার করা হয়েছে। তদ্রূপ حي على الصلاة বাক্যটিতে মূল فعل الأمر এর পরিবর্তে اسم فعل الأمر ব্যবহার করা হয়েছে।

আবার দেখ, سعيًا إلى الخير এর অর্থ হলো কল্যাণের পথে সচেষ্ট হও। এখানে اسعَ এই মূল فعل الأمر এর পরিবর্তে سعيا মাছদারটি ব্যবহার করা হয়েছে। এটা হলো فعل الأمر এর স্থলবর্তী مصدر

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, আদেশ প্রকাশের জন্য মূল فعل الأمر যেমন ব্যবহার করা হয় তেমনি لام الأمر যুক্ত فعل مضارع এবং اسم فعل الأمر এবং المصدرُ النائِبُ عَنْ فعلِ الأَمْرِ ও ব্যবহার করা যায়।

এবার নীচের উদাহরণটি লক্ষ্য করো।

১। رب ابن لي عندك بيتا في الجنة তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে, أمر এর মূল অর্থ (তথা বাধ্যতামূলক আদেশ) এখানে হতে পারে না। কেননা বান্দা আল্লাহকে আদেশ করতে পারে না, دعاء বা প্রার্থনা করতে পারে। তাহলে বোঝা গেল যে, ابن এই فعل الأمر টি এখানে তার মূল অর্থের পরিবর্তে دعاء বা প্রার্থনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ছোটর পক্ষ হতে বড়র উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত فعل الأمر সাধারণতঃ دعاء বা প্রার্থনাই বোঝায়। যেমন ছাত্রের পক্ষ হতে উস্তাদকে, সন্তানের পক্ষ হতে মাতা-পিতাকে, শ্রমিকের পক্ষ হতে মালিককে ইত্যাদি।

২। বন্ধু যদি বন্ধুর উদ্দেশ্যে কিংবা সমমর্যাদার ও সমবয়সের কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্যে أمر জাতীয় শব্দ ব্যবহার করে তাহলে أمر এর মূল অর্থ গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা বন্ধু বন্ধুকে এবং সমকক্ষ সমকক্ষকে আদেশ করতে পারে না, অনুরোধ করতে পারে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে أمر তার মূল অর্থের পরিবর্তে التماس বা অনুরোধের অর্থে ব্যবহৃত হবে। যেমন তুমি তোমার বন্ধুকে বা সমবয়সীকে

বা সমকক্ষকে বললে– أعطني هذا الكتابَ

৩. সামনের কবিতা পংক্তিতে দেখো কবি ইমরাউল কায়স রাত্রকে সম্বোধন করে فعل الأمر ব্যবহার করেছেন–

أَلَا أَيُّهَا الليلُ الطويلُ أَلا انْجَلِ + بِصُبْحٍ وَ مَا الإِصْباح منك بِأَمْثَلِ

হে দীর্ঘ রাত ভোরের আলোয় উদ্ভাসিত হও। অবশ্য ভোরের আলোও তোমার চেয়ে উত্তম কিছু নয়। (কেননা আমার বিচ্ছেদ বেদনার তো তাতে ইতি হবে না।)

তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে, কবি এখানে فعل الأمر দ্বারা রাতকে ভোর হওয়ার আদেশ করছেন না। কেননা রাত তো মানুষের মত আদেশ নিষেধের পাত্র নয়। বরং কবি এখানে রাত শেষ হয়ে ভোর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছেন। কেননা তিনি ভেবেছেন, নিশি ভোর হলে হয়ত তার দুঃখের অমানিশাও দূর হবে। অবশ্য পর মুহূর্তেই কবি আবার হতাশা প্রকাশ করে বলছেন, তাতেই বা কী লাভ! ভোরের আলো তো আমার জন্য রাতের চেয়ে ভালো কিছু বয়ে আনবে না।

মোট কথা, কবি এখানে فعل الأمر কে تمني অর্থে ব্যবহার করেছেন। যে সকল বিষয় বাস্তব রূপ লাভ করার আশা নেই, সে সকল ক্ষেত্রে أمر সাধারণতঃ تمني অর্থে ব্যবহৃত হয়।

৪. নীচের আয়াতটি লক্ষ্য করো

اِذا قُضِيَتِ الصلاةُ فَانْتَشِروا في الأَرْضِ وَ ابْتَغوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

এখানে أمر এর উদ্দেশ্য বাধ্যতামূলক আদেশ নয়, বরং আমাদের কল্যাণের জন্য উপদেশ প্রদানই হলো উদ্দেশ্য। اُنظروا إلى ثَمَرِه إذا أَثْمَرَ (যখন তাতে ফল ধরে তখন তোমরা তার ফল অবলোকন করো।) এখানেও ফল অবলোকনের নিছক আদেশ প্রদান উদ্দেশ্য নয়, বরং আল্লাহর কুদরত অবলোকনের মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করাই হলো উদ্দেশ্য। মোটকথা, এখানে আমরের মূল অর্থ বাধ্যতামূলক আদেশ উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রথম আয়াতে إرشاد বা উপদেশ প্রদান এবং দ্বিতীয় আয়াতে اعتبار বা শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করাই হলো উদ্দেশ্য।

৫। كلوا مما رزقكم الله এখানে مما رزقكم الله এই অংশটি চিন্তা করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আল্লাহর দেয়া রিযিক ভক্ষণের কথা বলে আল্লাহ

আমাদের প্রতি তার অনুগ্রহ প্রকাশ করতে চাচ্ছেন। সুতরাং এখানেও বড়ত্বের ভিত্তিতে ছোটর প্রতি বাধ্যতামূলক আদেশ উদ্দেশ্য নয়। বরং امتنان বা নেয়ামতের কথা বলে অনুগ্রহ প্রকাশ করা উদ্দেশ্য।

৬। এবার নীচের আয়াতটি লক্ষ্য করো–

كُلوا وَ اشْرَبوا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لكم الخَيْطُ الاَبْيَضُ مِنَ الخيطِ الاَسْوَدِ من الفجْرِ

অর্থাৎ, ভোরের কালো রেখা থেকে শুভ্র রেখা প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত পানাহার করো।

শুভ্র রেখা দেখা দেয়া পর্যন্ত খাওয়া যাবে, কি যাবে না এ রকম একটা দ্বিধা রোযাদারদের মাঝে ছিলো। সেটা দূর করে পানাহারের বৈধতা প্রকাশ করাই হলো আলোচ্য আয়াতের فعل الأمر এর উদ্দেশ্য; বাধ্যতামূলক আদেশ উদ্দেশ্য নয়। مخاطب এর অন্তরে যদি কোন বিষয়ের বৈধতা সম্পর্কে দ্বিধা থাকে তখন إباحة ও বৈধতা প্রকাশের জন্য أمر এর শব্দ ব্যবহার করা হয় যাতে বৈধতার বিষয়টি مخاطب এর অন্তরে দৃঢ়মূল হয়।

৭। مخاطب এর পক্ষ থেকে যে কাজটি সম্পন্ন হওয়া متكلم এর অভিপ্রেত নয় বলে বোঝা যায় সে ক্ষেত্রে যদি متكلم তার مخاطب এর উদ্দেশ্যে فعل الأمر ব্যবহার করে তাহলে উক্ত أمر দ্বারা উদ্দেশ্য হবে খারাপ পরিণতি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা। যেমন অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে মনিব তার চাকরকে বললো, افعل ما بدا لك (তোমার যা ইচ্ছা কর গিয়ে।) এখানে চাকরের যা ইচ্ছা তা করা তোমার অভিপ্রেত নয়। সুতরাং এটা আদেশ নয়; হুঁশিয়ারি বা تهديد

আল্লাহর নিদর্শনাবলী অস্বীকারকারীদের উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ বলেছেন اِعْمَلوا ما شِئْتُمْ اِنَّه بما تَعملون بصير এখানেও একই কথা।

৮। خذ هذا أو ذاك এ বাক্যে مخاطب কে এইটি কিংবা সেইটি গ্রহণের আদেশ করা হয়েছে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে উভয়টির যে কোন একটি গ্রহণের বিষয়ে তাকে ইচ্ছা প্রদান করা। অর্থাৎ উভয়টিকে একত্র করা চলবে না। যে কোন একটি নিতে হবে। এখানে فعل الأمر টি تخيير বা ইচ্ছা প্রদানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৯। সামনের আয়াতটি লক্ষ্য করো– اَنفِقوا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لن يُتقَبَّلَ منكم এখানে إنفاق এর আদেশ করা উদ্দেশ্য নয়, বরং এ কথা বোঝানো উদ্দেশ্য যে,

ইচ্ছায় খরচ করো কিংবা অনিচ্ছায় খরচ করে দুটোই তোমাদের জন্য সমান। পরবর্তী لن يتقبل منكم থেকে এ কথা বোঝা গেছে।

মোটকথা, এখানে কবুল না হওয়ার ক্ষেত্রে إنفاق এর উভয় অবস্থা সমান এ কথা বোঝানো হয়েছে। তাহলে বোঝা গেল فعل الأمر কখনো কখনো তার মূল অর্থের পরিবর্তে تَسْوِيَةٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ বা দুটি অবস্থার অভিন্নতা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়।

১০। দেখো, রাসূলুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহর পক্ষ হতে কোরআন নাযিল হওয়ার বিষয়ে যারা সন্দেহ করেছে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বলেছেন– فَأْتوا بِسُوْرَةٍ من مثله *

বলাবাহুল্য যে, কোরআনের অনুরূপ একটি সূরা পেশ করার আদেশ প্রদান এখানে উদ্দশ্য নয়। কেননা এটা তাদের শক্তি ও ক্ষমতার বাইরে, বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করা এবং তাদের অক্ষমতা ঘোষণা করা।

নীচের কবিতা পংক্তিটি সম্পর্কেও একই কথা.

أُرونِيْ بَخِيلًا طالَ عُمْرًا بِبُخْلِه + وَ هاتوا كريـمًا ماتَ مِنْ كَثْرَةِ الْبَذْلِ

অর্থাৎ এমন কোন কৃপণকে তোমরা দেখাতে পারবে না যে কৃপণতার কারণে দীর্ঘ জীবন লাভ করেছে। তদ্রূপ এমন দানশীলের উদাহরণও দেখাতে পারবে না যে তার দানশীলতার কারণে অকালে মৃত্যুবরণ করেছে।

এই বিশেষ অর্থে أمر এর ব্যবহারকে বালাগাতের পরিভাষায় تعجيز (বা অক্ষমকরণ) বলা হয়।

১১। مخاطبকে অপদস্থ ও নাজেহাল করার উদ্দেশ্যেও আমরের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, كونوا حجارة او حديدا – এখানে কাফিরদেরকে পাথর বা লৌহে রূপান্তরিত হওয়ার আদেশ করা উদ্দেশ্য নয়, বরং তাদের প্রতি তুচ্ছতা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য।

কবি জারীর তার প্রতিদ্বন্দ্বী কবি ফারাযদাককে দেখো কেমন নাজেহাল করছেন–

خُذوا كُحْلًا وَ مِجْمَرةً وَ عِطْرًا + فَلَسْتُم يا فَرَزْدَقُ بِالرجالِ
وَ شَمُّوا رِيْـحَ عبيتِكم فَلَسْتُم + بِأُصْحابِ العِنَاقِ وَلا النِّزالِ

আতর সুরমা মেখে বসে থাকো হে ফারাযদাক, তোমরা তো আর মরদবেটা নও কিংবা ফুলের খুশবু শুঁকে বেড়াও। তোমরা তো আর লড়াকু যোদ্ধা নও।

এখানে خذوا ও شموا এ দুটি فعل الأمر তাদের মূল অর্থের পরিবর্তে تحقير ও اهانة বা তুচ্ছতা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মোটকথা, উপরের আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, أمر এর মূল অর্থ হচ্ছে বড়ত্বের ভিত্তিতে বাধ্যতামূলকভাবে কোন فعل তলব করা। তবে কখনো কখনো মূল অর্থের পরিবর্তে বিভিন্ন অর্থে আমরকে ব্যবহার করা হয়। বালাগাতের পারদর্শী ব্যক্তি বাক্যের পূর্বাপর থেকে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে তা বুঝতে পারেন।

خلاصة الكلام

حقيقةُ الأمرِ هى طَلَبُ الفعلِ على وَجْهِ الاسْتِعْلاءِ و يُقْصَدُ بِالاسْتِعْلاءِ اَنَّ الآمِرَ يَعُدُّ نفسَه أَعْلٰى مِنَ المُخاطَبِ .

لِلْأمرِ أربعُ صِيَغٍ : فعلُ الأمرِ، و المضارِعُ المقرونُ بِلام الأمرِ و اسمُ فعلِ الأمر و المصدرُ النائِبُ عن فعلِ الأمر .

و قد يَخرج الأمرُ عن معناه الحقيقِيِّ إلى مَعانٍ أُخْرٰى، تُفْهَمُ مِنَ القرائِنِ و هي :

الدُّعاء، الالْتِماسُ، التَمَنِّي، الإرشاد، الاعتِبار، الامتنانُ، الإباحَةُ، التهديد، التَّخْيِيْرُ، التَّسْوِيَةُ بينَ أمرين، التحقير و الإهانة .

مبحث النهي

পরিভাষায় نهي অর্থ বড়ত্বের ভিত্তিতে কাওকে কোন কাজ বর্জন করতে বা কোন কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা। যেমন আল্লাহ বলেছেন–

لا تُفسِدُوا فى الاَرْضِ بعدَ إصْلاحِها

দেখো, لا تُفسدوا একটি فعل النهي – এখানে এই فعل টি দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তিদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে افساد (বা ফাসাদ সৃষ্টি করা) থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। আর فعل টি বড়র পক্ষ হতে অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে ছোটর উদ্দেশ্যে অর্থাৎ বান্দার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে।

এ কথা তুমি আগে জেনেছো যে, আমরের অর্থ প্রকাশের জন্য মোট চার প্রকার শব্দ রয়েছে। نهي এর ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। এখানে মাত্র এক প্রকার শব্দ রয়েছে আর তা হলো لا الناهية যুক্ত فعل مضارع যেমন উপরের উদাহরণে তুমি দেখতে পাচ্ছো।

أمر কে যেমন তার মূল অর্থের পরিবর্তে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয় তেমনি نهى কেও কখনো কখনো তার মূল অর্থের পরিবর্তে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। বিচক্ষণ শ্রোতা বাক্যের পূর্বাপর অবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক আলামত বা قرائن থেকে সে সকল অর্থ বুঝতে পারেন। নীচের আলোচনাটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়লে বিষয়টি তোমার সামনে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

১. নীচের আয়াতটি লক্ষ্য করো–

رَبَّنا لا تُؤاخِذْنَا إنْ نَسِيْنا اَوْ اُخْطَأْنَا

দেখো, এখানে ছোটর পক্ষ হতে বড়কে লক্ষ্য করে فعل النهي ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং نهي এর মূল অর্থ এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে না, বরং دعاء বা প্রার্থনা উদ্দেশ্য হবে; যেমনটি হয়েছে أمر এর ক্ষেত্রে।

দেখো, জনৈক কবি فعل النهي প্রয়োগ করে কেমন সুন্দর প্রার্থনা করেছেন–

لا تَكِلْنِيْ إلى الزَّمانِ فَإنِّيْ + بِفِجَاجِ الزَّمانِ غيرُ خبيرِ

হে আল্লাহ! কালের নির্দয় হাতে আমাকে সোপর্দ কর না। কেননা কালের অন্ধকার অলিগলি সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।

২. ইতিপূর্বে তুমি জেনেছো যে বন্ধুর পক্ষ হতে বন্ধুকে কিংবা সমকক্ষের

পক্ষ হতে সমকক্ষকে আদেশ করা হয় না; অনুরোধ করা হয়। نهي সম্পর্কেও একই কথা। অর্থাৎ এখানেও نهي এর মূল অর্থ নিষেধ না হয়ে التماس বা অনুরোধ হবে। দেখ, হযরত হারুন (আঃ) তাঁর সহোদর ভাই হযরত মূসা (আঃ)কে সম্বোধন করে (আল কোরআনের ভাষায়) বলেছেন–

يَا ابْنَ اُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِيْ وَ لا بِرَأْسِيْ

তদ্রূপ তুমি যদি তোমার বন্ধুকে বল لا تَبْـرَحْ مَكَانَكَ حَتّٰى اُعـودَ তাহলে এখানেও نهي এর মূল অর্থ উদ্দেশ্য না হয়ে অনুরোধই উদ্দেশ্য হবে।

৩। নীচের কবিতায় দেখো, প্রিয়জনের সান্নিধ্য সুখে আত্মহারা কবি রাতকে সম্বোধন করে বলছেন–

يا ليلُ طُلْ يا نومُ زُلْ + يا صُبْحُ قِفْ لا تَطْلُعِيْ

হে রাত! দীর্ঘ হও, হে তন্দ্রা দূর হও, হে ভোরের সূর্য নিশ্চল থাকো, উঁকি দিও না।

বলাবাহুল্য যে, ليل، نوم، صبح ইত্যাদি কবির আদেশ-নিষেধের পাত্র নয়। কবি শুধু মনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছেন যাতে বিনিদ্র রজনিতে প্রিয়জনের সান্নিধ্য সুখ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে পারে। সুতরাং এখানে তিনটি أمر ও একটি نهي তাদের মূল অর্থের পরিবর্তে تمني ও আকাঙ্ক্ষার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. হযরত খানসা তার নিহত ভাই ছাখর-এর শোক-স্মরণে যে মারছিয়া বলেছেন তার একটি পংক্তি এখানে উল্লেখ করা যায়।

أَعَيْنَيَّ جُوْدا وَ لا تَجْمُدا + أَلا تَبْكِيَانِ لِصَخْرِ النَّدَى

চক্ষুদ্বয়, অকাতরে অশ্রু বর্ষণ করো; জমাট বেঁধে থেকো না। মহানুভব ছাখারের শোকে তোমরা কেন কাঁদবে না।

৫. মনিব যদি তার অবাধ্য চাকরকে লক্ষ্য করে বলেন, لا تَمْتَـثِلْ أَمْـرِى (আমার কথা শুনতে হবে না) তাহলে বলাই বাহুল্য যে, لا تمتثل এই فعل النهي এর উদ্দেশ্য চাকরকে মনিবের আদেশ মান্য করা থেকে বিরত থাকতে বলা নয়। কেননা চাকর আদেশ মান্য করুক এটাই তো প্রত্যেক মনিবের চাহিদা। সুতরাং বোঝা গেলো যে, এখানে لا تمتثل দ্বারা উদ্দেশ্য হলো تهديد বা হুঁশিয়ারি প্রদান করা অর্থাৎ মনিব যেন বলতে চান, ঠিক আছে আমার আদেশ মান্য কর

না, আমিও দেখে নেবো তোমাকে।

৬. নীচের কবিতাটি দেখো–

إذا نَطقَ السَّفِيهُ فَلا تُجِبْهُ + فَخَيْرٌ مِنْ إجابَتِهِ السُّكوتُ

আশা করি তুমি বুঝতে পারছো যে, কবি এখানে তোমাকে উপদেশ দিচ্ছেন যে, মূর্খ লোকের কথার জবাবে তোমার কী করণীয়। সুতরাং উপদেশের ক্ষেত্রে أمر যেমন তার মূল অর্থে ব্যবহৃত হয় না তেমনি نهي ও তার মূল অর্থে ব্যবহৃত হয় না। বালাগাতের পরিভাষায় أمر ও نهي এর উপদেশমূলক অর্থকে الإرشاد বলে।

৭. নীচের কবিতায় দেখো, যারা মানুষকে তো মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে কিন্তু নিজেরা তা থেকে বিরত থাকে না কবি তাদেরকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করছেন।

لا تَنْهَ عن خُلُقٍ وَ تَأْتِيَ مِثْلَه + عَـارٌ عليك إذا فعلتَ عَظِيمُ

নিজে যে অন্যায় করো তা থেকে অন্যকে বাধা দিতে পারো না। যদি তা করো তাহলে তোমার জন্য সেটা হবে বিরাট কলংক।

পক্ষান্তরে কবি حطيئة যাবারকান বিন বদরের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বলছেন।

دَعِ المَكارِمَ لا تَرْحَلْ لِبُغْيَتِها + وَ اقْعُدْ فَإنَّكَ أنتَ الطاعِـمُ الْكاسِي

মহত্ত্ব লাভের আশা ছেড়ে দাও। সে চেষ্টায় নেমো না, বরং চুপটি মেরে ঘরে বসে থাকো। তোমার কাজ তো হলো খাওয়া দাওয়া আর সাজগোজ।

মোটকথা উপরের আলোচনা থেকে জানা গেল যে, نهي এর মূল অর্থ হচ্ছে বড়ত্বের ভিত্তিতে কাওকে বাধ্যতামূলকভাবে কোন কাজ বর্জন করতে বলা তবে কোন কোন ক্ষেত্রে فعل النهي তার মূল অর্থের পরিবর্তে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বালাগাতশাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তি বাক্যের পূর্বাপর থেকে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে তা বুঝতে পারেন।

خلاصة الكلام

حقيقةُ النهيِ هي طلبُ الكَفِّ عَنِ الفعلِ عَلى وَجْهِ الاستعلاءِ.

و له صيغةٌ واحدة و هي المضارِع معَ لا الناهيةِ و قد يخرج النهيُ عن معناه الحقيقيِّ إلى معانٍ أُخْرٰى تُفْهَمُ من سِيَاقِ الكلام و القَرائنِ و من هذه المعاني ـ

الدعاءُ و الالتماسُ و التمنِّي و الارشاد، و التهديد و التوبيخَ و التحقير ·

مبحث الاستفهام

انشاء طلبي এর তৃতীয় প্রকার হলো الاستفهام

الاستفهام (বা প্রশ্নকরণ) অর্থ হলো বিশেষ অব্যয় যোগে আজানা কোন বিষয় জানতে চাওয়া। আরবীতে استفهام বা প্রশ্নের জন্য বেশ কিছু অব্যয় রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান হলো দুটি। যথা, أ ও هل

এখানে আমরা অব্যয় দুটির অর্থগত ও ব্যবহারগত পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা করবো। তবে মূল আলোচনাটি সহজে বোঝার জন্য প্রথমে تصور ও تصديق শব্দ দুটি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা দরকার।

সোজা কথায় نحو এর পরিভাষায় যেগুলোকে আমরা مفرد বলি এবং مركب غير مفيد বলি সেগুলোর علم ও জ্ঞানলাভকে تصور বলা হয় এবং مركب تام এর মাঝে বিদ্যমান نسبة এর علم ও জ্ঞানলাভকে تصديق বলা হয়।

যেমন كتاب একটি مفرد শব্দ। শব্দটি শোনার পর তোমার ذهن ও চিন্তায় একটি ছবি ভেসে উঠবে। তদ্রূপ بيت، كرسي، قلم শব্দগুলো শোনার পর একটি করে ছবি তোমার চিন্তায় ভেসে উঠবে।

তদ্রূপ كتاب راشد একটি مركب غير مفيد – এই مركب টি শোনার পর দুটি বস্তুর সম্মিলিত একটি ছবি তোমার চিন্তায় ভেসে উঠবে। إمام المسجد، قلم جميل ইত্যাদি مركب সম্পর্কেও একই কথা।

মনে রেখো, কোন مفرد বা مركب غير مفيد শোনার পর চিন্তায় যে ছবির উদ্ভাস ঘটে সেটাকে تصور বলে। আরবীতে تصور এর পরিচয় এভাবে দেওয়া হয়। التَّصَوُّرُ هو إدراكُ المفرَدِ (أو النسبةِ الناقصَة)।

পক্ষান্তরে عَلِيٌّ مسافِرٌ একটি مركب تام – এখানে একটি إسناد বা نسبة تامة রয়েছে। সুতরাং علي مسافر কথাটা শোনার পর একটি نسبة تامة এর ছবি তোমার চিন্তায় ভেসে উঠবে। যে কোন مركب تام সম্পর্কে একই কথা।

মনে রেখো, কোন مركب تام শোনার পর শ্রোতার চিন্তায় যে বক্তব্যমূলক ছবির উদ্ভাস ঘটে সেটাকে تصديق বলে। আরবীতে تصديق এর পরিচয় এভাবে দেওয়া হয়- التصديقُ هو إدراكُ النسبَةِ – আশা করি বিষয়টি তুমি মোটামুটিভাবে বুঝতে পেরেছো।

এবার আমরা أ ও هل অব্যয় দুটির আলোচনা শুরু করি

أَ خالِدٌ سافَرَ أم محمودٌ এ প্রশ্নটি করার অর্থ হলো বাক্যস্থ نسبة সম্পর্কে আমার জানা রয়েছে। অর্থাৎ خالد বা محمود এ দুজনের যে কোন একজন থেকে সফর সংঘটিত হয়েছে, একথা আমি জানি। কিন্তু দুজনের কোন জন তা সুনির্দিষ্টভাবে আমার জানা নেই, আমার প্রশ্নের مخاطِب তা জানে। তাই তার কাছে থেকে সফরকারী ব্যক্তিটির পরিচয় নির্ধারণ চাচ্ছি। সুতরাং مخاطِب এ প্রশ্নের উত্তরে শুধু محمود বা خالد বলে ব্যক্তিটি নির্ধারণ করে দেবে। সোজা কথায় সমগ্র বাক্যটি সম্পর্কে আমার প্রশ্ন নয়। বরং বাক্যের একটি অংশ সম্পর্কে আমার প্রশ্ন। পরিভাষায় এভাবে বলা যায় যে, এখানে نسبة সম্পর্কে আমার প্রশ্ন নয়। বরং مفرد সম্পর্কে আমার প্রশ্ন। এভাবেও বলতে পার যে, এখানে আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য تصديق নয়; বরং تصور

তদ্রূপ أَ كاتِبٌ أنتَ أم شاعِرٌ এ প্রশ্নের অর্থ হলো, كتابة কিংবা شعر এ দু'টি গুণের যে কোন একটি গুণের সাথে তোমার نسبة বা সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু সেই গুণটি كتابة না شعر তা সুনির্দিষ্টভাবে আমার জানা নেই। সেটাই তোমার কাছে জানতে চাচ্ছি। অর্থাৎ আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য সমগ্র বাক্য বা نسبة নয়; বাক্যের বিশেষ অংশ বা مفرد হচ্ছে আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য। কিংবা এভাবেও বলতে পারো যে, আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য تصديق নয়; বরং تصور ।

أَتُفَّاحَةً أكلت أم رُمَّانَةً এখানেও جملة এর نسبة সম্পর্কে আমার প্রশ্ন নয়। কেননা, তুমি খেয়েছো এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত এবং আপেল কিংবা আনার এ দু'টির যে কোন একটি খেয়েছো তাও আমি নিশ্চিতভাবে জানি। শুধু জানি না যে, দু'টির কোন্‌টি তুমি খেয়েছো, সেটাই জানতে চাচ্ছি। সুতরাং এখানেও جملة এর نسبة বা تصديق আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য নয়, বরং مفرد বা تصور হলো

আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য।

তদ্রূপ أَ راكِبًا قَدِمْتَ أم ماشِيًا প্রশ্নটিকেও তুমি একইভাবে ব্যাখ্যা করতে পারো। অর্থাৎ এখানেও نسبة সম্পর্কে প্রশ্ন নয়। কেননা متكلم এর তা জানা রয়েছে। বরং نسبة এর حال সম্পর্কে প্রশ্ন। কেননা প্রশ্নকারী এ বিষয়ে সন্দিহান যে, قدومك এই نسبة টি ركوب এর অবস্থায় সম্পন্ন হয়েছে নাকি مشي এর অবস্থায়।

তদ্রূপ أ يومَ الجُمُعةِ تسافِرُ أم يومَ السبتِ বাক্যের نسبة টি প্রশ্নের বিষয় নয়, বরং نسبة এর কাল বা ظرف হলো প্রশ্নের বিষয়।

মোটকথা همزة الاستفهام দ্বারা উপরের বাক্যগুলোতে বিদ্যমান نسبة সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়নি, কেননা نسبة টি সম্পন্ন হওয়ার বিষয় প্রশ্নকারীর জানা রয়েছে। বরং نسبة এর কোন একটি অংশ সম্পর্কেই শুধু প্রশ্ন করা হয়েছে।

প্রশ্নের উদ্দিষ্ট অংশটি مسند إليه হতে পারে, যেমন প্রথম উদাহরণে, কিংবা مسند হতে পারে, যেমন দ্বিতীয় উদাহরণে, কিংবা مفعول কিংবা حال কিংবা ظرف হতে পারে। যেমন তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম উদাহরণে কিংবা অন্যান্য বাক্যাংশ হতে পারে। যেমন أ في المسجدِ صليتَ أم في البيتِ

উপরের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করলে তুমি দুটি বিষয় দেখতে পাবে, প্রথমতঃ বাক্যের যে অংশটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা উদ্দেশ্য সেটি همزة الاستفهام এর সংলগ্ন রয়েছে। যেমন প্রথম বাক্যে প্রশ্নের ক্ষেত্র হলো مسند إليه আর তা همزة الاستفهام এর সংলগ্ন রয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্যে প্রশ্নের ক্ষেত্র হলো مسند তাই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম করে সেটাকে مسند إليه এর পূর্বে এনে همزة এর সংলগ্ন করা হয়েছে। অন্যান্য উদাহরণগুলো এভাবে দেখে নাও।

দ্বিতীয়তঃ همزة الاستفهام এর পরে أم অব্যয়যোগে مسئول عنه এর সমতুল্য একটি مفرد উল্লেখ করা হয়েছে। সমতুল্য এই অর্থে যে, উভয়টির إعراب ও جهة الإعراب অভিন্ন। এটাকে مُعادِل (সমতুল্য) বলা হয় এবং এই ধরনের أم কে متصلة বলা হয়। কেননা পূর্ববর্তী প্রশ্নের সাথে তার اتصال বা সম্পর্ক রয়েছে। তবে أم ও তার পরবর্তী معادل কে উহ্য বা অনুক্তও রাখা যায়। যেমন–

أ محمد مسافر (أم خالد) ۰ أ شاعر أنت (أم كاتب) ۰ أ راكبا قدمت (أم ماشيا)

হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর উদ্দেশ্যে তার ক্রুদ্ধ পিতার বক্তব্য (কোরআনের ভাষায়) দেখ, أَ راغِبٌ أنتَ عن آلِهَتِيْ يا ابراهيم এখানে। أم راغب فيه উহ্য রয়েছে।

এবার নীচের উদাহরণটি লক্ষ্য করো।

أَ تُحْرِقُ النارُ. এখানে প্রশ্নের অব্যয় রূপে همزة الاستفهام ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নকারী এখানে جملة এর نسبة সম্পর্কে অজ্ঞ। অর্থাৎ نار এর সাথে إحراق এর نسبة সাব্যস্ত আছে কি নেই এ বিষয়ে সে দ্বিধাগ্রস্ত। সুতরাং এই نسبة টির ثبوت বা نفى সম্পর্কে সে জানতে চাচ্ছে। অর্থাৎ তার প্রশ্নের উদ্দেশ্য نار নয় কিংবা إحراقও নয় বরং প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে ثُبوتُ الإحراقِ لِلنّارِ

পরিভাষায় এভাবে বলা যায় যে, এখানে প্রশ্নের উদ্দেশ্য معرفة المفرد বা تصور নয় বরং প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো معرفة النسبة বা تصديق – সুতরাং مخاطب এ প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দিতে চাইলে বলবে نعم (تحرق النار) পক্ষান্তরে নেতিবাচক উত্তর দিতে চাইলে বলবে لا (لا تحرق النار)

أَ يَنفَعُ العِلْمُ এখানে প্রশ্নকারীর জানা নেই যে, علم এর সাথে نفع এর نسبة সাব্যস্ত রয়েছে কিনা। তাই সে نفع العلم এই نسبة টির ثبوت বা عدم الثبوت সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে। অর্থাৎ তার প্রশ্নের উদ্দেশ্য العلم কিংবা نفع নয় বরং প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে ثُبوتُ نَفْعِ العلمِ সম্পর্কে জানা।

পরিভাষায় এভাবে বলা যায় যে, এখানে প্রশ্নের উদ্দেশ্য معرفة المفرد বা تصور নয় বরং প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল معرفة النسبة বা تصديق। সুতরাং مخاطب আলোচ্য প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দিতে চাইলে বলবে نعم (ينفع العلم) পক্ষান্তরে নেতিবাচক উত্তর দিতে চাইলে বলবে لا (لا ينفع العلم)

أَ عَلِيٌّ مسافِرٌ বাক্যটি দেখো, এখানে প্রশ্নকারী جملة এর نسبة বা حكم সম্পর্কে অজ্ঞ। এখন সে জানতে চাচ্ছে যে, علي এর সাথে سفر এর نسبة সাব্যস্ত হয়েছে কি না। অর্থাৎ তার প্রশ্নের উদ্দেশ্য علي নয় سفرও নয়, বরং প্রশ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে ثُبوتُ السفرِ لِعَلِيٍّ সম্পর্কে জানা।

সুতরাং مخاطب এ প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তরে বলবে– نعم (علي مسافر) – পক্ষান্তরে নেতিবাচক উত্তরে বলবে– لا (ليس علي بمسافر) –

একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, همزة الاستفهام এর পরে فعل ব্যবহৃত

হলে বাহ্যত উভয় অর্থের সম্ভাবনা থাকে। যেমন, أَ أَكْرَمْتَ مَحْمُودًا বাক্যটি দ্বারা طلب التصور উদ্দেশ্য হতে পারে। তখন অর্থ হবে, হে مخاطب তোমার সাথে একটি فعل এর نسبة সম্পন্ন হয়েছে এটা জানি। কিন্তু সেটা কি إكرام না إهانة তা জানা নেই, সেটা জানাই হলো আমার আলোচ্য প্রশ্নের উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে طلب التصديق ও উদ্দেশ্য হতে পারে। তখন অর্থ হবে, তোমার সাথে إكرام ফেয়েলটির نسبة সম্পন্ন হয়েছে নাকি হয়নি তা আমার জানা নেই, সেটা জানাই আমার উদ্দেশ্য। অবশ্য قرينة বা علامة দ্বারা উদ্দেশ্য নির্ধারিত হতে পারে। যেমন همزة সংলগ্ন فعل টির معادل উল্লেখ করা হলো أم অব্যয় যোগে। এখন فعل এর نقيض যদি তার معادل হয় তাহলে طلب التصديق উদ্দেশ্যে হবে। যেমন أ أكرمتَ محمودًا أم لم تُكْرِمْه পক্ষান্তরে معادل যদি نقيض না হয় তাহলে طلب التصور উদ্দেশ্যে হবে। যেমন أ أكرمتَ محمودًا أم أهنتَه

আমাদের এ পর্যন্ত আলোচনার সার সংক্ষেপ এই–

২৫ استفهام অর্থ বিশেষ অব্যয় যোগে কোন অজানা বিষয় সম্পর্কে জানতে চাওয়া। استفهام এর প্রধান অব্যয় দুটি যথা همزة ও هل

همزة الاستفهام কে দুটি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। যথা طلب التصور ও طلب التصديق

تصور অর্থ جملة এর অংশবিশেষ বা مفرد সম্পর্কে প্রশ্ন করা। এ অবস্থায় প্রশ্নের উদ্দিষ্ট مفرد টি همزة এর সংলগ্ন হয় এবং তার পরে সাধারণতঃ أم অব্যয়যোগে একটি معادل বা সমতুল্য শব্দ উল্লেখ করা হয়।

পক্ষান্তরে تصديق অর্থ نسبة সম্পর্কে প্রশ্ন করা। এ অবস্থায় أم এর পরে معادل উল্লেখ করা নিষিদ্ধ।

هل অব্যয়টি শুধু نسبة এর ثبوت ও عدم ثبوت সম্পর্কে প্রশ্ন করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

همزة التصور এর পরে ব্যবহৃত أم অব্যয়টিকে متصلة বলে। অর্থাৎ أم এর পরবর্তী معادل টি পূর্ববর্তী প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। তবে কখনো কখনো معادل টি বিবেচনায় থাকলেও বাক্যে অনুক্ত থাকে। যেমন আল কোরআনের আয়াত

أَ أَنتَ فعلتَ هذا بِآلِهَتِنَا يا ابراهيم

এখানে أم غيرُك অংশটি অনুক্ত হয়েছে।

পক্ষান্তরে همزة التصديق এর পরে কিংবা هل এর পরে ব্যবহৃত أم অব্যয়টি হলো منقطعة অর্থাৎ তা পূর্ববর্তী প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত নয়। অন্য কথায় বলা যায় যে, أم এর পরবর্তী جملة টি استفهام বা إنشاء হবে না বরং خبرية হবে।

هل সম্পর্কে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে আমরা তোমাকে বলতে চাই। নীচের উদাহরণটি দেখ,

هلِ العَنْقاءُ موجودةٌ এখানে عنقاء এর অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে هل الشمس طالعة বাক্যে সূর্যের সাথে উদয়ের সম্পর্ক হয়েছে কিনা জানতে চাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম বাক্যে একটি জিনিসের وجود সম্পর্কে শুধু জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্যে একটি জিনিসের জন্য আরেকটি জিনিসের অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে।

শুধু একটি জিনিসের অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা হলে هل অব্যয়টিকে بسيطة বলে।

পক্ষান্তরে একটি জিনিসের জন্য আরেকটি জিনিসের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন হলে هل অব্যয়টিকে مركبة বলে।

بقية ادوات الاستفهام

এ পর্যন্ত আমরা استفهام (বা প্রশ্নের) দুটি প্রধান অব্যয় همزة ও هل সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ ছাড়া استفهام এর আরো নয়টি অব্যয় রয়েছে। যথা–
أي ও كم، أنى، كيف، أين، أيان، متى، من، ما

এখানে আমরা استفهام এর অবশিষ্ট অব্যয়গুলো সম্পর্কে আলোচনা করবো।

প্রথমেই তোমাকে মনে রাখতে হবে যে, এ নয়টি অব্যয় দ্বারা جملة এর نسبة বা تصديق সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় না বরং جملة এর অংশবিশেষ বা مفرد বা تصور সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তবে একেকটি অব্যয় দ্বারা একেকটি مفرد সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। যেমন من অব্যয় দ্বারা কোন عاقل সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। অর্থাৎ نسبة টি যে عاقل এর সাথে যুক্ত তাকে নির্ধারণ ও চিহ্নিত করতে বলা হয়। যেমন, مَنْ فتحَ مِصْرَ এখানে من অব্যয় যোগে প্রশ্ন করার অর্থ এই যে, فتح مصر এই نسبة টি সম্পন্ন হয়েছে তা আমি জানি। সুতরাং সে

সম্পর্কে আমার কোন প্রশ্ন নেই। কিন্তু এই نسبة টি কোন ব্যক্তির সাথে যুক্ত হয়েছে তা আমার জানা নেই। সেই ব্যক্তিটিকে নির্ধারণ করে দেওয়া হোক এটাই হলো আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য। এই নির্ধারণের বিষয়টি নাম উল্লেখের মাধ্যমে হতে পারে আবার গুণ উল্লেখের মাধ্যমে হতে পারে, যেমন– . من هذا এর উত্তরে বলা হলো هذا محمد কিংবা هذا معلم

ما অব্যয় দ্বারা কোন শব্দের নিছক শব্দার্থ জানতে চাওয়া হয় কিংবা শব্দটি যে অর্থের জন্য তৈরী হয়েছে সেই অর্থের হাকীকত সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। যেমন عسجد শব্দটির অর্থ তোমার জানা নেই। তাই তুমি প্রশ্ন করলে ما العَسْجَدُ তখন উত্তরে বলা হলো العسجد هو الذهب – পক্ষান্তরে যদি তুমি প্রশ্ন কর ما الذهب তাহলে বোঝা যাবে যে, ذهب এর নিছক শব্দার্থ জিজ্ঞাসা করা তোমার উদ্দেশ্য নয়, কেননা এটা তুমি জান, বরং তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে পদার্থটিকে ذهب বলা হয় সেই পদার্থটির হাকীকত সম্পর্কে প্রশ্ন করা। সুতরাং এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে–

الذَهَبُ هو مَعْدِنٌ ثَمينٌ يُسْتَخْرَجُ من باطنِ الأرضِ

তদ্রূপ ما اللجين এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো শব্দার্থ জানতে চাওয়া। সুতরাং এর উত্তর হবে اللجين هو الفضة – পক্ষান্তরে ما الانسان এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য হলো إنسان এর হাকীকত জানতে চাওয়া। সুতরাং এর উত্তর হবে الإنسان هو الحيوان الناطق –

মোটকথা, শব্দার্থ জানতে চাওয়া হলে উক্ত শব্দের পরিচিত কোন প্রতিশব্দ উল্লেখ করতে হবে। পক্ষান্তরে কোন বস্তুর হাকীকত জানতে চাওয়া হলে তার পরিচয় উল্লেখ করতে হবে।

কখনো কখনো ما দ্বারা جنس বা জাতি ও শ্রেণী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। যেমন ما عندك অর্থাৎ তোমার নিকট কোন জাতীয় বা কোন শ্রেণীর জিনিস রয়েছে? উত্তর হলো كتاب (কিংবা অন্য কিছু)

কখনো আবার ما অব্যয় দ্বারা গুণ ও অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। যেমন ما زيد অর্থাৎ ما صفةُ زيدٍ উত্তর হলো كريم বা (এ জাতীয় কিছু)

متى অব্যয় দ্বারা বাক্যস্থ نسبة এর সময়কাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। অর্থাৎ বাক্যস্থ نسبة সংঘটিত হওয়ার সময়টি নির্ধারণ করতে বলা হয়।

প্রশ্নটি ماض বা مستقبل উভয় ক্ষেত্রে হতে পারে। যেমন متى جئتَ উত্তর হলো صباحا কিংবা مساء কিংবা এ জাতীয় কিছু। তদ্রূপ متى تسافر উত্তর হলো غدا কিংবা بعد شهر কিংবা এ জাতীয় কিছু।

أيان অব্যয় দ্বারা শুধু ভবিষ্যতকাল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় এবং সাধারণতঃ কোন গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুতর বিষয়ে প্রশ্নের জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন– أيان يوم القيامة –

সুতরাং متى ও أيان এর মাঝে দুটি ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। প্রথমতঃ متى অব্যয়টি অতীত ও ভবিষ্যত উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। পক্ষান্তরে أيان এর ব্যবহার ক্ষেত্র হলো শুধু ভবিষ্যতকাল।

দ্বিতীয়তঃ متى সাধারণ ও গুরুতর উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় পক্ষান্তরে أيان সাধারণতঃ গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুতর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

كيف অব্যয় দ্বারা অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞসা করা হয়। সুতরাং كيف أحمد প্রশ্নের উত্তরে বলা হবে صحيح কিংবা سقيم কিংবা حزين কিংবা فرحان ইত্যাদি।

أين অব্যয় দ্বারা স্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। সুতরাং এর উত্তরে কোন একটি স্থান উল্লেখ করতে হবে। যেমন أين بيتك এর উত্তর হলো في القرية (বা এ জাতীয় কিছু) তদ্রূপ أين قضيتَ يومك এর উত্তর হলো فى المدرسة (বা এ জাতীয় কিছু)

أنّى অব্যয়টি কখনো كيف অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন– أنى يُحْيِيْ هٰذه اللّٰهُ بعدَ موتِها তদ্রূপ أنى يكونُ لي ولد এই অর্থে أنى এর পরে فعل থাকা আবশ্যক। পক্ষান্তরে স্বয়ং كيف এর ক্ষেত্রে তা জরুরী নয়।

কখনো তা من أين অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন হযরত যাকারিয়া (আঃ) হযরত মারয়াম (আঃ) এর সামনে বেমৌসুমি ফল দেখে প্রশ্ন করেছিলেন, (কোরআন শরীফের ভাষায়) يا مريمُ أنى لكِ هذا অর্থাৎ من أين لك هذا – এ কারণেই হযরত মারয়াম (আঃ) উত্তর দিয়েছেন, هذا من عند الله বলে।

তদ্রূপ أنى অব্যয় متى অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন أنى تجيء ، أنى جِئتَ

كم অব্যয়টি দ্বারা অজ্ঞাত সংখ্যা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়। যেমন মাজেদের কিছু কিতাব আছে, এটা তুমি জানো, কিন্তু সেগুলোর সংখ্যা তোমার জানা নেই। এখন كم كتابًا عندَ ماجدٍ প্রশ্নের অর্থ এই যে, মাজেদের নিকট

বিদ্যমান কিতাবগুলোর অজ্ঞাত সংখ্যাটি তুমি জানতে চাও।

أَيٌّ অব্যয়টি সম্পর্কে প্রথম কথা এই যে, তার পরে একটি مضاف إليه থাকে। أي অব্যয় দ্বারা প্রশ্ন করার অর্থ হলো مضاف إليه এর কোন একটি فرد নির্ধারণ করতে বলা। অর্থাৎ তুমি জানতে চাও যে, مضاف إليه এর কোন্ فرد টির সাথে نسبة এর সম্পর্ক হয়েছে।

সুতরাং أَيُّ الفَرِيقَيْنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ এর অর্থ হলো أحقية এর نسبة দুটি দলের কোন্‌টির সাথে সাব্যস্ত হয়েছে? অদ্রূপ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ এর অর্থ كفالة مريم এর نسبة তাদের কোন্ জনের সাথে সাব্যস্ত হবে?

أي এর মুফায ইলাইহি عاقل হতে পারে, আবার غير عاقل হতে পারে। তদ্রূপ زمان বা مكان হতে পারে। অদ্রূপ مفعول বা حال বা অন্য কিছুও হতে পারে। সে হিসাবেই اي এর অর্থ নির্ধারিত হবে। সুতরাং مضاف إليه যদি زمان হয় তাহলে أي দ্বারা زمان সম্পর্কে প্রশ্ন হবে এবং مكان হলে مكان সম্পর্কে প্রশ্ন হবে। পক্ষান্তরে مفعول হলে مفعول সম্পর্কে প্রশ্ন হবে। মোটকথা, প্রশ্নের অন্যান্য অব্যয়ের যেমন– زمان، مكان ইত্যাদি নিজস্ব অর্থ রয়েছে, أي অব্যয়টির তেমন নির্দিষ্ট কোন অর্থ নেই। বরং مضاف إليه হিসাবে তার অর্থ নির্ধারিত হয়ে থাকে।

خلاصة الكلام

الاستفهام طلَب العلمِ بِشَيْءٍ لم يكُنْ معلومًا من قبلُ، و له اِحْدٰى عَشْرَةَ اداةً، و هى الهمزة و هل و ما و من و متى و أيان و أين و كيف و أنى، و كم و أي

و هذه الادوات على ثلاثةِ أقسامٍ

(١) الهمزة و هى لطلبِ التصوُّرِ أوِ التصديقِ

(٢) هل و هى لطلب التصديق فقط

(٣) و بقية الادوات لِطلَبِ التصوُّرِ فقط

و التصور هو إدراكُ المفرَدِ و التصديقُ هو أدراك النسبةِ

و فى همزةِ التصوُّرِ يَلِيْها المسئولُ عنه، فتقول في الاستفهام عن المسند إليه :

أ أنتَ فعلت

و عن المسند :أَ مسلمٌ أنتَ؟ و أ أكرمتَ محمودًا (أم أهنتَه)

و عن المفعول به : أَ إِيَّايَ تُنادِي؟

و عن الظرف : أ يومَ الجمعةِ قـدمتَ و أ عندك أ قامَ فلان؟

و عن المجرور : أ في المسجد صليتَ

و عن الحال : أ راكبًا جئتَ، و هكذا .

و فى الغالِبِ يُذْكَرُ لِلْمسئولِ عنه مُعادِلٌ مَعَ اَمْ و تُسمّٰى أم هذه مُتَّصِلَةً .

و المسئول عنه فى التصديقِ النسبَةُ و لا يكون له مُعادِلٌ فان جاءت أم بعدَها كانت منقطعةً بمعنى بل؟

و هل قسمان : بَسيطةٌ اِنِ اسْتُفْهِمَ بها عن وُجودِ شيءٍ، و مركَّبَةٌ اِنِ اسْتُفْهِم بها عن وجودِ شيءٍ لِشيءٍ .

و بقيَّةُ الأدَواتِ أَسْماءُ اسْتُعْمِلَتْ لِلاستفهام، فما يُطلَبُ بها شرحُ الاسمِ أو حقيقَةَ المُسَمّٰى أو بَيانُ صفاتِ المسئول عنه و أَحوالِه .

و من يُسْألُ بها عَنِ العُقَلاء .

و متى يُسْأَلُ بها عن الزمانِ ماضِيًا كان أو مُسْتَقْبَلا .

و أيان يسأل بها عن الزمان المُسْتَقْبَل خاصَّةً و تكون فى مَوْضِعِ التهويل و التعظيم

و كيف يسأل بها عن الحال .

و أين يسأل بها عن المكان .

و أنى تكون بِمَعْنَى كيف وَ بِمَعْنَى مِنْ أينَ و بِمَعْنَى مَتٰى .

و كم يسأل بها عن العدَدِ المُبْهَمِ

و أي يطلب بها تَعْيِيْنُ و احدٍ مِمَّا اُضِيفَ إليه

أمر ও نهي এর আলোচনায় তুমি জেনে এসেছো যে, কখনো কখনো أمر ও نهي কে তাদের মূল অর্থের পরিবর্তে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং বিচক্ষণ শ্রোতা বাক্যের পূর্বাপর থেকে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বুঝতে পারেন যে, أمر বা نهي এর মূল অর্থ তথা আদেশ বা নিষেধ এখানে উদ্দেশ্য নয় বরং অমুক অর্থটি উদ্দেশ্য।

মনে রেখো, أمر ও نهي এর মত ادوات الاستفهامও কখনো কখনো তাদের মূল অর্থ (প্রশ্নের মাধ্যমে অজানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ) এর পরিবর্তে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয় এবং বিচক্ষণ শ্রোতা বাক্যের পূর্বাপর থেকে বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বুঝতে পারেন যে, এখানে ادوات الاستفهام দ্বারা প্রশ্ন উদ্দেশ্য নয়, বরং অমুক অর্থটি উদ্দেশ্য।

মূল অর্থের পরিবর্তে কি কি অর্থে ادوات الاستفهام ব্যবহৃত হয় এখানে আমরা তা আলোচনা করতে চাই। নীচের উদাহরণটি দেখ–

١. هل جَزاءُ الاِحْسانِ اِلاَّ الاِحسانُ

এখানে বাক্যের পূর্বাপর একথাই প্রমাণ করে যে, جملة এর مضمون বা সারবিষয় জানা এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য নয় বরং সদাচারের প্রতিদান সদাচার ছাড়া অন্য কিছু যে নয় একথাটাই জোরদারভাবে বলা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ما جزاءُ الاحسانِ إلا الاحسانُ – সুতরাং বোঝা গেল যে, هل অব্যয়টি এখানে نفي অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। أَفانتَ تُنقِذ مَنْ فى النارِ বাক্যটিতেও أ অব্যয়টি نفي অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ لستَ تُنقِذ من فى النار তদ্রূপ مَن ذا الذى يشفَع عنده الا باذنه এর উদ্দিষ্ট অর্থ হলো لا أحَدٌ يشفع عنده إلا بإذنه

২. فهل انتم منتهون বাক্যটি দেখো, এখানে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে مخاطب গণকে বিরত থাকার আদেশ দান করা। সুতরাং প্রশ্নবাক্যটি انتهوا এই আদেশবাচক বাক্যের স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।

তদ্রূপ و قل للذين أُوتوا الكتابَ و الأُمِّيِّيْنَ أَأَسْلَمْتُم এখানে أ أسلمتم এর অর্থ اسلموا –

তদ্রূপ أرأيت বাক্যটিকে اخبرني অর্থে ব্যবহার করা হয়। আল কোরআনে এ ধরনের ব্যবহার প্রচুর রয়েছে। যেমন–

اَفرأيتَ الذى تَوَلّٰى و اَعطى قليلاً و اَكْدٰى অর্থাৎ আমাকে বল দেখি, এই

লোকটির কি পরিণতি হতে পারে যে সত্য পথ থেকে সরে যায় এবং সামান্য দান করে আবার হাত গুটিয়ে নেয়।

তদ্রূপ –

اَرأيتَ الذى يَنهٰى عـبـدًا اذا صَلّٰى * اَرأيتَ اِن كـان على الهُـدٰى * او اَمـر بالتقوى* ارأيتَ اِن كذب و تولى *

অর্থাৎ হে শ্রোতা, বান্দাকে তার প্রতিপালকের আনুগত্য থেকে বাধা দানকারী এই লোকটির অবস্থা সম্পর্কে আমাকে বল দেখি। আমাকে বলো দেখি, সে কি হেদায়াতের উপরে আছে কিংবা সে কি মানুষকে তাকওয়ার আদেশ করলো? আমাকে আরো বলো দেখি, সে যে আমার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো এবং তার প্রতিপালকের আনুগত্য থেকে সরে গেলো, সে কি মনে করে যে, আমার শাস্তি থেকে বেঁচে যাবে?! কিছুতেই না।

বলাবাহুল্য যে, أ رأيت বাক্যটি এ সকল স্থানে أخبر অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অবশ্য চূড়ান্ত বিচারে বলা যায় যে, আমর বা আদেশও এখানে উদ্দেশ্য নয়, বরং মূল বক্তব্যকে জোরদার করা এবং অবাধ্য বান্দাকে কঠোর হুঁশিয়ারি প্রদান করা উদ্দেশ্য।

৩. নীচের বাক্যে أ অব্যয়টি نهي অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

أ تخشونهم فالله اَحَقُّ اَنْ تخشاه অর্থাৎ لا تخشوهم তাদেরকে ভয় কর না। কেননা আল্লাহই ভয় করার একমাত্র উপযুক্ত।

তদ্রূপ নীচের কবিতা পংক্তিতে أداة الاستفهام কে نهي অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে

أَ تَقولُ أُفٍّ لِلَّتـي + حَمَلَتْكَ ثُمَّ رَعَتْكَ دَهْرًا *

যিনি তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন এবং দীর্ঘকাল প্রতিপালন করেছেন। তাকে কষ্টদায়ক কথা বলছো? (অর্থাৎ সামান্যতম কষ্টদায়ক কথাও তাকে বলো না।)

এখানে أ تـقول বাক্যটি لا تقل এর স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. এবার নীচের উদাহরণটি লক্ষ্য করো।

يايها الذين آمنوا هَلْ اَدُلُّكم على تجارةٍ تُنجيكم من عذابٍ اليم *

হে ঈমানদারগণ এমন এক ব্যবসার পথ কি তোমাদের বাতলে দেবো যা তোমাদেরকে কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দান করবে।

অতঃপর সামনে বলা হয়েছে।

تُؤمنون باللّٰهِ و رَسولِه و تُجاهِدون في سَبيلِ اللّٰهِ

সুতরাং পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সামনে বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি শ্রোতাকে আগ্রহী ও আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই শুরুতে এখানে أُسْلوبُ الاستفهامِ বা প্রশ্নশৈলী ব্যবহার করা হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে تشويق বলে।

এ সূক্ষ্ম বালাগাত ইবলিসের অজানা ছিল না। দেখ, প্রশ্নের ছলে হযরত আদমকে কিভাবে সে প্রলুব্ধ করতে চাচ্ছে!

قال يا آدمُ هل أدُلُّكَ على شجرةِ الخُلْدِ و مُلْكٍ لا يَبْلَى *

৫. কোমলভাবে কোন কিছু আবদার করার অর্থে أداة الاستفهام এর ব্যবহার রয়েছে। যেমন–

أ لا تزورُنا فَتُدْخِلَ السرورَ علينا *

আমাদের এখানে বেড়াতে আসবে না যাতে আমরা আনন্দ পাই!

দেখ, পরবর্তী বাক্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কিছু জানতে চাওয়া এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য নয়, বরং مخاطَب এর নিকট অতি কোমল ভাষায় বেড়াতে আসার আবদার জানানোই উদ্দেশ্য। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে العرض বলে।

আল কোরআনের আয়াত أَ لا تُحِبون أنْ يغفِرَ الله لكم বাক্যটি সম্পর্কেও একই কথা।

৬. নীচের উদাহরণটি লক্ষ্য করো। কিয়ামতের দিন কাফিরদের বক্তব্যকে আল্লাহ এভাবে তুলে ধরেছেন। هل لنا من شفعاءَ فيشفَعوا لنا

দেখো, সুফারিশকারী কেউ আছে কিনা তা জানতে চাওয়া এখানে উদ্দেশ্য নয়। কেননা কোন সুফারিশকারী না থাকার বিষয়টি তাদের ভালো করেই জানা আছে। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা যে, হায় যদি কোন সুফারিশকারী থাকতো!

هل অব্যয়টি এখানে تمني অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৭. আল কোরআনের ভাষায় কাফিরদের বক্তব্য দেখো–

ما لِهذا الرسولِ يأكُل الطعامَ و يمشى فى الاسواقِ *

যেহেতু কাফিরদের ধারণা ছিলো যে, রাসূল হবেন অতিমানবীয় কোন সত্তা, বাজার ও পানাহারের সাথে যার কোন সম্পর্ক থাকবে না, সেহেতু আল্লাহর রাসূলকে পানাহার গ্রহণ ও বাজারে গমন করতে দেখে তাদের অবাক হওয়াই স্বাভাবিক। মনের সেই অবাক ভাবটাই তারা তুলে ধরেছে প্রশ্নের আকারে। সুতরাং ما অব্যয়টি এখানে মূলতঃ প্রশ্নের পরিবর্তে تعجب বা বিস্ময় প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

তদ্রূপ –

أَ بِنْتَ الدهرِ عندي كلٌّ بِنْتٍ + فكيفَ و صلتِ أنتِ من الزِّحامِ

জ্বরাক্রান্ত কবি মুতানাব্বী بنت الدهر তথা জ্বরকে সম্বোধন করে বিস্ময় প্রকাশ করছেন যে, بنات الدهر (তথা বিভিন্ন বিপদাপদ ও বালা মুছীবত) তো আগে থেকেই আমাকে ঘিরে রেখেছে। বালা-মুছীবতের এত ভিড় অতিক্রম করে তুমি আবার পৌঁছলে কিভাবে ?!

বলাবাহুল্য যে, كيف অব্যয়টি এখানে تعجب এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৮. কোন মদ্যপকে উদ্দেশ্য করে যদি তুমি বলো أ تشرب الخمر তাহলে স্বভাবতঃই বোঝা যাবে যে, استفهام এর প্রকৃত অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়। কেননা জানা বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করার কোন অর্থ হয় না। বরং এখানে উদ্দেশ্য হলো مخاطب এর অন্যায় কাজের প্রতি অপছন্দ ও ঘৃণা প্রকাশ এবং অসমর্থন ঘোষণা করা। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে إنكار বলে। এখানে أ অব্যয়টি إنكار এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এটা হলো الاستفهام الإنكاري।

إنكار এর মূল উদ্দেশ্য দুটি। প্রথমতঃ অতীতের কোন কাজের প্রতি তিরস্কার করা। তখন অর্থ হবে, যা ঘটেছে তা ঘটা উচিত ছিল না। যেমন আল্লাহর নাফরমানি করেছে এমন ব্যক্তিকে বলা হলো। أ عصيت ربك؟ (তোমার প্রতিপালকের নাফরমানি করলে!) অর্থাৎ এটা করা উচিত হয়নি।

কিংবা বর্তমানে ঘটমান কোন কাজের প্রতি কিংবা ভবিষ্যতে ঘটবার আশংকা রয়েছে এমন কোন কাজের প্রতি তিরস্কার করা ও অপছন্দ প্রকাশ করা। যেমন পাপ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে কিংবা ভবিষ্যতে লিপ্ত হওয়া ইচ্ছা পোষণকারী

ব্যক্তিকে বললে؟ أ تعصى ربك؟ অর্থাৎ পাপকার্যে রত হওয়া তোমার উচিত হচ্ছে না বা উচিত হবে না। এগুলোকে বলা হয় الإنكار التوبيخي।

দ্বিতীয়তঃ অতীতে কোন ঘটনা ঘটেছে কিংবা বর্তমানে ঘটছে কিংবা ভবিষ্যতে ঘটবে এ ধরনের দাবীকে অস্বীকার করা। যেমন–

১। افأصفاكم ربكم بالبنين و اتخذ من الملائكة اناثا *

(তোমাদের প্রতিপালক কি তোমাদেরকে পুত্র সন্তানের সাথে বিশিষ্ট করেছেন আর নিজের জন্য ফিরিশতাগণ হতে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন?) অর্থাৎ তোমরা যা দাবী করছ তা ঘটেনি।

২। ا نلزمكموها و انتم لها كارهون

(আমি তোমাদেরকে উক্ত প্রমাণ মেনে নিতে বাধ্য করবো অথচ তোমরা তা করতে অসম্মত) অর্থাৎ তা করবো না।[১]

৯. কখনো কখনো কটাক্ষ, উপহাস বা তুচ্ছতা প্রকাশের জন্য ادوات الاستفهام ব্যবহৃত হয়। যেমন, মূর্তিগুলোকে লক্ষ্য করে হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলছেন– ما لكم لا تنطقون (কি হলো, তোমরা কথা বলছো না যে!) বলাবাহুল্য যে, মূর্তিগুলোর পক্ষ হতে কোন উত্তর পাওয়ার আশায় তিনি প্রশ্ন করেননি, বরং তাদের উপহাস করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

তদ্রূপ হযরত শোআয়ব (আঃ)-এর উদ্দেশ্যে তাঁর কওম বলছে–

قالوا يا شعيب ا صلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا

হযরত শোআয়ব অধিক পরিমাণে নামায পড়তেন আর কাওম তাকে নামাজ পড়তে দেখে হাসাহাসি করতো। সুতরাং বোঝা যায় যে, এখানেও استفهام এর মূল অর্থ– প্রশ্নের মাধ্যমে অজানা বিষয় জানা উদ্দেশ্য নয়, বরং হযরত শোআয়ব (আঃ)-এর নামাযের প্রতি উপহাস ও কটাক্ষ করাই হলো উদ্দেশ্য।

---

[১] منكر বা অপছন্দকৃত বিষয়টি همزة الاستفهام এর সংলগ্ন হতে হবে। যেমন– و إذ قال ابراهيم لابيه آزر ا تتخذ اصناما الهة এখানে اتخاذ এই ফেয়েলটিই হলো অপছন্দনীয়।

তদ্রূপ أ فانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين (তুমি পারবে তাদেরকে ঈমান আনয়নে বাধ্য করতে?) অর্থাৎ আল্লাহ পারবেন তুমি পারবে না।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের প্রতি ইংগিত করে তার কাওম বলেছিল أ هذا الذى يذكر الهتكم (এ লোকই কি তোমাদের উপাস্যকে সমালোচনা করে থাকে!)

বলাবাহুল্য যে, বিষয়টি যেহেতু তাদের জানা, সেহেতু এখানে استفهام এর মূল অর্থ উদ্দেশ্য নয়, অবজ্ঞা ও তুচ্ছতা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য।

অনধিকার চর্চাকারী ব্যক্তিকে যদি তুমি বলো–

و من انت حتى تتدخل فى أمري

(আমার বিষয়ে নাক গলাবার তুমি কে ?)

তাহলে অবজ্ঞা ও তুচ্ছতা প্রকাশই হবে তোমার উদ্দেশ্য।

১০. কখনো কখনো হুঁশিয়ারি প্রদানের উদ্দেশ্যেও এর ব্যবহার দেখা যায়। যেমন আল্লাহ বলেছেন, لم تر كيف فعل ربك بعاد। (তুমি কি দেখনি তোমার প্রতিপালক আদ জাতির সাথে কি আচরণ করেছেন।).

আশা করি তুমি সহজেই বুঝতে পারছো যে, مخاطب কে হুঁশিয়ার করাই এখানে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তোমরা যদি অবাধ্যতা প্রকাশ কর তাহলে তোমাদেরও একই পরিণতি হবে।

الم نهلك الاولين আয়াতটি সম্পর্কেও এক কথা।

১১. فاين تذهبون আয়াতটি দেখ, যাওয়ার স্থান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য নয়, বরং তাদের ভ্রষ্টতা সম্পর্কে সতর্ক করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এমন কোন স্থান নেই যেখানে গিয়ে তোমরা আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচতে পারবে; সুতরাং সতর্ক হও।

১২. তোমার ডাকে সাড়া দিতে বিলম্ব করেছে এমন কাওকে যদি তুমি বলো– كم دعوتك (কতবার তোমাকে ডেকেছি?) তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এটা বোঝা যাবে যে, ডাকার সংখ্যা সম্পর্কে প্রশ্ন করা তোমার উদ্দেশ্য নয়, বরং এ কথা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, مخاطب তোমার ডাকে সাড়া দিতে বিলম্ব করেছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে استبطاء বলে। এর আভিধানিক অর্থ হলো কোন কিছুকে বিলম্বিত মনে করা বা বিলম্বের কারণে অস্থিরতা প্রকাশ করা।

নীচের আয়াতটি সম্পর্কেও একই কথা–

و زلزلوا حتى يقول الرسول و الذين امنوا معه متى نصر الله *

নীচের কবিতাটিতেও استبطاء -এর অর্থ রয়েছে।

طال بي الشـوق و لكن ما التقـينا + فمتى القاك فى الدنيا و أين؟

ব্যাকুলতা আমার কত দীর্ঘ হলো, অথচ মিলন হল না। বলো, দুনিয়াতে কবে, কোথায় তোমার দেখা পাবো!

استبطاء সাধারণতঃ কাঙক্ষিত বিষয়ে হয়ে থাকে। উপরের উদাহরণগুলো থেকেই তুমি তা বুঝতে পারবে।

১৩. নীচে কবি বুহতুরির কবিতা পংক্তিটি দেখো, তিনি তার প্রিয়তমের প্রশংসা করে বলছেন–

الست اعمهم جودا و ازكا + هم عودا و امضاهم حساما

দানশীলতায় আপনি কি তাদের চেয়ে বড় নন? দৈহিক ক্ষমতায় তাদের চেয়ে বলিষ্ঠ নন? এবং তরবারি চালনায় তাদের চেয়ে শাণিত নন?

যেহেতু এ গুলো কবির জানা বিষয় সেহেতু প্রশ্ন করা নিরর্থক। তদুপরি শুধু প্রশ্ন দ্বারা প্রশংসা প্রকাশ পায় না। সুতরাং বোঝা গেল যে, কবির উদ্দেশ্য হচ্ছে, অন্যান্যদের মুকাবেলায় প্রিয়জনের যে শ্রেষ্ঠত্ব তিনি দাবী করছেন প্রিয়জন যেন তাতে সায় প্রদান করে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলে تقرير অর্থাৎ প্রশ্নকৃত বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত ও সপ্রমাণিত করা এবং مخاطب এর নিকট হতে তার স্বীকৃতি দাবী করা

ألم نربك فينا و ليدا ও الم نشرح لك صدرك আয়াত দুটি সম্পর্কে একই কথা।

انت فعلت هذا بالهتنا। এখানে লোকদের উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আঃ) থেকে স্বীকৃতি আদায় করা। নিছক প্রশ্ন করা উদ্দেশ্য নয়।

১৪. নীচের কবিতাটি দেখো–

الام الخلف بينكم إلا ما + و هذه الضجة الكبرى علام

তোমাদের অন্তর্বিবাদ আর কতকাল? কিসের জন্যই বা এ ভীষণ শোরগোল?

আশা করি বুঝতে পেরেছ যে, কবি বিবাদ ও শোরগোলকারীদেরকে এখানে তিরস্কার করতে চাচ্ছেন, অন্য কিছু নয়। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলে- توبيخ

১৫. কখনো কখনো প্রশ্নের উদ্দেশ্য হয় ভয়াবহতা তুলে ধরা। যেমন-

القارعة ما القارعة * و ما ادراك ما القارعة ؟

ما القارعة প্রশ্নটি শোনার পর স্বাভাবিকভাবেই শ্রোতার অন্তরে কেয়ামতের ভয়াবহতার চিত্র ফুটে উঠবে। ফলে সামনে কেয়ামতের যে ভয়াবহ বিবরণ দেয়া হবে তা গ্রহণ করার জন্য তার মন প্রস্তুত হবে। আর এটাই হলো উক্ত প্রশ্নের উদ্দেশ্য। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় تهويل

কবি মুতানাব্বীর নিম্নোক্ত পংক্তিটি দেখ, প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যুশোকে রচিত শোক-কবিতা থেকে এটি নেয়া হয়েছে-

من للمحافل و الجحافل و السرى + فقدت بفقدك نيرا لا يطلع

মজলিস আলো করার জন্য, সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দানের জন্য এবং নৈশ অভিযান পরিচালনার জন্য আর কে থাকলো? আপনাকে হারিয়ে সেই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হারিয়েছি যা দ্বিতীয়বার উদিত হবে না।

কবি এখানে তার প্রশংসিত ব্যক্তির বড়ত্ব তুলে ধরতে চাচ্ছেন। সুতরাং প্রশ্নটিকে تعظيم বা বড়ত্ব প্রকাশের অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। অবশ্য শোককাতরতা প্রকাশ করাও একটি উদ্দেশ্য।

من ذا الذى يشفع عنده الا باذنه আয়াতটিকে আল্লাহর বড়ত্ব প্রকাশের উদাহরণরূপেও পেশ করা যেতে পারে।

তাহলে একটি বিষয় তুমি বুঝতে পারলে যে, কোন কোন استفهام কে একাধিক অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে। أمر، نهى ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও এমন হতে পারে।

استفهام এর আরেকটি ব্যবহারিক অর্থ হলো تسوية অর্থাৎ একথা বুঝানো যে, استفهام এর সাথে সংশ্লিষ্ট দু'টো বিষয়ই সমান। নীচের আয়াত দু'টি দেখো,

سواء عليهم أ أنذرتهم ام لم تنذرهم فهم لا يؤمنون *

فان ادرى ا قريب ام بعيد ما توعدون *

তুমি তাদেরকে সতর্ক করো কিংবা না করো, তাদের জন্য তা সমান, কেননা তারা ঈমান আনবে না।

আমি জানি না তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি নিকটবর্তী না দূরবর্তী ?

উপরের দীর্ঘ আলোচনার সার সংক্ষেপ এই যে, استفهام বা প্রশ্নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অজানা বিষয় জানতে চাওয়া। তবে ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য অর্থেও اداوت الاستفهام কে ব্যবহার করা হয়।

خلاصة الكلام

عَرَفْنا اَنَّ الاستفهامَ فى الأصلِ هو طلبُ العلمِ بشيءٍ لم يَكُنْ معلومًا مِنْ قَبْلُ بِأَداةٍ خاصةٍ

و قد تَخرج الفاظ الاستفهام عن معانيها الأصليةِ إلى معانٍ أُخرى تُفهم من سياقِ الكلام و هى :

(١) النفي (٢) الأمر (٣) النهي (٤) التشويق (٥) العرض (٦) التعجب (٧) الإنكار، (٨) التهكم و الاستهزاء و التحقير (٩) الوعيد (١٠) التنبية على ضلال (١١) الاستبطاء (١٢) التقرير (١٣) التوبيخ (١٤) التهويل (١٥) التعظيم (١٦) التسوية (١٧) التمني ۰

مبحث التمنى

الإنشاء الطلبي এর চতুর্থ প্রকার হলো التمني

التمني এর আভিধানিক অর্থ হলো আকাঙ্ক্ষা করা। বালাগাতের পরিভাষায় تمني এর পরিচয় কি তা জানতে হলে নীচের তিনটি উদাহরণ দেখ।

أَلا ليتَ الشبابَ يعودُ يوما + فَأُخْبِرَه بما فعلَ المشيبُ

হায়! কোন দিন যদি যৌবনকাল ফিরে আসতো, তাহলে বার্ধক্য যে আচরণ করেছে, সে করুণ কাহিনী তাকে বলতাম।

দেখো, বার্ধক্যের কারণে বিপর্যস্ত কবি এখানে যৌবনকাল ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করছেন। যৌবনকাল সব মানুষের কাছেই প্রিয়। কেননা যৌবনকাল

হলো মানব জীবনের বসন্তকাল। কিন্তু কবি যতই আকাঙ্ক্ষা করুন, জং ধরা যৌবন তো রং ধরে আর ফিরে আসবে না। তাহলে আমরা বলতে পারি, কবি একটি প্রিয় বিষয় কামনা করছেন যা লাভ করা সম্ভব নয়।

এবার নীচের আয়াতটি দেখ

قال الذين يريدون الحيوةَ الدنيا يا ليت لنا مثلَ ما اُوتي قارون * اِنه لذو حظٍّ عظيمٍ *

দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন যাদের কাম্য (কারুনের জাঁকজমক দেখে) তারা বলে উঠলো, হায়! কারুনকে যে সম্পদ দান করা হয়েছে তেমন যদি আমাদের হতো!

দেখো! দুনিয়া লোভীরা কারুনের মত সম্পদ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছে। আর কারুনের সম্পদ তোমার কাছে প্রিয় না হলেও তাদের কাছে তো অবশ্যই প্রিয়। আর হঠাৎ করে কারুনের মত সম্পদ ভাণ্ডার পেয়ে যাওয়া অসম্ভব না হলেও প্রায় অসম্ভব। তাহলে আমরা বলতে পারি, এখানে এমন একটি প্রিয় বিষয় কামনা করা হয়েছে যা লাভ করা অসম্ভব নয়; তবে প্রায় অসম্ভব।

অসম্ভব কিংবা প্রায় অসম্ভব কোন প্রিয় বিষয় কামনা করাকে বালাগাতের পরিভাষায় التمني বলে।

এবার নীচের দুটি উদাহরণ লক্ষ্য কর–

اُحِبُّ الصالحين و لستُ منهم + لَعلَّ اللهَ يرزقني صلاحا

আমি ভালো নই, তবে ভালোদের ভালোবাসি, (এ আশায় যে,) হয়ত আল্লাহ আমাকেও ভালো চরিত্র দান করবেন।

দেখো, এখানে সততা লাভের আকাঙক্ষা করা হয়েছে, যা অবশ্যই সবার প্রিয় গুণ। আচ্ছা এটা লাভ করা কি অসম্ভব কিংবা প্রায় অসম্ভব? না বরং খুবই সম্ভব। আরেকটি উদাহরণ দেখ–

عسى اللهُ اَنْ ياتىَ بالفتحِ

খুবই সম্ভব যে, আল্লাহ বিজয় দান করবেন।

দেখো, এখানে বিজয় লাভের আকাঙক্ষা করা হয়েছে, যা লাভ করা অসম্ভব নয় বরং খুবই সম্ভব।

লাভ করা সম্ভব এমন প্রিয় বিষয় কামনা করাকে বালাগাতের পরিভাষায় الترجي বলে।

ليت এই একটি মাত্র অব্যয়কে تمني এর ভাব প্রকাশ করার জন্য তৈরী করা হয়েছে। পক্ষান্তরে الترجي এর জন্য لعل ও عسى এ দুটি অব্যয় তৈরী করা হয়েছে। তবে هل، لعل ও لو এই তিনটি অব্যয়কেও ليت এর পরিবর্তে تمني এর জন্য ধার করে ব্যবহার করা হয়।

. هل -এর উদাহরণ দেখো,

اَيا مَنْزِلَيْ سَلْمیٰ سَلامٌ عَلَيكُما + هَلِ الأَزْمِنُ اللاتي مَضَيْنَ رَواجِعُ

হে সালমার ‘গৃহ ও গৃহাংগন’ তোমাদেরকে সালাম। বলো দেখি, সুখের বিগত মুহূর্তগুলো কি আর ফিরে আসবে!

এখানে هل অব্যয়যোগে বিগতকাল ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা হয়েছে, যা প্রিয় বিষয় হলেও অসম্ভব।

فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا

এই আয়াতটি সম্পর্কেও একই কথা

تمني অর্থে لعل এর ব্যবহার তুমি পাবে নীচের কবিতায়–

اَ سِرْبَ القَطا هل مَن يُعير جَناحه + لَعلِّي إلى مَنْ قد هَوِيْتُ اَطِيرُ

কল্পনাকেন্দ্রিক চিন্তায় কবি এখানে ‘কাতা’ পাখীর কাছে তার ডানা দুটি ধার দেয়ার আবদার করছেন, সে ডানায় ভর করে তিনি প্রিয়জনের কাছে উড়ে যাবেন। দুটি বিষয়ই অসম্ভব, কিংবা প্রায় অসম্ভব। প্রথমটির ক্ষেত্রে هل এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে لعل ব্যবহৃত হয়েছে। মোটকথা هل ও لعل অব্যয় দুটি এখানে তাদের মূল অর্থ استفهام ও ترجي এর জন্য ব্যবহৃত না হয়ে تمني অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

تمني অর্থে لو এর ব্যবহার নীচের আয়াতে দেখ–

وَ ما اَضلَّنا اِلا المجرمون * فَما لنا مِن شٰفعين * و لا صديقٍ حميمٍ * فلو اَنَّ لنا كَرَّةً فنكونَ من المؤمنين *

(নেতৃস্থানীয়) অপরাধীরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে। তাই এখন আমাদের কোন সুফারিশকারী নেই। নেই কোন অন্তরংগ বন্ধু। হায় যদি আমাদের পুনঃ

প্রত্যাবর্তন হতো তাহলে আমরা মুমিনদের দলভুক্ত হয়ে যেতাম।

সমাজপতিদের অনুগমন করে যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তারা জাহান্নামের আযাবে অসহ্য হয়ে দুনিয়াতে ফিরে আসার আকাঙক্ষা করবে যাতে ইমান এনে নাজাত লাভ করতে পারে কিন্তু তারা নিজেরাই জানে যে, এ আকাঙক্ষা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব।

কবি জারীরের এই কবিতা-পংক্তিটি এখানে উল্লেখযোগ্য।

وَ لّىّ الشبابُ حميدةً أيامُه + لو كانَ ذلك يُشْتَرٰى أو يُرْجَعُ

ترجی এর অব্যয় لعل যেমন تمني অর্থে ব্যবহৃত হয় তেমনি تمنى এর অব্যয় ليت কখনো কখনো ترجی অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

فَيا ليتَ ما بَيْنِي و بينَ اَحِبَّتِي + مِنَ البُعْدِ ما بَيني و بينَ المصائبِ

এখানে কবি দুটি কষ্টের কথা বলছেন, প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ও দূরত্ব এবং বিপদাপদের নৈকট্য। অতঃপর কবির আকাঙক্ষা হলো, প্রিয়জনের মিলন যদি নাও হয় অন্তত প্রিয়জনের মত দূরত্ব তার ও বিপদাপদের মাঝে যেন সৃষ্টি হয়। বলা বাহুল্য যে, এ আকাঙক্ষা বাস্তবায়িত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, ترجي এর জন্য কবি تمني এর অব্যয় ব্যবহার করেছেন।

خلاصة الكلام

وَ مِن أَنواعِ الإنشاءِ الطَّلَبِيِّ التَّمَنِّي .

و هو طلبُ أمرٍ محبوبٍ لا يُرْجٰى حصولُه لِكونه مستحيلًا أو بعيدَ الوُقوعِ .

و إذا كان المطلوبَ محبوبًا يُرْجٰى حصولُه سُمِّيَ تَرَجِّيًا .

و أداة التمني هي كلمةُ ليتَ في مَعْنٰى التمنِّي . و قد يُستعمَل هل و لعل و لو .

و تُستعمَل في الترجي كلمتان، هما لعل و عسى

مبحث النداء

نداء এর আভিধানিক অর্থ হলো ডাক দেওয়া, পরিভাষায় نداء অর্থ কিছু বলার জন্য বিশেষ অব্যয়যোগে কারো মনোযোগ আকর্ষণ করা। نداء এর অব্যয় আটটি যথা,

أَ، أَيْ، يَا، أَيَا، وَ هَيا، وآ، و آيْ، ووا

এগুলো ادعو ফেয়েলের স্থলবর্তী। সুতরাং যেটাকে আমরা منادى বলি সেটা মূলতঃ ادعو ফেয়েলের مفعول به – এখানে مسند ও مسند إليه দুটোই উহ্য রয়েছে। তবে مسند إليه যেহেতু বাক্যের প্রধান অংশ সেহেতু مسند إليه এর চিহ্ন স্বরূপ منادى কে علامة الرفع এর উপর مبني (বা স্থীর) করা হয়েছে।

এখানে আমরা أحـرف النداء -এর বিভিন্ন ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করবো। নিকটবর্তী منادى এর জন্য أ ও أى অব্যয় দুটি ব্যবহৃত হয়। যেমন–

أَيْ صَديقي نَاوِلْنِي كتابَك لِأَقْرأه – أَ محمدُ افْتَحِ النافذَةَ التى بجوارِك

অবশিষ্ট ছয়টি অব্যয় দূরবর্তী منادى এর জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে কোন কোন মতে يا অব্যয়টি হলো نداء এর সাধারণ অব্যয়। অর্থাৎ নিকটবর্তী ও দূরবর্তী উভয় منادى এর জন্য তা ব্যবহৃত হয়। যেমন–

أَيا غائِبًا عَنيِّ و فى القَلْبِ عرشُه + أَما آنَ اَنْ يَحْظَى بِوَجْهِكَ ناظرى

হে দূর দেশের বন্ধু! অথচ আমার হৃদয়ে তোমার সিংহাসন! তোমার প্রিয় মুখ দর্শনে আমার দু'চোখ জুড়াবে সে সময় কি হয়নি এখনো!

তদ্রূপ, يا دار الآحباب أهلا و سهلا + من غريب عنها و ان كان فيها

হে প্রিয়জনদের বাসভূমি! দূর দেশে থেকেও তোমার মাঝেই বিচরণ করে যে বিরহী তার সালাম গ্রহণ করো।

কিন্তু নীচের কবিতাটি পড়ো; কারাগারে বন্দী অবস্থায় কবি মুতানাব্বী বাদশাহর খিদমতে মুক্তির আবেদন জানিয়ে বলছেন–

أ مالك رقي و من شأنه + هبات اللجين و عتق العبيد

دعوتك عند انقطاع الرجاء + و الموت مني كحبل الوريد

أ مالك رقي বলে কবি মুতানাব্বী বহু দূর থেকে বাদশাকে সম্বোধন করছেন। সুতরাং নিয়মানুসারে أداة البعيد ব্যবহার করার কথা ছিলো। কিন্তু কবি তার পরিবর্তে أداة القريب ব্যবহার করেছেন। নিয়মের এই ব্যতিক্রম করার বালাগাতসম্মত কারণ কি? কারণ এই যে, মুতানাব্বী বোঝাতে চান, বাদশাহ তার এত প্রিয় যে, দূরে থেকেও তিনি তাঁর হৃদয়ের অতি নিকটে। আর হৃদয়গত নৈকট্যের সামনে স্থানগত দূরত্ব একেবারেই তুচ্ছ।

নীচের কবিতাটি সম্পর্কেও একই কথা। কবি বহু দূর থেকে نعمان الأراك -এর অধিবাসীদের সম্বোধন করেছেন–

أَ سُكَّانَ نُعمانِ الأَراكِ تَيَقَّنُوا + بِأَنَّكُمُو في رَبْعِ قلبي سُكَّانُ

নোমানুল আরাকের হে অধিবাসী! বিশ্বাস করো তোমরা আমার হৃদয় মন্দিরের অধিবাসী।

এবার নীচের উদাহরণগুলো দেখো–

يَا ربِّ اِنْ عَظُمت ذنوبي كَثْرةً + فَلَقَدْ علمتُ بِأَنَّ عفوَك أعظَمُ

হে আমার প্রতিপালক! সংখ্যায় আমার গোনাহ যদি অনেক বড় হয়ে থাকে তাহলে আমি তো জানি, তোমার ক্ষমাগুণ আরো বড়।

দেখো, আল্লাহ তা'আলা তো বান্দার অতি নিকটবর্তী। যেমন ইরশাদ হয়েছে–

وَ نحن أقربُ إليهِ من حَبلِ الوَريدِ *

আমি তার স্কন্ধশিরার অধিক নিকটবর্তী।

সুতরাং আল্লাহকে নিকটবর্তী অব্যয়যোগে نداء করাই তো ছিল নিয়মসম্মত। কিন্তু কবি আবু নাওয়াস নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে দূরবর্তী অব্যয় يا ব্যবহার করেছেন। কেন করেছেন? কারণ এই যে, منادى হচ্ছেন অত্যুচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আর এই মর্যাদাগত উচ্চতার প্রতি ইংগিত করার জন্যই কবি দূরবর্তী অব্যয় ব্যবহার করেছেন।

একারণেই চাকর যদি মনিবের নিকটে দাঁড়িয়ে أيا مولاي বলে তাহলে বুঝতে হবে যে, মনিবের মর্যাদাগত দূরত্বকে সে স্থানগত দূরত্বের স্থলবর্তী ধরে নিয়েছে। তাই أداة القريب এর পরিবর্তে أداة البعيد ব্যবহার করেছে।

এবার নীচের কবিতাটি দেখো, কবি ফারাযদাক আপন পূর্বপুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব

নিয়ে গর্ব করে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী কবি জারীরের নিন্দা করে বলছেন–

أُولٰئِكَ آبائِيْ فَجِئْنِي بِمِثْلِهم + إذا جَمَعَتْنا يا جريرُ المَجامِعُ

এঁরা হলেন আমার পূর্বপুরুষ। হে জারীর আমরা যখন মজলিসে বসি তখন তাদের কোন তুলনা পেশ করো দেখি!

এ কবিতা বলার সময় কবি জরীর কবি ফারাযদাকের নিকটেই ছিলেন। তা সত্ত্বেও দূরবর্তী অব্যয় দ্বারা জারীরকে তিনি نداء করেছেন। কারণ ফারাযদাক মনে করেন, তার প্রতিদ্বন্দ্বী কবি জারীর অতি নিম্নস্তরের মানুষ। মর্যাদার দিক থেকে ফারাযদাকের চেয়ে বহু নীচে তার অবস্থান। এই মর্যাদাগত নীচুতার প্রতি ইংগিত করার জন্য ফারাযদাক দূরবর্তী অব্যয় ব্যবহার করেছেন।

তোমার কাছে দাঁড়ানো কোন লোককে যদি তুমি أيا هذا ابْتَعِدْ عَنِّيْ (এই মিঁয়া আমার থেকে দূরে সরো।) তাহলে আমরা বুঝবো যে, লোকটিকে তুমি মর্যাদার দিক থেকে অনেক নীচে মনে করেছো এবং এটাকে স্থানগত দূরত্বের স্থলবর্তী ধরে নিয়ে أداة القريب এর পরিবর্তে أداة البعيد ব্যবহার করেছো।

এবার নীচের কবিতাটি দেখো–

أَيَا مَنْ عاشَ في الدنيا طويلًا + وَأُفْنٰى العُمرَ في قِيلٍ وَقالِ
وَأُتْعَبَ نفسَه فِيما سَيَفْنٰى + وجَمَعَ مِن حَرامٍ أو حَلالِ
هَبِ الدنيا تُقاد إليك عَفْوًا + أَلَيْسَ مصيرُ ذلك لِلزَّوالِ

দুনিয়াতে যে দীর্ঘ জীবন লাভ করেছো এবং 'তুলকালাম' করে জীবন শেষ করেছো শোন তুমি,

'ফানা'র পিছনে ছুটে ছুটে নিজেকে 'ফানা' করেছো এবং হারামে হালালে শুধু মাল জমা করেছো শোন তুমি,

মেনে নিলাম, দুনিয়া তোমার কাছে স্বেচ্ছায় ধরা দেবে কিন্তু বিনাশই কি তার শেষ পরিণতি নয়?

কবি আবুল আতাহিয়া তার কাছের লোকটিকে উপদেশ দিতে গিয়ে أيا অব্যয় ব্যবহার করেছেন। এভাবে তিনি বোঝাতে চান যে, আমার উপদেশের পাত্রটি গাফলতের মাঝে ডুবে আছে। সুতরাং কাছে থেকেও সে এত দূরে যে, তাকে نداء করার জন্য দূরবর্তী অব্যয় ব্যবহার করার দরকার।

একই কারণে ঘুমন্ত ব্যক্তিকেও দূরবর্তী অব্যয়যোগে নেদা করে বলা হয়–

أَيَا نَائِمُ انْـهَـضْ لِلصَّـلاةِ

মোটকথা, বিভিন্ন কারণে নিকটবর্তীকে দূরবর্তী ধরে নেয়া হয় এবং أداة القريب এর পরিবর্তে أداة البعيد ব্যবহার করে نداء করা হয়।

যেমন এ দিকে ইংগিত করা যে, مخاطَب এর মর্যাদা متكلم থেকে অনেক উপরে কিংবা নীচে। অথবা এ দিকে ইংগিত করা যে, مخاطَب গাফেল ও বেখবর অবস্থায় আছে, সুতরাং সে কাছে থেকেও যেন দূরে।

আলোচনার শুরুতেই তুমি জেনেছো যে, نداء এর মূল উদ্দেশ্য হলো বিশেষ অব্যয়যোগে مخاطَب এর মনোযোগ আকর্ষণ করা। কিন্তু অনেক সময় نداء কে এই মূল উদ্দেশ্যের পরিবর্তে অন্য উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিচক্ষণ শ্রোতা কথার পূর্বাপর থেকে এবং পরিবেশ পরিস্থিতি থেকে তা বুঝতে পারেন।

১. নীচের কবিতাটি দেখো–

أَ فُؤادِيّ مَتَى المَتابُ أَلَـمَّا + تَصْحُ وَ الشَّيْبُ فوقَ رأسِـي أَلَـمَّا

হে মন! তাওবার সময় যখন ঘনিয়ে আসবে তখন (গাফলতের ঘোর থেকে) জেগে উঠো। আর এখন তো মাথার উপর বার্ধক্য এসেই পড়েছে।

কবি এখানে أ فؤادي বলে আপন অন্তরকে ডাক দিয়েছেন। অথচ অন্তর তো ডাক শোনার এবং সে ডাকে সাড়া দেওয়ার জিনিস নয়। সুতরাং نداء এর মূল অর্থ এখানে উদ্দেশ্য নয়, বরং পুরো কবিতা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বার্ধক্য এসে পড়ার পরও তাওবা না করার কারণে অন্তরকে অর্থাৎ নিজেকে তিনি তিরস্কার করছেন। অর্থাৎ আলোচ্য نداء -এর উদ্দেশ্য হল زجر বা তিরস্কার।

২. আবার দেখো, আরবের সুপ্রসিদ্ধ দানশীল ও বীর পুরুষ معن بن زائدة এর মৃত্যুতে শোকাহত কবি মা'আনের কবরকে ডাক দিয়ে বলছেন–

أَ يَا قَبْرَ مَعْنٍ كيفَ وارَيْتَ جُـودَه + وَ قـد كان منه البَرُّ و البَحْرُ مُتْرَعًا

হে মা'আনের কবর! কিভাবে তুমি তার দানশীলতাকে মাটি চাপা দিলে! অথচ জল-স্থল সবই তাঁর দানশীলতায় পূর্ণ ছিলো।

কবি তো জানেন যে, কবর তার ডাক শুনতে পারে না। সুতরাং এ ডাকের

Free @ www.a-ilm.weebly.com

অর্থ কবরের মনোযোগ আকর্ষণ করা নয়, বরং الحزن و التوجع বা শোক ও বেদনা প্রকাশ করা।

আরেকটি সুন্দর কবিতা দেখো, আধুনিক কালের কবি হাফিজ ইবরাহীম শুভ্র মুক্তোর মত সুন্দর এক ছোট্ট মেয়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছেন এবং তাকে মুক্তো বলে ডাকছেন−

يَا دُرَّةً نُزِعَتْ مِنْ تاجِ والـدِها + فأصبحَتْ حِلْيَةً في تاجِ رِضْوانِ

হে চির সুন্দর মুক্তো! পিতার মুকুট থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আর এখন তুমি জান্নাতের রিযওয়ান ফিরিশতার মুকুটে শোভা পাচ্ছো।

বলাবাহুল্য যে, মৃত শিশুকে يا درة বলে ডাক দেয়ার উদ্দেশ্য হলো শোক প্রকাশ।

আবার দেখো, হারানো প্রিয়জনের স্মৃতিবিজড়িত বাড়ী-ঘরকে نداء করে কবি চিত্তের ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা প্রকাশ করছেন−

أَيَا منازِلَ سَلْمَى أينَ سَلماكِ + مِنْ أَجْلِ هذا بَكينَاه ؛ بَكَيْناكِ

হে সালমার বাস্তুভিটা! কোথায় তোমার সালমা! তাকে হারিয়েই তো আজ তার জন্য আর তোমার জন্য কেঁদে অশ্রু ঝরাই।

অন্য দিকে দেখো, কবি ইমরাউল কায়স বিনিদ্র রাতের দীর্ঘতায় অধৈর্য প্রকাশ করছেন−

أَ لا أَيُّها الليلُ الطويلُ ألا انْجَلِ بصبحٍ وَ ما الإِصْباحُ منك بِأَمْثَلِ

কোন মজলুম হয়ত ফরিয়াদ করার জন্য তোমার কাছে আসছে। তখন তুমি বললে− يا مظلومُ تَكَلَّمْ

এখানে نداء দ্বারা মনোযোগ আকর্ষণ করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা সে তো তোমার দিকেই আসছে। বরং উদ্দেশ্য হলো জুলুমের ফরিয়াদ করার ব্যাপারে তাকে উদ্বুদ্ধ করা। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলে إغراء বা প্ররোচনাদান।

তাছাড়া يا ليت বলে আকাঙক্ষা প্রকাশ করা হয় এবং يا حَسْرَتَى বলে আফসোস প্রকাশ করা হয়। কোরআন শরীফে এগুলোর বহু নযীর রয়েছে।

خلاصة الكلام

و من أنواعِ الإنشاءِ الطلَبيّ النداءُ

النداء هو طلبُ المتكلمِ إقبالَ المخاطَبِ بحرفٍ ينوبُ مَنابَ ادعو ٠

و أدَواتُ النداءِ هي الهمزة و أَيْ و يا و أَيا و هَيا و وا ٠

فالهمزة و أى للقريبِ و غيرُهما للبعيدِ :

و قد يُنزَّل البعيدُ منزِلَةَ القريبِ، فيُنادى بالهمزةِ و أى إشارةً إلى أنه حاضرٌ فى القلبِ لا يَغيب عن الخاطِرِ ٠

و قد ينزل القريبُ منزلةَ البعيدِ، فيُنادى بِأَدَواتِ البعيدِ، للإشارةِ إلى بُعْدِ المنادى عن المتكلِّمِ من حيثُ العَظَمَةُ أو الذِّلَّةُ، أو للإشارةِ إلى أن المخاطَبَ غافلٌ لِسبَبٍ من الأسبابِ، فَكأنَّه غيرُ حاضرٍ ٠

و قد تَخرج ألفاظُ النداءِ عن معناها الأصلِيِّ إلى معانٍ أخرى، تُفْهَمُ من القرائنِ، منها الإغراء، و الزجر و التأسف و التضجر و التمني ٠

الباب الثاني

الــذكــر و الحــذف

তুমি নিশ্চয় জানো যে, জুমলার প্রধান অংশ হলো দু'টি; مسند ও مسند إليه - এ ছাড়া প্রাসংগিক কিছু অংশ থাকতে পারে। যেমন- مفعول به، مفعول فيه، حال ইত্যাদি। এ কথাও তুমি জানো যে, জুমলার প্রতিটি অংশই অর্থপূর্ণ। অর্থাৎ প্রতিটি অংশ একটি অর্থ বহন করে এবং উক্ত অর্থ শ্রোতাকে অবহিত করা মুতাকাল্লিমের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। সুতরাং জুমলার প্রতিটি অংশ উল্লেখ করাই হলো স্বাভাবিক নিয়ম, যাতে প্রতিটি অংশ مخاطب এর সামনে উদ্দিষ্ট অর্থ তুলে ধরতে পারে।

পক্ষান্তরে যদি জুমলার কোন অংশ এমন হয় যে, অনুক্ত থাকা অবস্থায়ও শ্রোতা কালামের পূর্বাপর আলামত দ্বারা তা বুঝে নিতে পারে তখন জুমলার উক্ত অংশকে অনুক্ত রাখারও অবকাশ রয়েছে। মোটকথা, معنى বা অর্থের বাহক হিসাবে লফযটিকে ذكر করতে পারো, আবার আলামত বিদ্যমান থাকার কারণে حذفও করতে পারো।

এখন প্রশ্ন হলো, ذكر ও حذف এ দু'টো পথ খোলা থাকা অবস্থায় একজন بليغ এর করণীয় কি? তিনি কি অবকাশ আছে বলে ইচ্ছে মত ذكر বা حذف করতে পারেন; অর্থাৎ বিনা কারণে ذكر ও حذف এর কোন একটিকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন?

এ সম্পর্কে বালাগাতশাস্ত্র বিশারদগণের সিদ্ধান্ত এই যে, ذكر ও حذف এর নিজস্ব কিছু ক্ষেত্র রয়েছে এবং একটিকে অন্যটির উপর অগ্রাধিকার প্রদানের বিশেষ কিছু কারণ রয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় সেগুলোকে دواعي الذكر ও دواعي الحذف বলা হয়। সুতরাং একটিকে অন্যটির উপর অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করতে হবে। অন্যথায় বিনা কারণে কোন শব্দের উল্লেখ যেমন গোটা বাক্যের বালাগাতগত মান ক্ষুণ্ন করবে তেমনি বিনা কারণে কোন শব্দের অনুল্লেখও বাক্যের অংগহানি করবে।

প্রথমে আমরা دَوَاعِي الذِّكْرِ উল্লেখ করবো।

১. ذكر এর প্রথম কারণ হলো বিষয়টিকে শ্রোতার সামনে অধিকতর স্পষ্ট করা এবং অধিকতর সুসাব্যস্ত করা। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলা হয়– زِيَادَةُ التَّقْرِيرِ وَ الْإِيْضَاحِ

উদাহরণ স্বরূপ নীচের আয়াতটি দেখো, মুত্তাকীদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেছেন–

أُولٰئِكَ على هُدًى من رَبِّهِم وَ أُولٰئك هم الْمُفْلِحون *

মুত্তাকীদের জন্য দু'টি বাক্যে দু'টি বিষয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। প্রথম বাক্যে তাদের জন্য হেদায়াতপ্রাপ্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্যে তাদের জন্য আখেরাতের সফলতা লাভ সাব্যস্ত করা হয়েছে। চিন্তা করে দেখো, দ্বিতীয় বাক্যের مسند إليه তথা أولئك এই ইসমুল ইশারাটি উল্লেখ না করে المفلحون -কে পূর্ববর্তী مسند إليه এর সাথে যুক্ত করে দিলেও উদ্দেশ্য পূর্ণ হতো। কিন্তু مسند إليه কে পুনরুক্ত করে দু'টি স্বতন্ত্র বাক্য ব্যবহারের উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রোতার অন্তরে বিষয়টিকে অধিকতর সুস্পষ্ট ও সুসাব্যস্ত করা এবং এ কথা বোঝানো যে, যাদের জন্য হেদায়াত সাব্যস্ত হয়েছে তাদেরই জন্য সফলতাও সাব্যস্ত হয়েছে।

العَاقِلُ مَنْ فَكَّرَ في العَوَاقِبِ، العاقِلُ مَنْ خَالَفَ نَفْسَهُ الأَمَّارَةَ بالسُّوءِ

উপরোক্ত বাক্যের দ্বিতীয় العاقل সম্পর্কেও একই কথা।

২. অনেক সময় متكلم আশংকা করেন যে, قرينة বা আলামতের ভিত্তিতে লফযটিকে হযফ করা হলে শ্রোতা উদ্দিষ্ট অর্থটি উদ্ধার করতে পারবে না। কেননা উদ্দিষ্ট অর্থের প্রতি ইংগিতকারী قرينة বা আলামতটি দুর্বল কিংবা শ্রোতার فهم বা অনুধাবন ক্ষমতাই দুর্বল। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলে– قِلَّةُ الثِّقَةِ بِالْقَرِيْنَةِ لِضُعْفِهَا أَوْ لِضُعْفِ فَهْمِ السامِعِ – এটা হলো حذف এর দ্বিতীয় কারণ।

যেমন ধরো, বেশ কিছুক্ষণ পূর্বে খালেদের আলোচনা হয়েছে কিংবা এইমাত্র আলোচনা হয়েছে, কিন্তু তার পরে অন্য কারো প্রসংগও আলোচিত হয়েছে। এমতাবস্থায় তুমি خالد নামটি উল্লেখ না করে তার সম্পর্কে বলতে পারো نعم الصديق – কেননা পূর্ববর্তী আলোচনা হচ্ছে ক্বারীনা, যা প্রমাণ করে যে, তুমি খালেদ সম্পর্কেই বলতে চাচ্ছো। কিন্তু তোমার আশংকা হচ্ছে যে, মাঝখানে সময়ের বেশ ব্যবধান হওয়ার কারণে কিংবা অন্যের প্রসংগ আলোচিত হওয়ার

কারণে শ্রোতা উদ্দিষ্ট অর্থ হয়ত হৃদয়ংগম করতে পারবে না। ফলে قرينة এর উপর আস্থা না করে তুমি নাম উল্লেখ করে বললে– خالد نعم الصديق

৩.অনেক সময় শ্রোতার বোধ ও বুদ্ধির সল্পতার প্রতি কটাক্ষ করার জন্য সুস্পষ্ট قرينة বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও লফযকে حذف না করে ذكر করা হয়। যেমন, কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করল, ماذا قال عمرو – উত্তরে তুমি শুধু قال كذا বলতে পারো। কেননা প্রশ্নে বিদ্যমান عمرو শব্দটি প্রমাণ করছে যে, قال-এর مسند إليه বা ফায়েল عمرو হবে। কিন্তু এমন সুস্পষ্ট ক্বারীনা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তুমি যদি قال عمرو كذا বলো তাহলে আমরা বুঝবো যে, مخاطب কে তুমি এতটা সল্পবুদ্ধি মনে করছো যে, সুস্পষ্ট قرنية থাকা সত্ত্বেও مسند إليه উল্লেখ না করলে সে তোমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে না।

তদ্রূপ من نبيك এ প্রশ্নের উত্তরে محمد صلى الله عليه وسلم বলাই যথেষ্ট ছিলো কিন্তু তুমি مسند উল্লেখ করে যদি محمد صلى الله عليه وسلم نبينا বলো তাহলে আমরা বুঝবো যে, তুমি প্রশ্নকারীর নির্বুদ্ধিতার প্রতি কটাক্ষ করছো। কেননা এমন স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ে প্রশ্ন করা নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। তাই তুমি যেন ধরে নিয়েছো যে, সুস্পষ্ট قرنية থাকা সত্ত্বেও مسند উল্লেখ না করলে বেচারা হয়ত বুঝতেই পারবে না। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে التَّعْرِيْضُ بِغَبَاوَةِ السَّامِعِ বলে।

৪. ذكر এর আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, বড়ত্ব ও মর্যাদা কিংবা হীনতা ও তুচ্ছতা প্রকাশ করা। যেমন, هل رجعَ القائدُ প্রশ্নের উত্তরে তুমি বললে, نعم رجعَ القائِدُ المنصورُ কিংবা نعم رجع القائِدُ المهزومُ

প্রথম উত্তরে القائد المنصور উল্লেখ করার উদ্দেশ্য تعظيم বা মর্যাদা প্রকাশ করা এবং দ্বিতীয় উত্তরে القائد المهزوم উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো تحقير বা তুচ্ছতা প্রকাশ করা।

৫. ذكر এর আরেকটি উদ্দেশ্য হলো বিস্ময় বা বিমুগ্ধতা প্রকাশ করা। এটা সাধারণতঃ অসাধারণ ও অস্বাভাবিক বিষয়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন তুমি বললে– عَلِيٌّ الشُّجاعُ يُقاوِمُ الأَسَدَ – অথচ আলীর আলোচনা আগে থেকেই চলে আসছিল। সুতরাং علي الشجاع কথাটা উল্লেখ না করলেও চলতো। কিন্তু তুমি বিস্ময় প্রকাশ করার জন্য তা উল্লেখ করেছ। কেননা বিষয়টি আসলেই বিস্ময়যোগ্য।

৬. ذكر এর আরেকটি উদ্দেশ্য হলো, বিষয়টিকে শ্রোতার সামনে সপ্রমাণ করে রাখা, যাতে পরে সে অস্বীকার করতে না পারে। যেমন বিচারক সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করলেন, هل أَقَرَّ زيدٌ بِالجَرِيمَةِ – আর সাক্ষী শুধু نعم কিংবা نعم أقر না বলে বললো نعم زيد هٰذا أَقَرَّ بالجرِيمَةِ – উদ্দেশ্য হলো শ্রোতা যেন এ কথা না বলে যে, তুমি তো যায়েদের নাম বলনি। অথবা অন্য যায়েদের কথা বলেছো। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে التَّسْجِيلُ عَلَى السامِعِ বলে।

৭. ذكر এর আরেকটি উদ্দেশ্য হল কথাকে দীর্ঘায়িত করা। এটা সাধারণতঃ প্রিয়জনের সাথে কিংবা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে আলাপকালে হয়ে থাকে। এর একটি সুন্দর উদাহরণ হলো, আল্লাহ পাকের সংগে হযরত মুসা (আঃ)-এর লাঠি প্রসংগে আলাপ। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন, و ما تلك بيمينك يا موسى – এর উত্তরে عَصَايَ বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আলাপ দীর্ঘায়িত করার জন্য هِيَ عَصَايَ বললেন। শুধু তাই নয়, লাঠির গুণগানও বলা শুরু করে দিলেন–

أَتَوَكَّأُ عليها وَ أَهُشُّ بها على غَنَمِيْ

কিন্তু মূসা (আঃ)-এর পরিমিতিবোধ লক্ষ করো; ولى فيها مآرب أخرى বলে তিনি কথা সংক্ষিপ্ত করে ফেললেন। কেননা, অতিদীর্ঘ কথন আদবের খেলাফ বিধায় তা বালাগাতের উচ্চস্তর থেকে নীচে নেমে যেতো।

৮. ذكر এর আরেকটি উদ্দেশ্য হলো প্রিয় শব্দের উচ্চারণ দ্বারা সুখ ও আনন্দ লাভ করা। উদাহরণ দেখো–

حَبِيْبِيْ قادِمٌ مِنْ سفَرٍ طويلٍ، اَسْتقبِلُ حَبِيْبِي فى المطَارِ

দ্বিতীয়বার حبيبي শব্দটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য আনন্দ লাভ ছাড়া আর কিছু নয়।

এবার আমরা ذكر ও تكرار এর কতিপয় সাধারণ উদাহরণ প্রয়োজনীয় পর্যালোচনাসহ পেশ করছি।

প্রথম উদাহরণ ঃ

و ما تَدْرِي نَفسٌ ماذا تكسِبُ غَدا، و ما تدري نفسٌ بِأَيِّ أرضٍ تموتُ

কোন মানুষ জানে না, আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে এবং কোন মানুষ জানে না কোন্ ভূমিতে তার মৃত্যু হবে।

এখানে দ্বিতীয়বার و ما تدري না বলে و لا بِأَيِّ أرضٍ تموتُ বলাই যথেষ্ট

ছিলো। কিন্তু ما تدري এর উল্লেখের মাধ্যমে দুটি স্বতন্ত্র বাক্য সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উভয় বাক্য স্বতন্ত্র উপদেশ ও নীতি কথা রূপে ব্যবহার করা যাবে, যা ما تدري এর উল্লেখ না করা অবস্থায় সম্ভব হত না। সুতরাং ذكر এর মাধ্যমে আয়াতটির বালাগাতগত সৌন্দর্য ও উপযোগিতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্বিতীয় উদাহরণ ঃ

وَ قد عَلِمَ القبائلُ مِنْ مَعَدٍّ + إذا قُبَبٌ بِأَبْطَحِها بَنَيْنَا
بِأَنَّا الْمُطْعِمون إذا قَدَرْنا + وَ أَنَّا المُهْلِكون إذا ابْتُلِيْنا
وَ أَنَّا المانِعُونَ إذا أَرَدْنا + وَ أَنَّا النازِلُونَ بِحَيْثُ شِيْنَا
وَ أَنَّا التارِكُون إذا سَخِطْنَا + وَ أَنَّا الآخِذُوْنَ إذا رَضِيْنَا
وَ أَنَّا العاصِمُونَ إذا أُطِعْنَا + وَ أَنَّا العَازِمُون إذا عُصِيْنَا
وَ نَشْرَبُ إِنْ وَرَدْنَا الماءَ صَفْوًا + وَ يَشْرَبُ غَيْرُنا كَدِرًا وَ طِينَا

গোত্রবর্গের উন্মুক্ত প্রান্তরে আমরা যখন গম্বুজ সদৃশ তাঁবু টানাই তখন সবাই স্বীকার করে যে, স্বেচ্ছায় আমরা আহার দান করি। আবার লড়াইয়ের মুখোমুখি হলে আমরা ধ্বংস করি। যখন ইচ্ছা আমরা বাধা দান করি। যেখানে ইচ্ছা আমরা অবস্থান করি। (আমাদের ইচ্ছাকে অসম্মান করার দুঃসাহস কারো নেই।) অসন্তুষ্ট হলে (অতি বড় মানুষের দানও) আমরা বর্জন করি। আবার সন্তুষ্ট হলে (সাধারণ মানুষের উপহারও) আমরা গ্রহণ করি। আমাদের আনুগত্য করা হলে আমরা (তাদের) রক্ষা করি। কিন্তু অবাধ্য হলে আমরা দৃঢ়ভাবে রুখে দাঁড়াই। যখন আমরা জলাশয়ে নামি তখন স্বচ্ছ পানি পান করি, আর অন্যরা পান করে কাদা পানি।

দেখো, জাহেলী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আমর বিন কুলছুম তার সুবিখ্যাত 'ঝুলন্ত গীতিকায়' নিজের ও স্বগোত্রের আত্মগর্ব প্রচার করতে গিয়ে প্রতিটি গুণ ও কীর্তির সঙ্গে أنا এই مسند إليه টি পুনরুক্ত করেছেন। অথচ أنا এর পুনরুক্তির পরিবর্তে সবকটি গুণ ও কীর্তিকে عطف করলেই হতো। কিন্তু প্রতিটি গুণ ও কীর্তিকে আলাদা বাক্যে উপস্থাপন দ্বারা শ্রোতার অন্তরে কবির কীর্তিগাথা যেভাবে রেখাপাত করবে এবং বারংবার উচ্চারিত أنا যে আত্মগৌরব প্রকাশ করবে তা কিন্তু হারিয়ে যেতো।

গাযওয়াতুল হোনায়নে এ কারণেই নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন–

أَنَا النَّبِيُّ لا كَذِبْ + أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

তৃতীয় উদাহরণ

أَخِلَّائِيْ الكِرامُ سِوَى سَدوسٍ + وَ مالِيْ فِيْ سَدوسٍ من خليلِ

আমার মহান বন্ধুরা সকলেই সাদুস গোত্র বহির্ভূত। সাদূস গোত্রে আমার কোন বন্ধু নেই।

إذا أَنْزَلْتَ رَحْلَكَ في سَدوسٍ + فَقَدْ أَنْزَلْتَ مَنْزِلَةَ الذَّليلِ

তুমি.যদি সাদূস গোত্রে (মেহমান হওয়ার জন্য) সওয়ারি নামাও, তাহলে বুঝে নাও যে, নিজেকে তুমি অপদস্থের স্থলে নামালে।

وَ قد علِمَتْ سدوسٌ أَنَّ فيها + مَنارَ اللُّؤْمِ واضِحَةَ السَّبيلِ

সাদূসগোত্র ভাল করেই জানে যে, ইতরতার সুউচ্চ মিনার রয়েছে তাদের মাঝে।

فَما أعطَتْ سدوسٌ من كثيرٍ + و لا حامَتْ سدوسٌ عن قَليلٍ

সাদূস এত কৃপণ যে, প্রাচুর্যের সময়ও কিছু দান করে না। সাদূস এমনই ভীরু ও দুর্বল যে, (অভাবের সময়ও শত্রুর থাবা থেকে) যা কিছু সামান্য সম্পদ তা রক্ষা করতে পারে না।

কবি জারীরের এ নিন্দা কবিতাটি দেখো। سدوس শব্দটির বারংবার উল্লেখের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাদূস গোত্রের প্রতিটি দোষ আলাদা আলাদাভাবে তুলে ধরা এবং প্রতিটি পংক্তিকে একেকটি 'নিন্দা-তীর' রূপে সাদূস গোত্রের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া যাতে তাদের প্রতিটি দোষ মানুষের মাঝে স্বতন্ত্র খ্যাতি লাভ করে। বলাবাহুল্য যে, পূর্ববর্তী উদাহরণে أنا বাদ দিয়ে শুধু গুণগুলো উল্লেখ করলে এবং বর্তমান উদাহরণে গোত্রের নাম বাদ দিয়ে শুধু দোষগুলো উল্লেখ করলে প্রতিটি দোষ বা গুণ স্বতন্ত্র আবেদন সৃষ্টি করতে পারতো না।

চতুর্থ উদাহরণ

وَ لو أَنَّ أهلَ القُرى آمنوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عليهم بَرَكٰتٍ من السَّماءِ و الأرضِ و لٰكِنْ كَذَّبوا فأخذنٰهم بما كانوا يكسِبون * أَ فَأَمِنَ أهلُ القرى أَنْ يَأتِيَهم بأسُنا بَيٰتا و هم نائمون * أَوَ أَمِنَ أهلُ القرى أن يأتيَهم بأسُنا ضُحًى

و هم يلعَبون، أ فَأَمِنوا مَكْرَ اللّٰهِ فلا يَأْمَنُ مكْرَ اللّٰهِ إلا القومُ الخٰسـرون *

বিভিন্ন জনপদের অধিবাসীরা যদি ঈমান গ্রহণ করতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করতো তাহলে তাদের উপর আসমান ও যমীনের বরকতসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা (আমার অহীকে) মিথ্যাপ্রতিপন্ন করল। তাই তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেকে পাকড়াও করলাম। আচ্ছা, জনপদের অধিবাসীরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, রাত্রে তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় আমার 'পরাক্রম' তাদের উপর আপতিত হবে কিংবা জনপদের অধিবাসীরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে যে, পূর্বাহ্নে তাদের ক্রীড়ারত অবস্থায় আমার পরাক্রম তাদের উপর আপতিত হবে। আচ্ছা, তারা কি আল্লাহর কৌশল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে। আল্লাহর কৌশল সম্পর্কে তো ক্ষতিগ্রস্তরাই শুধু নিশ্চিন্ত হতে পারে!

এখানে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন জনপদের অধিবাসী কাফিরদের অন্তরে তার আযাব গজব সম্পর্কে ভীতি সঞ্চার করতে চেয়েছেন, যা দিনে বা রাত্রে যে কোন সময় আচমকা তাদের উপর নেমে আসতে পারে। তাই أفأمن (তারা কি নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে) অংশটিকে সতর্কবাণী রূপে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ছিলো স্থান-কাল-পাত্রের দাবী। যেমন ঘুমন্ত ও গাফেল ব্যক্তিদেরকে লাগাতার বিপদঘন্টি বাজিয়ে সতর্ক করা হয়; তেমনি أفأمن অংশটিকে বারংবার উচ্চারণের মাধ্যমে বেখবর কাফিরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। বলাবাহুল্য যে, أفأمن অংশটির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ছাড়া সতর্কীকরণের উদ্দেশ্য অর্জিত হতো না, যদিও অনুক্ত অবস্থায়ও তা বোঝা সম্ভব ছিলো।

পঞ্চম উদাহরণ

নজদের অধিবাসিনী খানসা, তোমাযির বিন আমর ছিলেন মোযার গোত্রের বনী সোলায়ম শাখার মেয়ে। আরবের শ্রেষ্ঠ এই মহিলা কবি জাহেলী ও ইসলামী উভয় যুগ পেয়েছিলেন। বনী সোলায়মের প্রতিনিধিদলের সংগে তিনিও নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়েছিলেন। কবি খানসা তার বৈমাত্রেয় ভাই ছাখার নিহত হওয়ার পর যে মর্মস্পর্শী শোকগাথা রচনা করেছিলেন মূলতঃ সেটাই আরবী কাব্য-জগতে তাকে অমর করে রেখেছে। নমুনা দেখো–

أَعَـيْنَيَّ جُـودَا و لا تَجْمُدَا + أَلا تَبْـكِيَانِ لِصَخْرِ النَّدَىٰ

أَلَا تَبْكِيَانِ الجَوادَ الجَمِيْلَ + أَلا تَبْكِيَانِ الفَتَى السَّيِّدَا!

পোড়া চোখ, অঝোরে অশ্রু ঝরাও। জমাট বেঁধে থেকো না। দানবীর 'ছাখার' এর শোকে কাঁদবে না?!

সুদর্শন দানবীরের শোকে কেন কাঁদবে না! যুবক নেতার শোকে কেন কাঁদবে না!

দেখো, ভ্রাতৃশোকে মুহ্যমান কবি-হৃদয় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই যেন ألا تبكيان বলে বারবার দু' চোখের প্রতি অশ্রু ঝরানোর মিনতি জানাচ্ছে। যদিও প্রথম পংক্তিটিই উদ্দেশ্য প্রকাশের জন্য যথেষ্ট ছিলো, কিন্তু পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ছাড়া ব্যথিত হৃদয়ের আকুতি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেতো না এবং শোকচ্ছ্বাসেরও উপশম হতো না।

পরবর্তীতে দেখো, একই কারণে وَ ابْكِيْ أَخَاكِ বলে বার বার তিনি আত্ম-সম্বোধন করেছেন।

وَ ابْكِي أَخاكِ وَ لا تَنْسَيْ شَمائِلَهُ + وَ ابْكِيْ أَخاكِ شُجاعًا غيرَ خَوَّارِ

কাঁদো হে খানসা, ভ্রাতৃশোকে কাঁদো, ভুলে যেও না তার এত এত গুণ-কীর্তি।

কাঁদো হে খানসা নির্ভীক ও সাহসী ভ্রাতার শোকে কাঁদো।

وَ ابْكِي أَخاكِ لِأَيْتامٍ و اَرْمَلَةٍ + وَ ابْكِيْ أَخاكِ لِحَقِّ الضَّيْفِ وَ الجارِ

এতীম সন্তান ও তাদের বিধবা মায়ের কথা স্মরণ করে কাঁদো হে খানসা, ভ্রাতৃশোকে কাঁদো। আর কাঁদো তার প্রতিবেশী ও অতিথি-সেবার কথা স্মরণ করে।

দেখো, এখানে و ابكي أخاك অংশটির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ ছাড়াই কবি তার নিহত ভাইয়ের গুণ-কীর্তিগুলো তুলে ধরতে পারতেন। কিন্তু এটা ছিলো ভ্রাতৃহারা বোনের শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের দাবী। কবি তার সবটুকু কাব্য প্রতিভা উজাড় করে সে দাবীই পূর্ণ করেছেন।

خلاصة الكلام

الأَصْلُ فى الكَلامِ أَنْ يُذْكَرَ كلُّ عُنْصُرٍ من عَناصِرِه، لِيَدُلَّ علي المعنى الذي أُرِيد منه، و إذا وُجِدَتْ قرينةٌ يفهَمُ منها اللفظُ دونَ أن يُذكَرَ جاز ذِكْرُه علي ما هو الأصلُ فى الكلامِ، و جازَ حَذْفُه لِدَلالَةِ القرينةِ عليه . و إذا دَعَا داعٍ إلى الذكرِ أو الحذفِ رَجَّحَه البُلَغاءُ .

فَلِكُلٍّ مِنَ الذكرِ و الحذفِ مقامٌ يناسِبُه و داعٍ يدعو إليه :

فَدواعِي الذِّكْرِ هي :

(١) إرادةُ الإيضاحِ و التقريرِ (١) .

(٢) وَ قلَّةُ الثقةِ بالقرينةِ لضَعفِها أو لِضُعْفِ فَهْمِ السامعِ .

(٣) الإشارة إلى غَباوَةِ السامعِ .

(٤) التسجيل على السامع حَتّى لا يَتَأَتّى له الإِنْكارُ .

(٥) التعظيم أو التحقير (٢) .

(٦) إظهار التعجب أو الاعجاب .

(٧) إرادةُ بسطِ الكلام (٣) .

(٨) الاستلذاذ بذكرِ الاسمِ المحبوبِ .

---

(١) يحسن هذا في الوعظ و الإرشاد و فى إثارة الحماسة و العواطف و في بيان العقائد و أحكام الحلال و الحرام و القانون .

(٢) و يكون هذا بالأسماء و الألقاب التى يُشعِر ذكرُها بِعَظَمةِ أصحابها و حقارتهم .

(٣) و يحسن هذا في مقام الافتخار أو المدح أو الذم أو التوبيخ و الحديث مع الأحبة .

الحذف و أقسامه

বালাগাতের উচ্চরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন কারণে কখনো কখনো জুমলার কোন কোন অংশকে উচ্চারণের চেয়ে অনুক্ত রাখাকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন, যাতে مخاطب তার নিজস্ব বোধ ও বিচক্ষণতা দ্বারা কিংবা বাক্যের পূর্বাপর قرينة দ্বারা তা হৃদয়ংগম করার স্বাদ লাভ করতে পারে।

বলাবাহুল্য যে, কখনো কখনো অনুক্তিতে বক্তব্যের যে সৌন্দর্য ও আবেদন সৃষ্টি হয় উক্তিতে তা একেবারেই মাঠে মারা যায় এবং বালাগাত-গুণ বিনষ্ট হয়ে যায়।

এ জন্যই বালাগাতশাস্ত্রের পথিকৃত ইমাম আব্দুল কাহির জুরজানী دلائل الإعجاز গ্রন্থে বলেছেন, ভাবের অনুচ্চারিতপ্রকাশ অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়। যাদুর মতই যেন এর প্রভাব। ভাব প্রকাশের জন্য অনুচ্চারণ অনেক সময় উচ্চারণের চেয়ে অর্থময় হয়ে উঠে এবং শব্দের চেয়ে নৈশব্দ অনেক বেশী আবেদনপূর্ণ হয়ে উঠে।

أقسام الحذف

دواعي الحذف সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমরা حذف এর প্রকার সম্পর্কে কিছুটা ধারণা তোমাকে দিতে চাই। حذف মোটামুটি চার প্রকার–

প্রথমতঃ শব্দাংশ حذف করা। যেমন, أ فاطمة থেকে أ فاطم – এটাকে তারখীম বলে। এর উদ্দেশ্য হলো منادى এর প্রতি আদর প্রকাশ করা কিংবা শব্দসংকোচন করা কিংবা শব্দের উচ্চারণ সহজ করা ইত্যাদি।

অবশ্য পুরো مضاف إليه হযফ করেও ترخيم করা হয়। যেমন, يا عبد المالك থেকে يا عبد

منادى এর مضاف إليه রূপে ব্যবহৃত يا المتَكلم কে হযফ করা হয়। যেমন–
يـا رَبِّ، يَـا ابْنَ أُمِّ، يـا عِبَادِ

তদ্রূপ حرف النداء এবং منادى এর مضاف إليه রূপে ব্যবহৃত ياء المتكلم কে এক সাথে হযফ করা হয়। যেমন, رَبِّ ابْنِ لي عندَك بيتًا في الجنةِ

তদ্রূপ সাধারণভাবেও ياء المتكلم কে হযফ করা হয়। যেমন–

فَأخذتُهم فكيفَ كان عِقَابِ (أى فكيف كان عقابي)

দ্বিতীয়তঃ জুমলার অংশ হযফ করা। যথা مسند বা مسند إليه হযফ করা, কিংবা উভয়টিকে হযফ করে অন্য কোন অংশকে তার স্থলবর্তী করা। যেমন– يـا زيـد এখানে فعل ও فاعل উহ্য রয়েছে এবং حرف النداء কে তার স্থলবর্তী করা হয়েছে। তদ্রূপ عفوا মাছদারকে اعف এর স্থলবর্তী করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে حال، تمييز، صفة، موصوف، مفعول জাতীয় জুমলার অন্যান্য অপ্রধান অংশকেও জুমলা থেকে হযফ করা হয়। (তবে محذوف অংশটি চিহ্নিত করার মত ক্বারীনা বিদ্যমান থাকা আবশ্যক।)

তৃতীয়তঃ পূর্ণ একটি জুমলা হযফ করা। যেমন, جملة القسم কে হযফ করা। উদাহরণ দেখো–

وَ تَفَقَّدَ الطيرَ فقال مالِيَ لا أَرى الهُدْهُدَ أم كانَ من الغائبِين * لَأُعذبنَّه عذابًا شديدًا أو لَأَذبحنَّه أو لَيَأْتِيَنِّيْ بِسُلطانٍ مبينٍ ۔ (أى أُقْسِمُ باللّٰهِ لَأُعذبنه)

তিনি পক্ষীসম্প্রদায়ের তল্লাশী নিলেন, আর বললেন, কি হল হুদহুদকে দেখছি না কেন? নাকি সে গায়েব হল। (আল্লাহর কসম) অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেবো কিংবা অবশ্যই তাকে জবাই করবো অথবা অবশ্যই সে আমার সমীপে উপযুক্ত কারণ উপস্থিত করবে।

কিংবা جواب القسم হযফ করা। যেমন–

وَ النّٰزِعٰتِ غَرْقا * و النّٰشِطٰت نَشْطا * و السّٰبِحٰت سَبْحا * فالسّٰبِقٰت سَبْقا * فالمدبِّرٰتِ أَمْرا * (أَيْ لَنبعَثَنَّهُمْ و لَنُحاسِبَنَّهم) – يَوْمَ تَرْجِف الرَّاجِفَة

শপথ সেই ফিরেশতাকুলের যারা (দেহের অভ্যন্তরে) ডুব দিয়ে আত্মাকে উৎপাটন করে এবং শপথ তাদের যারা আত্মার বাঁধন খুলে দেয় মৃদুভাবে এবং শপথ তাদের যারা দ্রুত সন্তরণ করে এবং শপথ তাদের যারা অগ্রসর হয় ক্ষিপ্রবেগে এবং শপথ তাদের যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে (অবশ্যই আমি মানব সম্প্রদাকে পুনরুত্থিত করবো এবং তাদের হিসাব নেবো) যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী।

কিংবা جواب الشرط হযফ করা। যেমন–

وَ لو أَنَّ قرآنًا سُيِّرَتْ به الجِبالُ أو قُطِّعت به الأرضُ أو كُلِّمَ به المَوْتٰى (أَيْ

لَكانَ هذا القرآنُ المنَزَّلُ على محمَّدٍ)

যদি কোন কোরআন এমন হতো যা দ্বারা পাহাড় টলানো যায় কিংবা ভূমি খণ্ডিত করা যায় কিংবা মৃতকে সবাক করা যায় (তবে মুহাম্মদের উপর অবতীর্ণ এই কোরআনই হতো তা)।

কিংবা جملة الشرط হযফ করা। যেমন–

يٰعِبادِيَ الذين آمنوا إِنَّ أرضي واسِعَة فَإِيّٰيَ فاعبدون (أَيْ فَإِنْ لم يُمْكِنْكُمْ إِخلاصُ العِبادَةِ في أَرضٍ فَإِيَّايَ فاعبدونِيْ فى غَيْرِها) .

চতুর্থতঃ একাধিক জুমলা হযফ করা। কোরআন শরীফে এর বহু উদাহরণ রয়েছে। যেমন–

فَأَرْسِلُونِ .... يوسفُ أيها الصِّدِّيقُ (أَيْ فَأرسلونِي إلىٰ يوسفَ، فَأَرْسَلوه إليهِ فَقالَ يا يوسف ٠)

دواعي الحذف

এবার আমরা دواعي الحذف সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১। হযফের একটি উদ্দেশ্য হল مخاطِب ছাড়া অন্যদের থেকে বিষয়টি গোপন রাখা। যেমন অনেকের মাঝে বসে থাকা مخاطِب কে উদ্দেশ্য করে তুমি বললে– أَقْبَلَ (أي أقبلَ عليٌّ مَثَلاً) তদ্রূপ وَجَدتُ (أي وجدت الكتابَ مثلا) অবশ্য এটা তখনই হতে পারে যখন বিষয়টি সম্পর্কে مخاطِب এর পূর্বধারণা থাকবে।

২। অনেক সময় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে কোন বক্তব্য অস্বীকার করতে হয়। যেমন ধরো, মাজেদের কথা আলোচনা হচ্ছিল, তুমি তার সম্পর্কে বলে উঠলে– لَئِيمٌ خَسِيسٌ – মাজেদ যখন চেপে ধরলো যে, তুমি আমাকে গালি দিলে কেন? এমতাবস্থায় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তুমি বলতে পারো যে, আমি কি তোমার কথা বলেছি? তখন ব্যাপারটা সবাই বুঝলেও আইনতঃ তোমাকে আর কিছুই বলার থাকবে না।

মোটকথা, جملة এর কোন অংশকে حذف করার দ্বিতীয় কারণ হলো প্রয়োজনে অস্বীকার করার সুযোগ রাখা।

৩। حذف করার আরেকটি কারণ হলো এদিকে ইংগিত করা যে, যা হযফ করা হয়েছে তা সুনির্ধারিত। অর্থাৎ সকলেরই জানা আছে, সুতরাং উল্লেখ করা নিরর্থক। এই ইংগিত বাস্তবানুগ হতে পারে। অর্থাৎ বাস্তবিকই বিষয়টি সুনির্ধারিত এবং সকলের জানা। কিংবা এটা নিছক তোমার নিজস্ব দাবী হতে পারে। যেমন তুমি বললে– خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ এখানে الله শব্দটিকে حذف করে তুমি এদিকে ইংগিত করছো যে, مسند إليه সুনির্ধারিত এবং সকলের জানা। তোমার এ ইংগিত বাস্তবানুগ। আবার ধরো, নিজের বন্ধুর প্রশংসা করে তুমি বললে– وَهَّابُ الأُلُوفِ এখানে صديقي শব্দটি حذف করে তুমি এদিকে إشارة করতে চাচ্ছো যে, বিষয়টি তো সুনির্ধারিত। সকলেই জানে যে, صديقي ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। আসলে কিন্তু সকলের জানা থাকাটা অনিবার্য নয়, এটা নিছক তোমার দাবী।

৪। হযফ করার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো শ্রোতার বোধক্ষমতা আছে কি না তা পরীক্ষা করা কিংবা কি পরিমাণ বোধক্ষমতা আছে তা পরীক্ষা করা। যেমন– তুমি চাঁদ সম্পর্কে বললে–

১. نُوره مُسْتَفادٌ من نورِ الشَّمْسِ   ২. هَو واسِطَةُ عِقْدِ الكَواكِبِ

প্রথম বাক্যটির অর্থ হলো চাঁদের আলো সূর্যের আলো থেকে প্রাপ্ত। এটা সকলেরই জানা কথা। সুতরাং ন্যূনতম বোধক্ষমতা যার আছে সেই বুঝতে পারবে যে, এখানে القمر শব্দটি উহ্য রয়েছে। কেননা, এখানে قرينة স্পষ্ট।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্যটির অর্থ হলো, সে তারকামালার মধ্যমণি। এটি একটি অলংকারপূর্ণ উপমা। অর্থাৎ ছোট ছোট মুক্তো দিয়ে তৈরী গলার হারের মধ্যস্থলে যেমন একটি বড় মুক্তো যুক্ত করা হয় তেমনি আকাশের তারকা দ্বারা যদি একটি মালা তৈরী করা হয় তাহলে চাঁদ হবে সেই তারকামালার মধ্যমণি। এই উপমা উপলব্ধি করা এবং هو দ্বারা যে এখানে চাঁদ বোঝানো হয়েছে তা বুঝতে পারা সাধারণ বোধক্ষমতাসম্পন্ন লোকের পক্ষে সম্ভব নয়, বরং যথেষ্ট বোধক্ষমতা ও অলংকার জ্ঞানের প্রয়োজন। কেননা قرينة এখানে অস্পষ্ট।

সুতরাং প্রথম বাক্যটিতে القمر অনুক্ত রাখার উদ্দেশ্য হলো শ্রোতার ন্যূনতম বোধক্ষমতা পরীক্ষা করা, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্যে উদ্দেশ্য হলো শ্রোতার বোধক্ষমতার সূক্ষ্মতা ও পরিমাণ পরীক্ষা করা।

৫। সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার আশংকায় কথা সংক্ষেপ করার জন্য বাক্যের

অংশবিশেষ حذف করা হয়। যেমন একটি হরিণ দেখে শিকারীকে সতর্ক করার জন্য তুমি هذا غزال না বলে শুধু غَزالٌ বললে। কেননা তুমি আশংকা করছো যে, هذا বলতে বলতে হয়ত হরিণ চোখের আড়ালে চলে যাবে।

তদ্রূপ পড়ো পড়ো দেয়ালের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা লোককে সতর্ক করার জন্য তুমি বললে, الجِدارَ – এখানে তুমি اِتَّقِ বা تَجَنَّبْ (ফেয়েল ও ফায়েলসহ) অনুক্ত রেখেছো। কেননা তোমার আশংকা এই যে, পুরো কথা বলার আগেই হয়ত দেয়াল পড়ে যাবে; ফলে লোকটি সতর্ক হওয়ার সুযোগই পাবে না।

৬. শোক, বিষণ্নতা, বিরক্তি ইত্যাদির কারণে কথা লম্বা করার ইচ্ছা থাকে না, তখনও বাক্যের অংশবিশেষ হযফ করা হয়। উদাহরণ হিসাবে নিম্নোক্ত কবিতা পংক্তিটি দেখো–

قالَ لي كيفَ أنتَ قلتَ عَليلْ + سَهَرٌ دائِمٌ و حُزْنٌ طَويلْ

আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, কেমন আছো তুমি! বললাম, 'অসুস্থ'; স্থায়ী অনিদ্রা আর দুশ্চিন্তা।

এখানে অসুস্থতা, অনিদ্রা ও দুশ্চিন্তায় বিষণ্ন কবি أنا عليل না বলে শুধু عليل বলেছেন।

৭. কবিতার ছন্দ ও অন্ত্যমিল রক্ষা করার জন্য কিংবা গদ্যের ছন্দ রক্ষা করার জন্যও বাক্যের অংশবিশেষ হযফ করা হয়। যেমন–

نَحن بِما عندَنا و أنتَ بما + عِندَك راضٍ وَ الرَّايُ مُخْتَلِفُ

এখানে কবিতার ছন্দ রক্ষা করার জন্য نحن এর মুসনাদ راضون শব্দটি হযফ করা হয়েছে। পংক্তির দ্বিতীয় পর্বের راض থেকে শ্রোতা সহজেই সেটা বুঝে নিতে পারবে।

অন্ত্যমিল রক্ষার জন্য হযফের উদাহরণ–

وَ مَا المالُ وَ الأَهْلُونَ اِلاَّ وَدائِعُ + وَ لا بُدَّ يَومًا أَنْ تُرَدَّ الودائِعُ

সন্তান-সন্ততি আমানত ছাড়া কিছু নয়। আর আমানত একদিন না এক দিন ফেরত দিতেই হয়।

এখানে فاعل উল্লেখপূর্বক أن تَرُدَّ যদি বলা হতো তাহলে قافية বা অন্ত্যমিল নষ্ট হয়ে যেতো। কেননা পংক্তির প্রথম ودائع শব্দটি مرفوع হয়েছে। অথচ দ্বিতীয়

পর্বের الودائع শব্দটি منصوب হয়ে যাবে।

গদ্যের ছন্দ রক্ষার জন্য হযফের উদাহরণ–

أَ لَمْ يَجِدْكَ يتيمًا فَآوَىٰ * وَ وَجَدكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ *

এখানে آوى ও هدى এর مفعول به তথা ك সর্বনামটি অনুক্ত রয়েছে। উদ্দেশ্য বাক্যের ছন্দগত ও আলংকারিক সন্দৌর্য রক্ষা করা।

৮. হযফ করার আরেকটি উদ্দেশ্য হল তাযীম ও মর্যাদা প্রকাশ করা। অর্থাৎ তুমি যেন বোঝাতে চাও যে, আমার ছোট মুখে এমন মর্যাদাপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ শোভনীয় নয়। যেমন– محمد صلى الله عليه وسلم بشير و نذير و سراج منير না বলে তুমি শুধু بشير و نذير و سراج منير বললে।

কিংবা তুচ্ছতা প্রকাশ করা। অর্থাৎ তুমি যেন বলতে চাও যে, এমন তুচ্ছ শব্দ আমার মুখে উচ্চারণের উপযুক্ত নয়। যেমন– إِبليسٌ مطرودٌ منَ الجنةِ না বলে শুধু مطرود من الجنة বললে।

৯. নীচের আয়াতটি দেখো– و الله يَدعو إلى دارِ السَّلام

এখানে يدعو এর مفعول به কে حذف করা হয়েছে। মূলতঃ এ রূপ ছিলো– و الله يدعو جميعَ عبادِه – ফলে বাক্যটি সংক্ষিপ্ত হয়েছে। আবার অর্থগত ব্যাপকতা সৃষ্টি হয়েছে। কেননা مفعول এর অনুল্লেখ مفعول এর ব্যাপকতা প্রমাণ করে। অবশ্য جميع عباده অংশটি উল্লেখ করলেও ব্যাপকতা সাব্যস্ত হতো। কিন্তু إيجاز ও সুসংক্ষেপনের সৌন্দর্য হাতছাড়া হয়ে যেতো। সুতরাং বোঝা গেলো যে, এখানে সংক্ষিপ্ততার সাথে ব্যাপকতা প্রকাশের জন্য বাক্যের একটি অংশ হযফ করা হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে تَعمِيمٌ مَعَ الاختصارِ বলে।

১০. নীচের আয়াতটি দেখো–

قُلْ هل يَسْتَوِي الذين يعلَمون و الذين لايَعلمون

এখানে শুধু এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, যাদের ইলম রয়েছে আর যাদের ইলম নেই তারা সমান নয়। কোন্ বিষয়ের ইলম, সেটা এখানে মুখ্য বিষয় নয়। তাই يعلمون এর مفعول উহ্য করে الفعل المتعدي কে الفعل اللازم এর সমপর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে تَنْزِيلُ الفعلِ المُتَعَدِّيْ منـزِلَةَ اللازم বলে। অর্থাৎ فاعل এর জন্য فعل এর ثبوت ও عدم ثبوت এর বিষয়টি মূল উদ্দেশ্য এবং مفعول به এর প্রসংগটি গৌণ হওয়ার কারণে

জুমলা থেকে **مفعول به** এর উপস্থিতি এমনভাবে মুছে ফেলা যেন **الفعل اللازم** এর মত আলোচ্য এই ফেয়েলটিরও কোন **مفعول به** নেই। নীচের আয়াতগুলো সম্পর্কেও একই কথা।

وَ اَنَّه هو أَضْحَكَ وَ أَبْكٰى و أَنه هو أماتَ و أَحْيَا ... و أنه هو أَغْنَى وَ أَقْنَى

এখানে মুখ্য উদ্দেশ্য হলো এ কথা বলা যে, উল্লেখিত **فعل** গুলো আল্লাহ পাকই সৃষ্টি করে থাকেন। **مفعول به** এর প্রসংগ এখানে অবান্তর, তাই জুমলা থেকে সেগুলো সম্পূর্ণ মুছে ফেলে **فعل** গুলোকে **فعل لازم** এর মত ব্যবহার করা হয়েছে।

১০. নীচের কবিতা পংক্তিতে কবি বুহতুরী তার প্রশংসার পাত্রকে সম্বোধন করে বলছেন।

قَدْ طَلَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ لَكَ فِي السُّؤْ + دَدِ وَ الْمَجْدِ وَ الْمَكَارِمِ مَثَلا

আমি খুঁজেছি, কিন্তু নেতৃত্ব, মর্যাদা ও মহৎ গুণাবলীর ক্ষেত্রে আপনার কোন সমকক্ষ পাইনি।

দেখো, 'আপনার কোন সমকক্ষ পাইনি' এ কথা বলা আশোভনীয় নয়। কেননা এতে ممدوح -এর অনন্যতা প্রমাণিত হয়। কিন্তু 'আপনার সমকক্ষ খুঁজেছি' এ কথা বলা অশোভনীয়। কেননা এতে ممدوح এর সমকক্ষ থাকার সম্ভাবনা বোঝা যায়। সুতরাং ممدوح এর উদ্দেশ্যে এটা বলা আদবের খেলাফ। তাই আদব রক্ষার্থে কবি বুহতুরী قد طلبنا لك مثلا না বলে শুধু قد طلبنا বলেছেন। সুতরাং আমরা বুঝতে পারি যে, حذف এর একটি উদ্দেশ্য হল আদব রক্ষা করা।

১১. শুধু ایجاز ও اختصار অর্থাৎ সংক্ষেপনের উদ্দেশ্যেও **مفعول به** কে হযফ করা হয়। যেমন কোরআন শরীফে রয়েছে- رَبِّ اَرِنِيْ اَنْظُرْ إِلَيكَ এখানে নিছক সংক্ষেপনের উদ্দেশ্যে ارني এর দ্বিতীয় **مفعول به** কে হযফ করা হয়েছে। মূলতঃ ছিল ارني ذاتك

তদ্রূপ اَصْغَيْتُ إليه বাক্যটি মূলতঃ ছিল اَصْغَيْتُ إليه أُذُنِي - শুধু সংক্ষেপনের উদ্দেশ্যে اذني কে হযফ করা হয়েছে।

১২. নীচের আয়াতটি লক্ষ্য করো-

وَ لو شاءَ لَهَداكم اَجْمَعين

তিনি যদি (...) ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের সকলকে হেদায়েত দান করতেন।

দেখো, و لو شاء এই শর্তবাচক অংশটুকু শোনার পর যে কোন শ্রোতা বুঝবে যে, আল্লাহর ইচ্ছা যুক্ত হওয়ার মত কোন একটা বিষয় এখানে রয়েছে। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে না জানার কারণে শ্রোতা পরবর্তী অংশটুকুর জন্য উৎকর্ণ হবে। ফলে لهداكم এই جواب الشرط টি শ্রোতার অন্তরে জোরদারভাবে প্রবেশ করবে এবং এটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, شاء এর مفعول به হচ্ছে هدايتكم – অর্থাৎ لو شاءَ هِدايَتكم لَهَداكم أجمعين – সুতরাং বোঝা গেলো যে, এখানে مفعول به কে حذف করার উদ্দেশ্য হচ্ছে অস্পষ্টকরণের পর স্পষ্টকরণ, যাতে শ্রোতার অন্তরে প্রথমে কৌতুহল জাগ্রত হয় এবং পরে তা নিবৃত্ত হয়। এভাবে বিষয়টি অন্তরের গভীরে প্রবিষ্ট হওয়ার সুযোগ পায়। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলে البَيانُ بعدَ الإبهامِ لِتَقْرِيرِ المعنَى في النفسِ

إرادة ও مشيئة জাতীয় মাছদার থেকে নির্গত ফেয়েল যখন شرط রূপে ব্যবহৃত হয় তখনই সাধারণত এটা হয়ে থাকে।

বিভিন্ন কারণে فعل কে نائب الفاعل এর দিকে إسناد করা হয়। যথা–

(ক) سُرِقَ مَتاعي – এখানে فاعل অজ্ঞাত হওয়ার কারণে فاعل এর পরিবর্তে نائب الفاعل এর দিকে فعل এর إسناد করা হয়েছে।

(খ) خُلِقَ الإنسانُ ضَعيفا এখানে فاعل সর্বজ্ঞাত হওয়ার কারণে فاعل এর পরিবর্তে نائب الفاعل এর দিকে ফেয়েলের إسناد করা হয়েছে। فاعل উল্লেখের প্রয়োজন মনে করা হয়নি।

(গ) فاعل এর পক্ষ হতে অনিষ্টের আংশকায় فاعل জানা থাকা সত্ত্বেও তার পরিবর্তে نائب الفاعل এর দিকে ফেয়েলের إسناد করা হয়। যেমন– قتل فلان

(ঘ) فاعل এর উপর বিপদ নেমে আসতে পারে, এ আশংকায় فاعل এর পরিবর্তে نائب الفاعل এর দিকে فعل এর إسناد করা হয়। যেমন–

أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَظْلِمِ الناسَ

خلاصة الكلام

قد يكونُ الحذفُ أَبْلَغَ من الذكرِ و إليك بعضَ دواعي الحذفِ :

(١) إخفاءُ الأمرِ عن غيرِ المخاطَبِ .

(٢) تيسيرُ الإنكارِ عندَ الحاجةِ .

(٣) الإشارةُ إلى أنَّ المحذوفَ متعيِّنٌ، و ذلك حقيقةً أَوِ ادِّعاءً .

(٤) اختبارُ تَنَبُّهِ السامِعِ أو مِقْدارِ تَنَبُّهِه .

(٥) خوفُ فَواتِ فُرْصَةٍ .

(٦) عَدَمُ الرغبةِ فى بَسْطِ الكلامِ لِتَوَجُّعٍ أو نحوِه .

(٧) التعظيمُ أو التحقيرُ (كأنك تريد أن تصونَه عن لسانِك أو أن تصونَ لِسانَك عنه) .

(٨) المحافظة على وزنٍ أو قافيةٍ أو سَجْعٍ .

(٩) التعميمُ معَ الاختصارِ .

(١٠) رِعايةُ الأدبِ .

(١١) تنزيلُ المُتَعَدِّي مَنْزِلَةَ اللازمِ .

(١٢) قصدُ الإيجازِ فَقَطْ

(١٣) البيانُ بعدَ الإبهامِ لتقريرِ المعنٰى فى النفسِ .

الباب الثالث

التقديم و التاخير

এটা তো সবারই জানা কথা যে, একটি জুমলা বা কালাম বিভিন্ন অংশ বা শব্দ দ্বারা গঠিত হয়। আর এটাও জানা কথা যে, কালামের সব ক'টি অংশ বা শব্দ একত্রে একই সংগে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই বাক্যস্থ শব্দগুলোর উচ্চারণের ক্ষেত্রে অগ্রপশ্চাত করতেই হবে। আর যেহেতু সকল শব্দ নিছক শব্দ হিসাবে সমমর্যাদার অধিকারী, সেহেতু বাক্যস্থ কোন শব্দই উচ্চারণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের দাবীদার হতে পারে না। বরং কোন শব্দকে অন্যান্য শব্দের অগ্রে উচ্চারণ করতে হলে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে হবে। বালাগাতের পরিভাষায় এগুলোকে دواعي التقديم (অগ্রবর্তীকরণের কারণসমূহ) বলে। এখানে আমরা কতিপয় دواعي التقديم আলোচনা করবো।

১। নীচের কবিতা পংক্তিটি দেখো–

ثَلاثَةٌ تُشْـرِقُ الدنيا بِبَهْجَتِها + شـمسُ الضُّحا و ابو إسـحقَ و القَمَرُ

তিনটি বস্তু তার আলোকোজ্জ্বলতা দ্বারা পৃথিবীকে উদ্ভাসিত করে রাখে। প্রভাত, আবু ইসহাক ও (পূর্ণিমার) চাঁদ।

দেখো, এখানে ثلاثة শব্দটি হচ্ছে مسند إليه আর তার সাথে একটি অভাবনীয় ও কৌতুহলোদ্দীপক গুণ বা ছিফাত যুক্ত করা হয়েছে, যা শ্রোতাচিত্তকে পরবর্তী খবরটি জানার প্রতি আগ্রহী ও কৌতুহলী করে তোলে। গুণ বা ছিফাতটি হলো تشرق الدنيا ببهجتها

বলাবাহুল্য যে, পৃথিবীকে আপন আলোতে উদ্ভাসিত করা এমন একটি আশ্চর্য গুণ যে, ঐ গুণের অধিকারী তিনটি জিনিস কি কি তা জানার জন্য শ্রোতাচিত্ত স্বাভাবিকভাবেই কৌতুহলী হবে এবং অজান্তেই শ্রোতাচিত্তে এ প্রশ্ন

জাগ্রত হবে–

ما هِيَ الأشياءُ الثلاثةُ التي تُشرق الدنيا بِبَهْجتِها

এই কৌতুহল ও প্রশ্নের উত্তরেই যেন পরবর্তী অংশটি বলা হলো। ফলে পরবর্তী খবরটি কৌতুহলী চিত্তে গভীরভাবে রেখাপাত করবে এবং বদ্ধমূল হবে। তবে আশা করি, তুমি এটা অবশ্যই বুঝতে পেরেছো যে, مسند إليه এর সংগে একটি কৌতুহল সৃষ্টিকারী গুণ যুক্ত হওয়ার কারণেই পরবর্তী খবরের প্রতি শ্রোতাচিত্ত আকৃষ্ট হয়েছে। এ কারণেই ছিফাতযুক্ত مسند إليه কে এখানে অগ্রবর্তী করা হয়েছে।

বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলে– التَّشْوِيقُ إلى المُتَأَخِّر

নিম্নোক্ত কবিতা সম্পর্কেও একই কথা–

وَ الَّذِي حارَتِ البَرِيَّةُ فيه + حَيَوانٌ مُسْتَحْدَثٌ مِنْ جَمادِ

সৃষ্টিজগত যে বিষয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেছে তা হলো জড়বস্তু (মৃত্তিকা) হতে প্রাণীর (মানুষের) সৃষ্টি।

এখানে الذى এর صلة অর্থাৎ حارت البرية একটি কৌতুহল সৃষ্টিকারী বিষয়। এটা শোনার সাথে সাথেই শ্রোতাচিত্তে প্রশ্ন জাগে–

ما هٰذا الذى حَارَتِ البَرِيَّةُ فيه؟

এই প্রশ্ন ও কৌতুহল নিবারণের জন্যই যেন পরবর্তী খবর বলা হয়েছে। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই শ্রোতার অন্তরে পরবর্তী খবরটি রেখাপাত করবে।

إنَّ أكرمَكم عِندَ اللهِ أَتْقاكم – আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাবান হওয়া নিশ্চয় একটি আগ্রহ সৃষ্টিকারী বিষয়। সুতরাং শ্রোতাচিত্ত কৌতুহলী হয়ে জানতে চাইবে مَنْ أكرَمُ عندَ اللهِ؟ – এই অনুক্ত প্রশ্নের উত্তরে যখন পরবর্তী খবর أتقاكم উচ্চারিত হবে তখন শ্রোতাচিত্তে তা গভীর রেখাপাত করবে।

আশা করি তিন তিনটি উদাহরণের ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিষয়টি তুমি সম্যক হৃদয়ংগম করতে পেরেছো।

২. কোন অংশকে উচ্চারণে অগ্রবর্তী করার আরেকটি কারণ হলো আনন্দের কিংবা নিরানন্দের বিষয়টি তাড়াতাড়ি শ্রোতার গোচরীভূত করা। যেমন–

الجائِزَةُ الأُوْلٰى فى المُسَابَقَةِ كانتْ من نَصيبى – العفوُ عنك صدرَ به الأَمْرُ

এখানে স্বাভাবিক নিয়মে

كانتِ الجائزةُ الأولى في المسابَقَةِ من نصيبي - صَدر الأمرُ بالعفوِ عنك

হওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু আনন্দদায়ক অংশটি প্রথমে শ্রোতার কর্ণগোচর করার জন্য الجائزة এবং العفو অংশটিকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে القصاصُ حكمَ به القاضي বাক্যে القصاص অংশটিকে অগ্রবর্তী করার উদ্দেশ্য হচ্ছে নিরানন্দের বিষয়টি শ্রোতার কানে আগেভাগে তুলে দেয়া। বাক্যটির স্বাভাবিক রূপ ছিল এই– حكم القاضي بالقصَاصِ

৩. তুমি যদি কোন বিষয়ে বিস্ময় বা অসন্তোষ প্রকাশ করতে চাও তাহলে যে অংশটি বিস্ময়ের বা অসন্তোষের ক্ষেত্র উচ্চারণের বেলায় সেটিকে অগ্রবর্তী করাই হলো مقتضى الحال বা অবস্থার দাবী। যেমন–

أَ بَعْدَ طُولِ التَّجْرِبَةِ تنخَدِع بهذه الزَّخارفِ

এখানে الانخداع بالزخارف বিস্ময়ের বিষয় নয়, বিস্ময় এবং অসন্তোষের বিষয় হচ্ছে طول التجربة সত্ত্বেও চাকচিক্য দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া। তাই উক্ত অংশকে অগ্রে উচ্চারণ করা হয়েছে।

أ راغب أنتَ عن الٰهتي – এখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আব্বার 'বিস্ময় ও অসন্তোষ' – এর বিষয় হচ্ছে رغبة عن الأٰلِهَة – কেননা তার চিন্তায় উপাস্যদের প্রতি অনাগ্রহী হওয়াটা ছিল অকল্পনীয়। তাই خبر হওয়া সত্ত্বেও এ অংশকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে।

৪. কোন বক্তব্য পেশ করার ক্ষেত্রে প্রথমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের عام শব্দ ব্যবহার করা এবং অতঃপর উক্ত বিষয়ের خاص শব্দ ব্যবহার করাই হল নিয়ম। কেননা خاص শব্দের পর عام শব্দ ব্যবহার করা অর্থহীন হয়ে পড়ে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি সহজে বোঝা যেতে পারে। তুমি যদি বল, "আমি রাত্রে এশার সময় আসবো"। তাহলে কথাটা অর্থপূর্ণ হবে। কেননা, রাত্র হচ্ছে সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত বিস্তৃত عام ও ব্যাপক শব্দ। পক্ষান্তরে এশা হলো– خاص ও বিশিষ্ট শব্দ যা রাত্রের একটা বিশেষ অংশকে বোঝায়। সুতরাং রাত্র শব্দটি উল্লেখ করার পর 'এশার সময়' বলার দ্বারা مخاطب প্রথমে ব্যাপক সময় এবং পরে সেই ব্যাপক সময়ের বিশেষ সময় বুঝবে। কিন্তু তুমি যদি "এশার সময় রাত্রে

আসবো" বলো তাহলে 'রাত্রে' কথাটা অর্থহীন হয়ে যায়। কেননা, خاص লফযের মধ্যে عام লফযটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অর্থাৎ এশা দ্বারাই রাত্রের কথা বুঝে এসে গেছে। কেননা রাত্র ছাড়া এশা হতে পারে না। সুতরাং এশার সময় বলার পর রাত্রে বলাটা অর্থহীন হয়ে যায়। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলে– سلوك سبيل الترقي অর্থাৎ পর্যায়ক্রম রক্ষা করা বা ব্যাপক শব্দের পর বিশেষ শব্দ ব্যবহার করা।

আরেকটি উদাহরণ হলো–

هذا الكلام صحيح فصيح بليغ

কিন্তু তুমি যদি প্রথমেই فصيح بليغ বলে ফেলো তাহলে এরপর صحيح বলাটা নিরর্থক হবে। কেননা صحيح না হয়ে فصيح بليغ হতে পারে না। তদ্রূপ যদি كلام بليغ বলো, তাহলে এরপর صحيح বা فصيح কোনটাই বলার অবকাশ থাকে না। কেননা, صحيح ও فصيح না হয়ে بليغ হতে পারে না। সুতরাং কোন কালামকে بليغ বলা দ্বারা সেটাকে صحيح ও فصيح বলাও হয়ে যায়।

৫. এবার নীচের উদাহরণটি লক্ষ্য করো। لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ – এখানে سنة শব্দটিকে نوم এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে। বাস্তবেও আমরা দেখি যে, আগে তন্দ্রা আসে তারপর নিদ্রা আসে। সুতরাং বোঝা গেলো এখানে অস্তিত্বের ক্ষেত্রে যে ক্রমপর্যায় রয়েছে সেটা রক্ষা করার জন্য سنة শব্দটিকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে– مُراعَاةُ الترتيبِ الوُجودِيِّ বলা হয়।

৬. مَا أنا قلتُ هذا বাক্যটির মর্মার্থ হলো, এ কথাটি না বলা শুধু আমার সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ বিষয়টি যে কথিত হয়েছে সেটা প্রমাণিত সত্য। সেটা তুমি অস্বীকার করছ না, তুমি শুধু বলতে চাচ্ছো যে, এ কথাটার কথক আমি নই অন্য কেউ।

এ কারণেই ما أنا قلتُ هذا কথাটার পরে بل غَيْرِي قالَ কথাটা যোগ করা শুদ্ধ হবে। কিন্তু ما أنا قلتُ هذا و لا غَيرِي বলা শুদ্ধ হবে না। কেননা, বাক্যের প্রথমাংশে তুমি নিজের জন্য কথক না হওয়া এবং অন্যের জন্য কথক হওয়া সাব্যস্ত করেছো। সুতরাং و لا غيرى এই বক্তব্য স্ববিরোধী হয়ে যাবে।

বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে تخصيص বলে। অর্থাৎ حكم টিকে مقدم এর

সাথে বিশিষ্ট করে দেয়া। যেমন এখানে نفى القول কে أنا এর সংগে বিশিষ্ট করা হয়েছে।

এখানে تخصيص এর অর্থ সৃষ্টি হয়েছে। مسند إليه কে مقدم করার কারণে। তবে এ জন্য حرف النفى টি তার পূর্বে হওয়া শর্ত। পরে হলে تخصيص বোঝা যাবে না।

শ্রোতা যদি মনে করে যে, কাজটি তুমি করনি বরং অন্য কেউ করেছে, কিংবা তুমি একা করনি, অন্য কেউ তোমার সাথে শরীক ছিলো; অথচ কাজটি তুমিই করেছো এবং একাই করেছো তখন শ্রোতার এ ধারণা খণ্ডন করার জন্য مسند إليه কে مقدم করা হয়। যেমন– أنا سَعيتُ

শ্রোতার প্রথম ধারণাটি খণ্ডন করার জন্য বলতে পারো– أنا سعيتُ لا غيرى আর দ্বিতীয় ধারণাটি খণ্ডন করার জন্য বলতে পারো– أنا سعيت وَحْدِىْ

এখানেও مسند إليه কে مقدم করার উদ্দেশ্য হচ্ছে تخصيص

৭. تقديم এর আরেকটি কারণ হলো বাক্যস্থ حكم বা إسناد কে অর্থাৎ বাক্যের মূল বক্তব্যকে সুদৃঢ় করা এবং শ্রোতার অন্তরে সেটাকে বদ্ধমূল করে দেয়া।

যেমন একজন দানশীল ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি বলতে চাও যে, তিনি প্রচুর দান করেন। এ ক্ষেত্রে তুমি বলবে– يُعْطِيْ فُلانٌ الجزيلَ – কিন্তু তুমি যদি এর পরিবর্তে বলো فلانٌ يُعْطِى الجزيلَ তাহলে তোমার কথার উদ্দেশ্য হলো শ্রোতার অন্তরে অমুকের দান প্রাচুর্যের বিষয়টি বদ্ধমূল করে দেয়া। تخصيص এখানে তোমার উদ্দেশ্য নয়। অর্থাৎ তিনিই শুধু প্রচুর দান করেন, অন্য কেউ নয়– এ কথা বলা তোমার উদ্দেশ্য নয়। কেননা, বাক্যটিকে তুমি يعطي فلان الجزيل এর স্থলে বলেছ। (অবশ্য যদি স্বতন্ত্রভাবেই فلان يعطي الجزيل বলো তাহলে أنا سعيت এর মত এখানেও تخصيص হবে।

এখানে একবার فلان ও يعطي الجزيل এর মাঝে إسناد হয়েছে। দ্বিতীয়বার يعطى ও তার যমীরের মাঝে إسناد হয়েছে। এই تكرار الإسناد ই মূলতঃ বাক্যস্থ حكم বা মূল বক্তব্যকে দৃঢ় করেছে।

এ প্রসংগে বালাগাত শাস্ত্রের ইমাম আব্দুল কাহির জুরজানী একটি সুন্দর কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন–

কোন اسم কে عامل থেকে মুক্ত অবস্থায় তখনই শুধু উচ্চারণ করা হয় যখন তার দিকে কোন বক্তব্যকে إسناد করা উদ্দেশ্য হয়। উদাহরণ স্বরূপ তুমি যখন عبد الله বলবে তখন শ্রোতা বুঝে নিবে যে, তুমি আব্দুল্লাহ সম্পর্কে কিছু বলতে চাও। সুতরাং عبد الله শব্দের উচ্চারণের মাধ্যমে যেন তাঁর সম্পর্কে পরবর্তী যে বক্তব্য আসছে সেটার জন্য শ্রোতার অন্তরে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেছে। এরপর তুমি যখন قدم বলবে তখন তা শ্রোতার অন্তরে একটি প্রতিক্ষিত ও পরিচিত বিষয় রূপে প্রবেশ করবে।

বলাবাহুল্য যে, বিষয়টি শ্রোতার অন্তরে বদ্ধমূল হওয়ার জন্য এবং দ্বিধা-শংসয় বিদূরীত হওয়ার জন্য এ পন্থা অধিক কার্যকর। قدم عبد الله দ্বারা উক্ত উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়। কেননা পূর্বাভাস ছাড়া কোন বক্তব্য পেশ করা আর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে পেশ করা এক কথা নয়।

উপরের আলোচনার আলোকে তুমি নিম্নোক্ত আয়াতটি পর্যালোচনা করতে পারো।

وَ الَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكون

আশা করি খুব সহজেই বুঝতে পেরেছো যে, هم মুসনাদ ইলাইহিকে مقدم করার মাধ্যমে نفى الشرك কে জোরদার রূপে পেশ করা হয়েছে এবং শ্রোতার অন্তরেও বিষয়টি পরিচিত রূপে প্রবেশ করেছে। পক্ষান্তরে والذين لا يُشرِكون بربهم বলা হলে এ উদ্দেশ্য অর্জিত হত না।

মোটকথা, تقديم এর একটি উদ্দেশ্য হলো تَقوِيَةُ الحكمِ و تَقْرِيرُه

এখন আমরা تقديم এর আরেকটি কারণ তোমার সামনে তুলে ধরতে চাই। কিন্তু তার আগে নীচের দু'টি বাক্যের পার্থক্য বুঝতে চেষ্টা করো।

(١) كُلُّ تِلْميذٍ لم يَنْجَحْ في الامتحانِ . (٢) لم ينجَحْ كلُّ تلميذٍ في الامتحانِ .

প্রথম বাক্যের অর্থ হলো কোন ছাত্র পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়নি। অর্থাৎ نفى বা ‘নাবাচকতা’ এখানে تلميذ এর সকল সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলে- عُمُوْمُ السَّلْبِ (বা নাবাচকতার ব্যাপকায়ন)।

দেখো, এখানে أداةُ العُموم (বা ব্যাপকতাবাচক শব্দ) كل কে أداة النفي এর উপর অগ্রবর্তী করা হয়েছে। তাহলে বোঝা গেলো أداة العموم কে أَدَاةُ النَّفْيِ

-এর উপর অগ্রবর্তী করলে عموم السلب সাব্যস্ত হয়।

দ্বিতীয় বাক্যটির অর্থ হলো, সকল ছাত্র কৃতকার্য হয়নি। অর্থাৎ এখানে نفى মূল ফেয়েলের সংগে যুক্ত হয়নি। বরং عموم বা 'সমগ্রত্ব'-এর সংগে যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ 'সমগ্র' থেকে نجاح ফেয়েলকে نفي করা হয়েছে। প্রতিটি فرد থেকে نفي করা হয়নি। সুতরাং কিছু ছাত্র সফল হয়নি– এ অর্থ যেমন হতে পারে, তেমনি প্রতিটি ছাত্র সফল হয়নি-এ অর্থও হতে পারে।

বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় سَلْبُ العُمومِ (বা সমগ্রত্বকে নাকচকরণ।)

দেখো, এখানে أداة النفي কে أداة العموم -এর উপর অগ্রবর্তী করা হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেলো যে, أداة النفى কে أداة العموم এর উপর অগ্রবর্তী করা হলে سلب العموم সাব্যস্ত হয়।

মোটকথা, عموم السلب উদ্দেশ্য হলে أداة العموم কে أداة النفي -এর উপর অগ্রবর্তী করতে হবে। পক্ষান্তরে سلب العموم উদ্দেশ্য হলে أداة النفي কে أداة العموم -এর উপর অগ্রবর্তী করতে হবে।

দেখো, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে একবার ছাহাবা কেরাম নামায পড়ছিলেন। নামায শেষে যুল ইদায়ন নামে পরিচিত এক ছাহাবী দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন, أَقُصِرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ يا رَسولَ اللهِ ! – তাঁর ধারণা মতে নামাযের রাকাত কম হয়েছিলো। উত্তরে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– كلُّ ذٰلِكَ لم يَكُنْ

এখানে أداةُ العمومِ কে أداةُ النفي -এর উপর অগ্রবর্তী করা হয়েছে যা عمومُ السَّلْبِ সাব্যস্ত করে। সুতরাং বক্তব্যটির অর্থ হলো, নামায সংক্ষিপ্ত হওয়া এবং বিস্মৃত হওয়া কোনটাই ঘটেনি। অর্থাৎ نفي (বা নাবাচকতা) এখানে উভয় বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

পক্ষান্তরে যদি لم يَكُنْ كلُّ ذٰلك বলা হতো তাহলে অর্থ হতো, তার 'সর্বটুকু' ঘটেনি। এখন এর মতলব দু'টো হতে পারে– (ক) দু'টোর একটা ঘটেছে। (খ) দু'টোর একটাও ঘটেনি। (উভয় ক্ষেত্রেই সর্বটুকু না ঘটা সাব্যস্ত হচ্ছে।)

তবে এ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কিছু অংশ থেকে নফী করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন–

لَيسَ كلُّ إنْسانٍ كاتِبًا

এখানে إنسان এর কিছু সদস্য হতে كتابة এর গুণ নফী করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সকল মানুষ লেখক নয়; বরং কিছু মানুষ লেখক এবং কিছু মানুষ অলেখক।

মুতানাব্বীর নিম্নোক্ত কবিতাটিও উদাহরণ হিসাবে পেশ করা যেতে পারে।

مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّى المَرْءُ يُدْرِكُـه + تَأْتِي الرِّيَاحُ بِمَا لا تَشْتَهِي السُّفُنُ

মানুষ যা আকাঙ্ক্ষা করে তার 'সমগ্র' সে লাভ করে না; বরং কিছু লাভ করে, আর কিছু হাতছাড়া হয়। ঝড় এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যা জাহাজের কাম্য নয়।

অবশ্য سلب العموم এর ক্ষেত্রে كل এর مضاف إليه এর প্রতিটি فرد কে নফী করাও কদাচিত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। যেমন–

إِنَّ اللّٰهَ لا يُحِبُّ كلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক কোন দাম্ভিক গর্বকারীকে পছন্দ করেন না।

৯. فعل এর বিভিন্ন متعلق রয়েছে। যথা ظرف، حال، مفعول به، جار و مجرور ইত্যাদি। স্বাভাবিক তারতীব বা বিন্যাস হিসাবে এগুলোর স্থান فعل -এর পরে। তবে প্রধানতঃ تخصيص বা বিশিষ্টতা বোঝানোর জন্য فعل -এর متعلق কে ফেয়েলের উপর অগ্রবর্তী করা হয়। যেমন– إياك نعبد অর্থাৎ আপনারই ইবাদত করি, অন্য কারো ইবাদত করি না। نعبدك বলা হলে এই বিশিষ্টতা বোঝা যেত না। فَدَلَّ تقديمُ المفعولِ على اخْتِصَاصِ المفعولِ بِالْفِعْلِ –

بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَ كُنْ مِنَ الشّاكِرِينَ আয়াতটি সম্পর্কেও একই কথা।

তদ্রূপ وَ إِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الأُمورُ আয়াতটি দেখো, إلى الله অংশটিকে فعل এর উপর অগ্রবর্তী করার কারণে এ কথা বোঝা যায় যে, সকল কিছুর প্রত্যাবর্তন আল্লাহরই দিকে হবে, অন্য কারো দিকে নয়। পক্ষান্তরে ترجع الأمور إلى الله বলা হলে এই اختصاص সাব্যস্ত হত না।

১০. কোরআন শরীফে এ ধরনের تقديم -এর প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। জুমলার কোন অংশকে অগ্রবর্তী করার আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে وزن الشعر (পদ্য-ছন্দ) ও سجع (গদ্য-ছন্দ) রক্ষা করা। যেমন–

إذا نَطَقَ السفيهُ فلا تُجِبه + فَخَيرٌ من إجابتِهِ السُّكوتُ

এখানে خير শব্দটি হলো مسند – সুতরাং স্বাভাবিক বিন্যাসে এটার স্থান ছিল مسند إليه -এর পরে। কিন্তু পদ্য-ছন্দ রক্ষার জন্য এটাকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে।

তদ্রূপ خُذوه فَغُلوه ثم الجحيمَ صَلُّوه

এখানে স্বাভাবিক বিন্যাস অনুসারে مفعول به হিসাবে الجحيم শব্দটির অবস্থান ছিল صلوه ফেয়েলের পরে। কিন্তু গদ্য-ছন্দ রক্ষার জন্য مفعول কে অগ্রবর্তী করা হয়েছে। কেননা সাধারণ সাহিত্য রুচিসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, আয়াতের এই বিন্যাসটি নিম্নোক্ত বিন্যাস হতে অধিকতর শ্রুতিমধুর।

خذوه فغلوه ثم صلوه الجحيمَ *

একটা বিষয় তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ যে, পূর্ববর্তী অধ্যায়ের ذكر এর যেমন বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তেমনি حذف এরও বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান অধ্যায়ে শুধু تقديم এর বিভিন্ন কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, تأخير -এর আলাদা কোন কারণ উল্লেখ করা হয়নি। কেননা, একটি শব্দকে অগ্রবর্তী করার কারণগুলো মূলতঃ অন্য শব্দকে পশ্চাদবর্তী করারও কারণ। কেননা একটি শব্দ অগ্রবর্তী হলে অনিবার্যভাবেই অন্য শব্দটি পশ্চাদবর্তী হবে। অর্থাৎ দু'টি শব্দের অগ্রবর্তিতা ও পশ্চাদবর্তিতার মাঝে تلازم বা পারস্পরিক অনিবার্যতার সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং تقديم ও تأخير উভয়ের জন্য আলাদা কারণ বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই।

تقديم -এর আরো কিছু কারণ রয়েছে। এখানে সে সম্পর্কেও কিঞ্চিত আলোচনা করতে চাই।

নীচের আয়াতটি দেখো–

إيَّاك نَعْبد و إياكَ نَسْتَعِين

এখানে إياك نعبد অংশটিকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে। কেননা সাহায্য প্রার্থনা মঞ্জুর হওয়ার জন্য ইবাদত বন্দেগীই হলো সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলে– تقديمُ السبَبِ عَلَى المُسَبَّبِ

এখানে যদি إياك نستعين و إياك نُعْبُد বলা হতো তাহলে তা সিদ্ধ হতো

অবশ্যই, কিন্তু সূক্ষ্ম রুচিবোধের বিচারে তা পূর্ণ মানোত্তীর্ণ হতো না।

নীচের আয়াতটি সম্পর্কেও একই কথা।

وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوْرًا، لِنُحْيِيَ بِه بَلْدَةً مَيْتًا وَ نُسْقِيَه مما خَلَقْنا انعامًا و أناسِيَّ كثيرًا *

আকাশ হতে আমরা পবিত্র পানি বর্ষিত করেছি, যেন তা দ্বারা মৃত ভূমিকে সজীব করি এবং আমার সৃষ্টি হতে পশুবর্গকে এবং বহু মানুষকে পান করাই।

দেখো, এখানে পশুবর্গ ও মানুষদের পান করানোর উপর ভূমি সজীবকরণ প্রসংগকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে। অথচ উভয়ই ভূমির তুলনায় অধিকতর মর্যাদার অধিকারী। কেননা ভূমির সজীবতা হলো পশুবর্গ ও মানুষের 'জীবন' লাভের উৎস বা কারণ। তদ্রূপ পশুবর্গের জীবন যেহেতু মানুষের জীবন ও জীবিকার উৎস বা কারণ সেহেতু মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হওয়া সত্ত্বেও উচ্চারণের ক্ষেত্রে পশুবর্গকে অগ্রবর্তী করা হয়েছে।

এবার নীচের আয়াতটি দেখো–

ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنا، فَمِنْهم ظَالِمٌ لِنَفْسِه، و منهم مُقْتَصِدٌ و منهم سَابِقٌ بالخيراتِ *

এখানে আল্লাহর বান্দাদের তিনটি শ্রেণীর কথা আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ নিজেদের প্রতি অবিচারকারী জালিম শ্রেণী এবং সংখ্যায় এরাই অধিক। দ্বিতীয়তঃ মধ্যপন্থী, এরা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম। তৃতীয়তঃ যারা কল্যাণকর্মে অগ্রগামী, এরা সংখ্যায় দ্বিতীয় শ্রেণী থেকেও কম। বলাবাহুল্য যে, এখানে অগ্রবর্তী করার ক্ষেত্রে সংখ্যানুপাতের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে تقديم الأكثر على الأقل বলে। অবশ্য এখানে বিপরীত দিক থেকেও শ্রেণী বিন্যাস হতে পারতো এবং সেটাও যুক্তিযুক্ত হতো। অর্থাৎ মর্যাদাগত বিবেচনায় অগ্রবর্তী করা। যেমন–

فمنهم سابق بالخيرات و منهم مقتصد و منهم ظالم لنفسه

কিন্তু তখন শ্রুতিক্ষেত্রে মারাত্মক ছন্দপতন ঘটতো।

خلاصة الكلام

لا يُمكِنُ النُّطقُ بِأَجْزاءِ الكلامِ دَفْعَةً واحدةً، فَلا بُدَّ من تقديمِ بعضِ الأَجْزاءِ و تأخيرِ البعضِ و لكنْ لا يحسُن تقديمُ البعضِ على البعضِ إلاَّ لِداعٍ مِنَ الدَّواعِي البَلاغِيَّةِ .

و تلك هي :

(١) التشويقُ (يَعْنِيْ أَنَّ المقدَّمَ يَتَضَمَّنُ أَمْراً غريبًا يُشَوِّقُ النَّفْسَ إلى المُتَأَخِّر) .

(٢) تَعْجِيلُ المَسَرَّةِ أَوِ المَساءَةِ .

(٣) الإنكار أَوِ التعجُّبُ (و ذلك إذا كانَ المتقدِّم يدعو إلى الإنكارِ أو التعجُّبِ) .

(٤) سلوكُ سبيلِ الترقِّيْ (أي ذكرُ العامِّ أَوَّلاً ثم الخاصِّ بعدَه، لِأَنَّ العامَّ إذا ذُكِرَ بعدَ الخاصِّ لا يكون به فائدةٌ .)

(٥) مُراعاةُ الترتيبِ الوجوديِّ .

(٦) إِرادَةُ عمومِ السَّلْبِ أَوْ سَلْبِ العُمومِ (وَ عمومُ السَّلْبِ يكون بِتَقْديمِ أداةِ العُمومِ علي أداةِ النفيِ و سلبُ العُمومِ يكون بِتَقديمِ أداة النفي على أداةِ العمومِ) (١) .

---

١ - و يكون فى عمومِ السلْبِ نفيُ الحكمِ عن كلِّ فردٍ مِنْ أَفرادِ ما يُضاف إليه أداةُ العمومِ و هى كلٌّ و جميع و نحوُهما .

و في سلبِ العموم لا يكون النفيُ عامًّا لِكلِ الأَفرادِ بل يُفيد ثُبوتَ الحكمِ لِبَعْضِ الأفراد و نَفْيَه عن البعضِ الآخرِ .

(٧) التخصيص [١] .

(٨) تَقويَةُ الحكمِ و تقريرُه (بِدُونِ تخصيصٍ إذا كان الخبرُ فعلًا) .

(٩) المُحافَظَة على وزنٍ أو سَجْعٍ .

(١٠) التَّلَذُّذُ بِذِكْرِ المُتَقَدِّمِ، نحوُ لَيْلٰى وَصَلَتْ .

(١١) الإشارةُ إلٰى أَنَّهُ حاضِرٌ فى التصوُّرِ لِكَوْنِه مطلوبًا .

---

[١] - يعنى أن تقديمَ المسندِ إليه يُفيد تخصيصَه بالخبرِ الفعليِّ، و لكنْ بِشَـرْطِ أن يكونَ مَسْبوقًا بحرفِ نَفْيٍ نحوُ ما أنا قلتُ هذا و تقديمُ المفعول و مُتَعلقات الفعلِ الأخرىَ تُفيد تَخْصيصَه بالفعلِ .

الباب الرابع

في التعريف و التنكير

এ অধ্যায়ে প্রথমে আমরা معرفة ও نكرة -এর পরিচয় ও প্রকার আলোচনা করবো। তারপর বালাগাতের দৃষ্টিকোণ থেকে معرفة ও نكرة ব্যবহার করার তাৎপর্য পর্যালোচনা করে দেখবো।

معرفة ও نكرة -এর একটা সাধারণ পরিচয় তো তুমি আগে থেকেই জানো। অর্থাৎ নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে معرفة বলে এবং অনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে نكرة বলে।

কিন্তু গবেষক আলিমগণ বলেন, معرفة ও نكرة উভয়ই নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত ব্যক্তি বা বস্তু বোঝায়। কেননা নির্দিষ্টতা ছাড়া কোন শব্দের অর্থ বোঝা সম্ভব নয়। মোটকথা, অর্থের নির্দিষ্টতা বোঝানোর ক্ষেত্রে معرفة ও نكرة দু'টোই সমান। তবে পার্থক্য এই যে, نكرة শব্দটি তার অর্থের সত্তাগত নির্দিষ্টতাই শুধু বোঝায়, কিন্তু مخاطَب বা শ্রোতার নিকটও তা পরিচিত ও নির্দিষ্ট এ কথা বোঝায় না। পক্ষান্তরে معرفة শব্দটি একটি নির্দিষ্ট সত্তা যেমন বোঝায় তেমনি শব্দগতভাবে এ কথাও প্রমাণ করে যে, উক্ত নির্দিষ্ট সত্তাটি শ্রোতার নিকটও পরিচিত।

মোটকথা নিছক নির্দিষ্ট সত্তা বোঝানোর ক্ষেত্রে معرفة ও نكرة অভিন্ন। পক্ষান্তরে শ্রোতার নিকট কোন সত্তাকে নির্দিষ্ট রূপে তুলে ধরা না ধরার ক্ষেত্রে معرفة ও نكرة এর মাঝে ভিন্নতা রয়েছে।

মোট সাত প্রকার اسم হলো معرفة পরিবারের সদস্য। তবে প্রতিটি معرفة এর নির্দিষ্টতাগুণ কিন্তু সমান নয়। অর্থাৎ প্রতিটি معرفة তার 'অর্থ সত্তাকে' শ্রোতার নিকট সমান রূপে পরিচিত ও নির্দিষ্ট করে না। যেমন ধরো, أنت، أنا ইত্যাদি শব্দগুলোর নির্দিষ্টতাগুণ সর্বাধিক। কেননা أنا শব্দ দ্বারা متكلم -এর

সত্তা ছাড়া আর কিছু বোঝার উপায় নেই। أنت، هو ইত্যাদি প্রতিটি যমীর সম্পর্কে একই কথা।

পক্ষান্তরে راشد, যদিও সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকেই বোঝায়, কিন্তু একই নামে একাধিক ব্যক্তি থাকার কারণে বিভ্রান্তির কিছুটা অবকাশ থেকেই যায়। তবে علم -এর নির্দিষ্টতাগুণ অন্যান্য معرفة -এর তুলনায় অধিক। কেননা علم -এর নির্দিষ্টতাগুণ তার নিজস্ব। অর্থাৎ শব্দটি নিজস্বভাবেই নির্দিষ্টতাগুণ প্রমাণ করে। পক্ষান্তরে اسم الإشارة -এর মাঝে নির্দিষ্টতাগুণ সৃষ্টি হয় ইশারা-এর মাধ্যমে। তদ্রূপ اسم الموصول -এর মাঝে সৃষ্টি হয় صلة -এর মাধ্যমে। المعرف بال -এর মাঝে সৃষ্টি হয় ال অব্যয় যোগে ইত্যাদি।

নির্দিষ্টতাগুণের মাত্রা হিসাবে সাত প্রকার معرفة -এর বিন্যাস এরূপ–

الأول : الضمير .

الثاني : العلم .

الثالث : اسم الإشارة .

الرابع : اسم الموصول .

الخامس : المحلى بال .

السادس : المضاف إلى أحد المعارف غير المنادى .

السابع : المنادى .

এ কথা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পেরেছো যে, যখন শ্রোতার পরিচিত কোন সত্তা সম্পর্কে حكم পেশ করা উদ্দেশ্য হবে তখন معرفة শব্দ ব্যবহার করতে হবে। পক্ষান্তরে শ্রোতার পরিচিত কোন সত্তা যদি উদ্দেশ্য না হয় তখন نكرة শব্দ ব্যবহার করত হবে।

তবে কখন কোন অবস্থায় কোন প্রকার معرفة শব্দ ব্যবহার করতে হবে এবং কোন প্রকার معرفة কি কি অর্থে ও উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে, সে সম্পর্কে বালাগাত আমাদেরকে পূর্ণ দিকনির্দেশনা দিয়েছে। এখানে আমরা সে সম্পর্কে আলোচনা করতে চাই।

তুমি জানো যে, ضمير বা সর্বনাম তিন প্রকার, যথা متكلم (উত্তম পুরুষ), مخاطب (মধ্যম পুরুষ), غائب (নাম পুরুষ)।

যখন উত্তম পুরুষ বা মধ্যম পুরুষ নির্ধারণ করে কথা বলা উদ্দেশ্য হবে তখন ضمير বা সর্বনাম ব্যবহার করতে হবে। কেননা সর্বনাম ছাড়া পুরুষ নির্ধারণের উপায় নেই। তাছাড়া আরেকটি বিষয় এই যে, সর্বনাম প্রয়োগের দ্বারা বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হয়। যেমন ধরো, তোমার শিক্ষক তোমাকে লক্ষ্য করে বললেন, أنا آمـرُكَ بـكـذا (আমি তোমাকে এ নির্দেশ দিচ্ছি।)

এখানে তিনি নিজেকে উত্তম পুরুষ রূপে তুলে ধরেছেন এবং একটি মাত্র শব্দ 'আমি' ব্যবহার করেছেন।

পক্ষান্তরে তিনি যদি বলেন, معلّمك يأمُرُكَ بـكـذا তোমার শিক্ষক তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন কিংবা এই লোকটি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন কিংবা যিনি তোমাকে শিক্ষা দান করেন তিনি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছেন; তাহলে এ ধরনের বাক্যগুলোতে মূল বক্তব্য তো বুঝে এসে যাবে, কিন্তু পুরুষ নির্ধারিত হবে না এবং বক্তব্যও সংক্ষিপ্ত হবে না। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, যখন পুরুষ নির্ধারণ এবং বক্তব্যের সংক্ষেপন উদ্দেশ্য হবে তখন সর্বনাম ব্যবহার করতে হবে। উদাহরণ দেখো, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সম্পর্কে বলেছেন–

أَنا النَّبِيُّ لا كَذِبْ أَنا ابْنُ عبدِ المطَّلِبْ

এটা হচ্ছে উত্তম পুরুষ রূপে সংক্ষেপে বক্তব্য পেশ করার ক্ষেত্র। কেননা এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে গর্ব ও শৌর্য প্রকাশ করা আর তা আমিত্ব দ্বারাই স্বতস্ফূর্ত হয়। তদ্রূপ সংক্ষেপন ছাড়া ছন্দ রক্ষা করা সম্ভব নয়।

আবার দেখো, আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলছেন–

اِذْهَبْ أنتَ و أخوك بِآيٰتِي

এটা মধ্যম পুরুষ ব্যবহারের ক্ষেত্র। কেননা সংক্ষেপে সম্বোধন করার উদ্দেশ্যটি অন্যভাবে অর্জিত হবে না, বরং বিনা প্রয়োজনে বাক্য সম্প্রসারণ ঘটবে, যা দোষণীয়।

خرجَ رسولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم من مكةَ و هاجرَ إلى المدينةِ

এখানে অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা উদ্দেশ্য। আবার সংক্ষিপ্ততাও উদ্দেশ্য। কেননা هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم বলা হলে পুনরুক্তি দোষ ঘটবে। সুতরাং বোঝা গেল যে, এটি নাম পুরুষ বা ضمير الغائب

ব্যবহারের ক্ষেত্র।

অবশ্য বিশেষ কোন উদ্দেশ্য যদি থাকে তখন যমীরের পরিবর্তে অন্যান্য প্রকার معرفة ব্যবহার করা হয়। যেমন তোমার শিক্ষক তোমাকে آمرك بكذا না বলে معلمك يأمرك بكذا বললেন এদিকে ইংগিত করার জন্য যে, তোমার উপর আমার শিক্ষকত্বের দাবী হলো আমার নির্দেশ মান্য করা। آمرك بكذا বাক্য দ্বারা কিন্তু এই ইংগিত প্রকাশ পেতো না।

আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে যে, ضمير الغائب বা নাম পুরুষের ক্ষেত্রে পূর্বেই সর্বনামের লক্ষ্যবস্তু বা مرجع উল্লেখিত হওয়া আবশ্যক। যেমন–

وَ اصْبِرْ حَتّٰى يَحْكُمَ اللّٰهُ بَيْنَنَا وَ هُوَ خَيْرُ الحاكِمِيْنَ *

এখানে هو এর مرجع শব্দগতভাবে উচ্চারিত রয়েছে। পক্ষান্তরে اِعْدِلُوا هو أَقْرَبُ আয়াতে هو -এর مرجع হচ্ছে العدل যা শব্দগতভাবে উচ্চারিত না থাকলেও اعدلوا -এর মাঝে অর্থগতভাবে প্রচ্ছন্ন রূপে বিদ্যমান রয়েছে।

পক্ষান্তরে فَلَهُنَّ ثُلُثَا ما تَرَكَ – আয়াতে ترك -এর هو যমীরের مرجع হলো الميت। তবে তা শব্দগতভাবেও পূর্বে উচ্চারিত হয়নি, আবার অর্থগতভাবেও পূর্ববর্তী কোন শব্দে প্রচ্ছন্ন নেই। তবে যেহেতু মিরাছের আলোচনা চলছে, সেহেতু অবস্থা ও পরিবেশ থেকে শব্দটি বোধগম্য হচ্ছে। অর্থাৎ কারীনার আলোকে এখানে مرجع বিদ্যমান হয়েছে। মোটকথা, ضمير الغائب -এর পূর্বে এই তিন প্রকারের কোন এক প্রকারে তার مرجع বিদ্যমান থাকতে হবে।

আমরা সাধাণতঃ এমন সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বোধন করেই কথা বলি, যে আমাদের সামনে রয়েছে এবং যে আমাদের কথা শুনতে পায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর নয় এবং আমাদের কথা শুনতে পায় না তাকে সম্বোধন করে আমরা কথা বলি না। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখেই বালাগাত বিশারদগণ বলেছেন, দৃষ্টিগোচর ও সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে ضمير الخطاب (বা মধ্যম পুরুষের সর্বনাম) ব্যবহার করাই হলো মূলনীতি।

তবে কখনো কখনো অদৃষ্টিগোচর সত্তাকে সম্বোধন করেও ضمير الخطاب ব্যবহার করা হয়। উদ্দেশ্য হলো এ কথা বোঝানো যে, সম্বোধিত সত্তা শারীরিকভাবে উপস্থিত ও দৃষ্টিগোচর না হলেও আমার অন্তরে সে সদা উপস্থিত রয়েছে এবং আমি যেন দিব্য চোখে তাকে দেখতে পাচ্ছি এবং সে আমার

সম্বোধন শুনতে পাচ্ছে। এভাবেই কবিরা তাদের কল্পনার মানুষকে সম্বোধন করে থাকেন আর আমরা আল্লাহকে না দেখেও সম্বোধনপূর্বক প্রার্থনা করি।

দেখো, সুদূর নো'মানুল আরাকের বাসিন্দাদের সম্বোধন করে কবি ইবনে মাজাহ্ উন্দুলসী বলছেন–

أَ سُكَّانَ نُعْمَانِ الأَرَاكِ تَيَقَّنُوا + بِأَنَّكُمُ في رَبْعِ قَلْبِي سُكَّانُ

তদ্রূপ আল্লাহকে সম্বোধন করে আমরা বলি–

اِيَّاكَ نعبدُ و إِيَّاكَ نَسْتَعِين

এ দু'টো উদাহরণে সম্বোধিত সত্তা দৃষ্টিগোচর না হলেও নির্দিষ্ট ও পরিচিত। কিন্তু কখনো কখনো এমনও হয় যে, সম্বোধিত সত্তা দৃষ্টিগোচরও নয় আবার নির্দিষ্ট ও পরিচিতও নয়; বরং 'সম্বোধন-পাত্র' হতে পারে এমন সকল ব্যক্তির জন্যই সম্বোধনকে অবাধ করা হয়।

সাধারণতঃ নীতিকথা ও উপদেশবাণীর ক্ষেত্রে এই অবাধ সম্বোধন ব্যবহার করা হয়। কবি মুতানাব্বীর কবিতা দেখো–

إذا أنتَ أكرمْتَ الكريمَ ملَكْتَه + و إنْ أنتَ أكرمْتَ اللَّئِيْمَ تَمَرَّدَ

কোন ভদ্রজনকে যদি ইকরাম করো তবে তাকে যেন তুমি খরিদ করে ফেললে আর যদি কোন ইতরজনকে ইকরাম করো তাহলে সে আরো স্পর্ধা দেখাবে।

অবাধ সম্বোধন ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো এ কথা বুঝানো যে, বিষয়টি কোন ব্যক্তিবিশেষের সাথে বিশিষ্ট নয়, বরং দেশকালের উর্ধ্বে সকলের ক্ষেত্রেই এটা সমান সত্য।

কোরআনুল কারীমে تعميم الخطاب বা অবাধ সম্বোধনের বহু উদাহরণ রয়েছে। একটি উদাহরণ দেখো–

وَ لو تَرَى إِذِ المجرمون نَاكِسُوا رُؤُوْسِهِم عندَ ربِّهم، ربَّنا أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صالحًا إِنَّا مُوقِنُون *

(সেই দৃশ্য) যদি তুমি দেখতে যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে অবনত মস্তকে দাঁড়াবে, (আর বলবে) হে আমাদের প্রতিপালক! (আজ কেয়ামতের মাঠে) আমরা (সব) দেখতে পেয়েছি এবং শুনতে পেয়েছি। সুতরাং

আমাদেরকে (পৃথিবীতে) ফেরত পাঠিয়ে দিন, আমরা নেক আমল করবো। আমরা এখন বিশ্বাস করছি।

এখানে 'তুমি' অর্থ হে এমন প্রতিটি ব্যক্তি যার দৃষ্টিশক্তি রয়েছে, যে দেশের এবং যে সময়েরই মানুষ হওনা কেন তুমি।

তদ্রূপ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ দেখো–

بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ في الظُّلَمِ إلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يومَ القِيَامَةِ ·

অন্ধকারে (প্রতিকূল পরিবেশে) মসজিদে গমনকারীদেরকে তুমি কেয়ামতের দিন পরিপূর্ণ 'নূর' লাভের সুসংবাদ দান কর।

এখানে সুনির্দিষ্ট একজনকে সম্বোধন করে সুসংবাদ প্রদানের আদেশ করা হয়নি। বরং যুগ পরম্পরায় সম্বোধনযোগ্য প্রত্যেক ব্যক্তি এ সম্বোধনের পাত্র।

خلاصة الكلام

كلٌّ مِنَ المَعْرِفَةِ و النَّكِرَةِ يَدُلُّ على مُعَيَّنٍ، وَ إِلَّا امْتَنَعَ الفَهْمُ، إِلَّا أَنَّ ذاتَ النكرةِ لا يكون معلومًا للسامِعِ و ذاتَ المعرفةِ يكون معلومًا له ·

فإن كان المُسَمَّى معلومًا عِندَ السامعِ أتيتَ به مُعَرَّفًا و إلا فَمُنَكَّرا ·

وَ المَعَارِفُ سبعةُ أقسامٍ، و تَرتيبُها بِحَسَبِ الأَعْرَفِيَّةِ كما يَلِيْ :

(١) الضمير (٢) العلم (٣) اسم الإشارة (٤) اسم الموصول (٥) المحلى بال (٦) المضاف إلى أحدٍ منَ المذكورِ (٧) المنادى (أى النكرةُ المقصودةُ في النداءِ) ·

إذا أرادَ المتكلمُ أَنْ يُحَدِّثَ عن نفسِه أو يُخاطِبَ سامِعَه أو يَتَحدَّثَ عن غائبٍ و أرادَ الاختصارَ في ذُلك أَتَى بضميرِ التكلُّمِ أو الخِطَابِ أو الغَيْبَةِ ·

و الأصلُ فى الخطابِ أن يكونَ لِمُشاهَدٍ مُعَيَّنٍ ·

و قد يُخاطَبُ غَيْرُ المشاهَدِ لِاسْتِحضاره في القَلْبِ كمَا يُخاطَبُ غَيْرُ المعَيَّنِ لِتَعْميمِ الخطاب (أي لِيَعُمَّ الخِطابُ كلَّ مَنْ يَصْلُح أن يكونَ مخاطَبًا) ·

و في ضميرِ الغَيْبَةِ لا بُدَّ أن يَتَقدَّمَ ذِكْرُه لَفْظًا أو مَعْنًى أو دلالَةً ·

العلم

মনে করো, রাশেদ তোমার বন্ধু। তার সম্পর্কে তুমি مخاطب কে কিছু বলতে চাও। আর مخاطب তোমাদের বন্ধুত্ব সম্পর্কে এবং তার নাম সম্পর্কে অবগত রয়েছে। আবার মনে করো, তোমার বন্ধুকে দূরে দেখা যাচ্ছে। আবার মনে করো, গতকাল রাশেদ مخاطب -এর সংগে কথা বলেছে; এমতাবস্থায় রাশেদের ব্যক্তি সত্তাকে مخاطب এর চিন্তায় পরিচিত রূপে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন প্রকার معرفة ব্যবহার করতে পারো। যেমন– صديقي ولدٌ شريف – যেহেতু তোমাদের বন্ধুত্বের কথা مخاطب -এর জানা রয়েছে সেহেতু صديقي শব্দ শোনামাত্র তার চিন্তায় রাশেদ নামক ব্যক্তির ছবি ভেসে উঠবে। এখানে إضافة -এর মাধ্যমে مخاطب -এর সম্মুখে রাশেদ নামক ব্যক্তির পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু صديق শব্দটি রাশেদ নামক ব্যক্তির জন্য বিশিষ্ট নয়। কেননা এমন যে কোন ব্যক্তিকে صديق বলা চলে যার সংগে বন্ধুত্ব রয়েছে।

তদ্রূপ দূর থেকে ইশারা করে তুমি বলতে পারো, ذلك الولد شريف – এখানে اسم الإشارة -এর মাধ্যমে ব্যক্তিটিকে مخاطب -এর চিন্তায় উপস্থিত করা হয়েছে। তবে এটা রাশেদের জন্য বিশিষ্ট শব্দ নয়। কেননা, দূরবর্তী যে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে।

তদ্রূপ اسم الموصول ব্যবহার করে তুমি বলতে পারো–

الذي تَكَلَّمَ مَعَكَ بِالْأَمْسِ شريفٌ .

এখানে তুমি اسم الموصول -এর মাধ্যমে مخاطب এর চিন্তায় ব্যক্তিটিকে উপস্থিত করেছো। কিন্তু এটিও রাশেদ নামক ব্যক্তির জন্য বিশিষ্ট শব্দ নয়। কেননা অন্য যে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য এটাকে ব্যবহার করা যায়।

আবার তুমি সরাসরি علم ব্যবহার করেও বলতে পারো– راشد ولد شريف – এখানে তুমি علم ব্যবহার করে مخاطب এর চিন্তায় রাশেদকে উপস্থিত করেছো। আর এটা তার জন্য বিশিষ্ট শব্দ। কেননা অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য এটা ব্যবহৃত হতে পারে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে একটি ব্যক্তিকে مخاطب -এর চিন্তায় পরিচিত রূপে উপস্থিত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার معرفة ব্যবহার করা যায়। তন্মধ্যে علم ই হলো ব্যক্তি বা বস্তুর বিশিষ্ট শব্দ। পক্ষান্তরে অন্যান্য معرفة দ্বারাও ব্যক্তি বা

Free @ www.al-ilm.weebly.com

বস্তুকে مخاطب -এর নিচন্তায় পরিচিত রূপে তুলে ধরা যায় বটে। কিন্তু সেগুলো ব্যক্তি বা বস্তুর বিশিষ্ট শব্দ নয়। কেননা সেগুলোকে অন্য যে কোন ব্যক্তি বা বস্তুর জন্য ব্যবহার করা যায়।

সুতরাং তুমি যদি কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিশিষ্ট শব্দ দ্বারা مخاطب -এর চিন্তায় তুলে ধরতে চাও তাহলে তোমাকে উক্ত ব্যক্তি বা বস্তুর علم ব্যবহার করতে হবে। উদাহরণ হিসাবে নীচের আয়াতটি দেখো–

وَ إِذْ يَرْفَعُ إبراهيمُ القَواعِدَ مِنَ البَيْتِ وَ إسماعيلُ

দেখো, যে দু'জন মহান ব্যক্তির সত্তাকে আল্লাহ তা'আলা مخاطب -এর চিন্তায় পরিচিত রূপে তুলে ধরতে চেয়েছেন, তাঁদেরকে অন্যান্য প্রকার معرفة ব্যবহার করেও مخاطب -এর চিন্তায় উপস্থিত করা যেতো। যেমন–

و إذ يرفعُ الذي نَجَّاه اللّٰهُ مِنَ النارِ القواعِدَ من البَيْتِ وَ وَلَدُه

কিন্তু الذي শব্দটি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্য বিশিষ্ট নয়। পরবর্তী صلة -এর কারণে আমরা الذي দ্বারা ইবরাহীম (আঃ)-কে বুঝতে পেরেছি। তদ্রূপ ولد শব্দটি হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর জন্য বিশিষ্ট নয়। বরং ইবরাহীম (আঃ)-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত ضمير -এর দিকে إضافة হওয়ার কারণে আমরা ولد দ্বারা তাঁকে বুঝতে পেরেছি।

যেহেতু আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য হলো উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে তাঁদের জন্য বিশিষ্ট শব্দ দ্বারা مخاطب -এর চিন্তায় উপস্থিত করা সেহেতু তিনি অন্য কোন প্রকার معرفة ব্যবহার না করে علم ব্যবহার করেছেন।

মোটকথা, علم ব্যবহার করার মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যক্তি বা বস্তুকে তার বিশিষ্ট শব্দ দ্বারা مخاطب -এর চিন্তায় উপস্থিত করা। তবে এই মূল উদ্দেশ্যের সংগে সংগে আরো কিছু উদ্দেশ্য متكلم -এর চিন্তায় বিদ্যমান থাকে। বালাগাত বিশারদগণ সেগুলো চিহ্নিত করেছেন। এখানে আমরা সংক্ষেপে সেগুলো আলোচনা করছি।

১. আলোচ্য ব্যক্তির প্রতি মর্যাদা প্রকাশ করা।

এটা সাধারণতঃ মর্যাদা ও প্রশংসাজ্ঞাপক উপাধি এবং বিখ্যাত ব্যক্তিগণের নামের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন– سيف الدولة، سيف الله، ذو النورين ইত্যাদি। তদ্রূপ محمد بن عبد الله، عمر بن الخطاب، خالد بن الوليد ইত্যাদি।

২. আলোচ্য ব্যক্তির প্রতি অমর্যাদা প্রকাশ করা।

এটা সাধারণতঃ অমর্যাদা ও নিন্দাজ্ঞাপক নামের ক্ষেত্রে এবং কুখ্যাত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন– صخر، دجال، حمار

৩. আশা করি তুমি জানো যে, প্রতিটি নামের একটি নিজস্ব আভিধানিক অর্থ রয়েছে। কিন্তু যখন কোন ব্যক্তি বা বস্তুর নাম হিসাবে শব্দটির ব্যবহার শুরু হয় তখন সেই আভিধানিক অর্থটি আর বিবেচনায় থাকে না। তাই আমরা দেখতে পাই, কালো ছেলেরও নাম হয় জামীল এবং ভীতু মানুষেরও নাম হয় أسد –

তবে متكلم কখনো কখনো নাম ব্যবহার করে নামপূর্ব আভিধানিক অর্থের দিকে সূক্ষ্মভাবে ইংগিত করে থাকেন এবং শ্রোতাকে এ কথা বোঝাতে চান যে, আলোচ্য ব্যক্তির চরিত্রে তার নামের অর্থগত প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। যেমন তুমি محمود শব্দটির উপর বিশেষ জোর দিয়ে বললে–

جاءَنا محمودٌ بالبَشَائِرِ

– এখানে তুমি শ্রোতাকে বোঝাতে চেয়েছো যে, লোকটির চরিত্রে মাহমুদ নামের প্রতিফলন ঘটেছে। তার নাম যেমন মাহমুদ তেমনি সে বহু প্রশংসিত গুণের অধিকারী

কোরআনের একটি উদাহরণ দেখো, تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ – এখানে আবু লাহাব নামটি ব্যবহার করার মূল উদ্দেশ্য তো হচ্ছে আলোচ্য ব্যক্তিকে তার জন্য বিশিষ্ট শব্দটি দ্বারা শ্রোতার চিন্তায় উপস্থিত করা। তবে সেই সংগে এদিকে সূক্ষ্মভাবে ইংগিত করাও উদ্দেশ্য যে, লোকটির নামে যেমন আগুনের অর্থ রয়েছে, তেমনি সে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

আমাদের দেশে যেমন কোন মেয়ের নাম হলো 'হাসি' আর তাকে বলা হলো হাসি, একটু হাসো দেখি! এখানে মূলতঃ 'হাসি' নামের আভিধানিক অর্থের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

মোটকথা, কখনো কখনো নাম উল্লেখ করে শব্দটির নামপূর্ব আভিধানিক অর্থের প্রতি ইংগিত করা উদ্দেশ্য হয়।

আবার প্রিয় ব্যক্তির নাম হলে সেক্ষেত্রে নাম উল্লেখের মাধ্যমে আনন্দ লাভ উদ্দেশ্য হতে পারে। কেননা প্রিয় ব্যক্তির নামের মাঝেও ভিন্ন একটা স্বাদ

থাকে। লায়লার প্রেমিক মজনুর কবিতা দেখো–

بِاللّٰهِ يَا ظَبَيَاتِ القَاعِ قُلْنَ لَنا + لَيْلايَ مِنْكُنْ أَمْ لَيْلٰى مِنَ البَشَرِ

হে বনের হরিণী! আল্লাহর দোহাই, বলো আমাকে; আমার লায়লা কি মানবী; না লায়লা তোমাদেরই একজন?

দেখো, এখানে দ্বিতীয় বার ليلى না বলে هي যমীর ব্যবহার করা যেতো। কিন্তু তাতে প্রিয়জনের নাম উচ্চারণের সুখ লাভ হতো না। অথচ সেটাই হচ্ছে মাজনুর উদ্দেশ্য।

خلاصة الكلام

يُذكَرُ العَلَمُ لإحضارِ المتحدَّثِ عنه بِاسْمِه الخاصِّ به .

و قد يُقْصَدُ به مع ذلك أَغْراضٌ أُخْرٰى، منها :

التعظيم و الإهانة، و الكنايَةُ عن معناه اللُّغَوِيِّ قَبْلَ العَلَمِيَّةِ وَ التَّلَذُّذُ بِذِكْرِ اسْمِ المتحَدَّثِ عنه .

اسم الإشارة

উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে শ্রোতার চিন্তায় পরিচিত রূপে উপস্থিত করার জন্য যদি ইংগিত করে দেখানো ছাড়া অন্য কোন উপায় না থাকে তখন অনিবার্য রূপেই اسم الإشارة ব্যবহার করতে হয়। যেমন ধরো–

متكلم ও سامع উভয়ে কিংবা তাদের কোন একজন আলোচ্য ব্যক্তি বা বস্তুটির কোন নাম কিংবা গুণ সম্পর্কে অবগত নয়। ফলে علم বা اسم الموصول ব্যবহার করার উপায় নেই। কিন্তু ব্যক্তি বা বস্তুটি তাদের সামনে দৃষ্টিগোচর রয়েছে। এমতাবস্থায় একমাত্র উপায় হিসাবে اسم الإرشارة -এর ব্যবহার নির্ধারিত হয়ে যাবে। যেমন, নাম ও গুণ পরিচয়হীন কোন বস্তুর দিকে ইংগিত করে তুমি বললে, بعني هذا

কোরআন শরীফ থেকে একটি উদাহরণ দেখো–

وَ عَلَّمَ آدمَ الأسماءَ كلَّها ثم عَرَضَهم على المَلائكَةِ فقالَ أنْبِئُوني بِأَسماءِ هٰؤُلاءِ إنْ كنتُمْ صٰدِقِيْنَ *

আল্লাহ পাক ফিরিশতাদের সামনে তাঁর সমুদয় সৃষ্টিকে পেশ করেছিলেন। কিন্তু সেগুলোর নাম-পরিচয় কিংবা গুণ-পরিচয় তাঁদের জানা ছিল না। তাই সেগুলোকে নির্ধারণ করার জন্য এবং শ্রোতাদের সামনে পরিচিত রূপে তুলে ধরার জন্য আল্লাহ هؤلاء ইসমুল ইশারাহ ব্যবহার করেছেন।

আবার দেখো, কবি তার প্রিয়জনের প্রশংসা করছেন যে, অন্ধকার রাতের সম্পূর্ণ অপরিচিত আগন্তুককে দেখামাত্র তিনি হৃষ্টপুষ্ট উটনীর গলায় ছুরি চালিয়ে দেন। কবিতাটি শোন–

وَ إذا تَأَمَّلَ شَـخْصَ ضَـيْفٍ مُقْبِل + مُتَسَـرْبِلٍ سِرْبَالَ لَيْـلٍ أَغْبَرِ

অন্ধকার রাতের চাদর মুড়ি দিয়ে আগত কোন মেহমানের কায়া যখন তিনি দেখতে পান,

أَوْمَا إِلَى الكَوْمَاءِ هٰذا طَارِقٌ + نَحَـرَتْنِيَ الأَعْداءُ إِنْ لَمْ تَنْحَرِ

তখন তিনি বিরাট কুঁজওয়ালী (হৃষ্টপুষ্ট) উটনীকে লক্ষ্য করে বলে উঠেন, দেখো, ইনি রাতের অতিথি। এখন তোমাকে যদি জবাই না করি তাহলে শত্রুর হাতে যেন আমার জবাই হয়।

দেখো, রাতের অতিথিটির কোন নাম বা গুণ জানা না থাকায় কবি هذا ইসমুল ইশারার মাধ্যমে তাকে চিহ্নিত ও নির্ধারিত করেছেন।

কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুটির নাম কিংবা গুণ জানা ছিলো। সুতরাং অন্য প্রকার معرفة শ্রোতার চিন্তায় তাকে পরিচিত রূপে তুলে ধরার সুযোগ ছিলো; اسم الإشارة -এর ব্যবহার অনিবার্য ছিলো না। তা সত্ত্বেও متكلم ইসমুল ইশারা ব্যবহার করেছে, তখন বুঝতে হবে যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুটিকে শ্রোতার সামনে পরিচিত রূপে তুলে ধরা ছাড়াও متكلم -এর আরো কোন উদ্দেশ্য রয়েছে, যা اسم الإشارة ব্যবহার না করলে অর্জিত হতো না।

কি কি উদ্দেশ্যে متكلم অন্য প্রকার معرفة ব্যবহার করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও اسم الإشارة ব্যবহার করে থাকে সেগুলো এখানে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

অন্য প্রকার معرفة ব্যবহারের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ইসমুল ইশারা ব্যবহার করার একটি উদ্দেশ্য হলো আলোচ্য বিষয়কে পূর্ণতম রূপে বিশিষ্ট ও চিহ্নিত রূপে শ্রোতার সামানে তুলে ধরা। কেননা অন্যান্য معرفة দ্বারা বিষয়টি শ্রোতার

সামনে পরিচিত রূপে ফুটে উঠে ঠিকই কিন্তু اسم الإشارة ব্যবহার করার অর্থ যেন চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া। সুতরাং এখানে পরিচয়বিশিষ্টতা পূর্ণতম রূপ লাভ করে। সাধারণতঃ প্রশংসা কিংবা নিন্দার ক্ষেত্রে কিংবা বিশেষ গুরুত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে আলোচ্য বিষয়টির পূর্ণতম পরিচয়বিশিষ্টতা প্রকাশ করা এবং সে জন্য اسم الإشارة ব্যবহার করা উত্তম হয়ে থাকে। অতি সুন্দর একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি তোমার সামনে আরো পরিষ্কার রূপে তুলে ধরতে চাই।

উমাইয়া খলীফা হিশাম বিন আব্দুল মালিক একবার প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করতে না পেরে দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ইতিমধ্যে নবী পরিবারের ইমাম যায়নুল আবেদীন আলী বিন হোসায়ন (রহঃ) তাশরীফ আনলেন। আর মানুষ ভক্তির সাথে পথ ছেড়ে দিলো। ইমাম যায়নুল আবেদীন (রহঃ) ধীর প্রশান্ত চিত্তে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন। সিরিয়ার বিশিষ্ট লোকেরা ইমাম সাহেবের জালালাতে শান দেখে খলীফার উদ্দেশ্যে বলে উঠলেন, কে ইনি? অপ্রস্তুত খলীফা হিশাম চিনেও না চেনার ভান করে বললেন, জানি না কে সে। সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ফারাযদাক পাশেই উপস্থিত ছিলেন। ইমামের প্রতি খলীফার এহেন তাচ্ছিল্য তার বরদাশত হলো না। নবী-প্রেমের জোশ তাকে এমনই উদ্দীপ্ত করলো যে, দরবারে খেলাফতের ভয়ভীতির পরোয়া না করে বলে উঠলেন, আমি তাঁকে চিনি। এরপর তিনি সেখানেই মুখে মুখে রচিত এক দীর্ঘ কবিতায় ইমাম সাহেবের প্রশস্তিকীর্তন করলেন। এজন্য তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। ইমাম সাহেব সমস্ত ঘটনা অবগত হয়ে ফারাযদাকের জন্য দশহাজার দিরহাম হাদিয়া পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ফারাযদাক এই বলে তা ফেরত দিয়েছিলেন, সারা জীবন আমীর ওমারাদের হাদীয়া ইনামের লোভে কবিতা বলেছি সত্য। কিন্তু এ কবিতা শুধু আপমার নানাজানের শাফায়াত লাভের আশায়।

আল্লাহ পাক ফারাযদাককে রহম করুন। এবার শোন ফারাযদাকের সেই অমর প্রশস্তিকা–

هٰـذا الذي تَعْرِفُ البَطْحاءُ وَطْأَتَـه + وَالبَيْـتُ يَعْرِفُه وَالحِلُّ وَالحَرَمُ

ইনি সেই মহান যাঁর 'পদ-চাপ' মক্কার প্রস্তর-ভূমি বুঝতে পারে। হিল-হারামের সমগ্র অঞ্চল তাঁকে চেনে। আল্লাহর পবিত্র ঘরও তাঁকে চেনে।

هٰذا ابْنُ خَيْرِ عِبَادِ اللّٰهِ كلِّهِمِ + هٰذا التَّقِيُّ النَّقِيُّ الطاهِرُ العَلَمُ

ইনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ বান্দার বংশধর। ইনি পূত পবিত্র, আল্লাহভীরু ও শীর্ষস্থানীয়।

إذا رَأَتْه قُرَيْشٌ قالَ قائِلُها + إلىٰ مَكارِمِ هٰذا يَنْتَهِي الكَرَمُ

তাকে দেখামাত্র কোরাইশ বলে উঠে, সকল মহত্ত্ব এঁর মহত্ত্বের মাঝে এসে লীন হয়।

هٰذا ابْنُ فاطِمَةَ إنْ كنتَ جاهِلَه + بِجِدِّه أَنْبِياءُ اللّٰهِ قَدْ خُتِمُوا

নাই যদি চেন তবে শোন, ইনি ফাতেমার পুত্র। তাঁর নানার মাধ্যমেই নবুওয়তের সিলসিলা থেমেছে।

দেখো, ফারাযদাকের কাব্যরুচি ও অংলকার জ্ঞান প্রশস্তির ক্ষেত্রে বারবার তাকে هذا ইসমুল ইশারা ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে, তার প্রশংসার পাত্রকে পূর্ণতম রূপে বিশিষ্ট করে হিশামের সামনে তুলে ধরা। হিশাম যেহেতু তাঁকে না চেনার ভান করেছিলেন সে জন্য কবি যেন বারবার هذا বলে চোখে আংগুল দিয়ে চিনিয়ে দিচ্ছিলেন। বলাবাহুল্য যে, মূল বক্তব্যের সাথে ভাবের এই ভিন্নমাত্রাটুকু اسم الإشارة ছাড়া অন্য কোন প্রকার معرفة দ্বারা যোগ করা যেতো না।

কোরআন শরীফ থেকে একটি উদাহরণ দেখো। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নামে অপবাদ আরোপকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলছেন–

اِنَّ الذين جَاؤُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكم لا تَحْسَبوه شَرًّا لكم، بَلْ هُوَ خَيْرٌ لكم، لِكُلِّ امْرِءٍ مِنْهم مَـا اكْتَسَبَ مِنَ الإثْمِ، وَ الذي تَوَلَّى كِبْرَه منهم، له عذابٌ عَظيم، لَوْ لَا إذْ سَمِعْتُمُوه ظَنَّ المؤمنون وَ المؤمنٰتُ بِأَنْفُسِهم خيرًا وَ قالوا هٰذا إفْكٌ مُبين * وَ لَوْلَا إذ سمعتموه قلتُمْ ما يكونُ لنا أن نَتَكلَّم بِهٰذا، سُبْحٰنَكَ هذا بُهْتَنٌ عَظِيمٌ *

যারা অপবাদ রটনা করেছে তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা এটাকে নিজেদের জন্য অকল্যাণকর মনে করো না। বরং এটা তোমাদের জন্য মংগলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্য ততটুকু অপরাধই সাব্যস্ত হবে যতটুকু সে করেছে। আর তাদের মধ্যে যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে তার জন্য রয়েছে বিরাট

শাস্তি। তোমরা যখন এ কথা শুনলে তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ নিজেদের লোক সম্পর্কে কেন উত্তম ধারণা করলে না এবং বললে না যে, এটাতো গুরুতর অপরাধ। দেখো, অপবাদ আরোপের ঘৃণ্য বিষয়টিকে তিন তিন বার اسم الإشارة ব্যবহার করে উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে শ্রোতার অন্তরে বিষয়টি পূর্ণতম বিশিষ্ট রূপে উপস্থিত হয় এবং এর ঘৃণ্যতা শ্রোতার অন্তরে গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায়।

اِنَّ أَوْلٰى الناسِ بِإِبْـراهِيمَ لَلَّـذِينَ اتَّبَعُوه و هٰذا النَّبِيُّ و الذين اٰمَنُوا وَ اللّٰهُ وَلِيُّ المؤمنين *

তারাই ইবরাহীমের আপন যারা তাকে অনুসরণ করেছে আর এই নবী এবং যারা (এই নবীর প্রতি) ঈমান এনেছে। আর আল্লহ হচ্ছেন মুমিনদের বন্ধু।

এখানে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশিষ্টতম রূপে তুলে ধরা উদ্দেশ্য।

২. اسم الإشـارة ব্যবহার করার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো আলোচ্য সত্তার প্রতি তাযীম ও সম্মান প্রকাশ করা এবং তার মর্যাদাগত সুউচ্চতার প্রতি ইংগিত করা। এ উদ্দেশ্যে দূরবর্তী اسم الإشـارة ব্যবহার করা হয়। কেননা এতে বোঝা যায় যে, মর্যাদার দিক থেকে সুদূর উচ্চতায় তার অবস্থান। কোরআনের উদাহরণ দেখো– ذلك الكـتـاب لا ريب فـيـه – এখানে تعريف -এর উদ্দেশ্যটি ال যোগে হাছিল হতে পারতো। যেমন– القرآن لا ريـب فـيـه

তদ্রূপ إضـافـة -এর মাধ্যমেও হতে পারতো। যেমন– كـتـاب الله لا ريب فـيـه – কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর কালামের প্রতি তাযীম ও সম্মান প্রকাশ করতে চেয়েছেন এবং তার মর্যদাগত সুদূর উচ্চতার প্রতি ইংগিত করতে চেয়েছেন। তাই ذلك এই দূরবর্তী اسم الإشـارة ব্যবহার করেছেন।

তদ্রূপ– أُولٰئِكَ عَلٰى هُـدًى من رَبِّـهِم وَ أُولٰئِكَ هم الْمُفْـلِحـون * আয়াতটি সম্পর্কেও এই কথা। এখানে হেদায়াতপ্রাপ্ত ও সফলকাম ব্যক্তিদের সুউচ্চ মর্যাদার প্রতি ইংগিত করার জন্য أولئك এই দূরবর্তী اسم الإشـارة ব্যবহার করা হয়েছে।

৩. اسم الإشـارة ব্যবহার করার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো পূর্ববর্তী উদ্দেশ্যের ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ আলোচ্য সত্তার প্রতি অসম্মান প্রকাশ করা এবং তার

মর্যাদাগত অতিনীচুতার প্রতি ইংগিত করা। এ উদ্দেশ্যেও দূরবর্তী اسم الإشارة ব্যবহার করা হয়। কেননা এতে বোঝা যায় যে, মর্যাদার ক্ষেত্রে নীচের দিকে অতি দূরে তার অবস্থান। কোরআনের উদাহরণ দেখো–

إِنَّ الذين كَفَروا لَنْ تُغْنِيَ عَنهم أَمْوالُهم وَ لَا أَوْلادُهم مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا، و أولئك أصحٰبُ النارِ * هم فيها خالدون *

যারা কুফুরি করেছে তাদের সম্পদ ও সন্তানসন্ততি আল্লাহর মুকাবেলায় তাদের কোন কাজে আসবে না। আর ওরা হলো জাহান্নামী। তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে।

দেখো, এখানে تعريف -এর জন্য ضمير ব্যবহার করে و هم أصحاب النار বলা যেতো। কিন্তু তাদের অতিনিম্ন মর্যাদার প্রতি ইংগিত করার জন্য দূরবর্তী اسم الإشارة ব্যবহার করা হয়েছে।

অর্থাৎ ঐ লোকেরা যারা অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে এবং আল্লাহর রহমত থেকে বহু দূরে সরে পড়েছে, তারা চির জাহান্নামী হবে।

নীচের আয়াতটি সম্পর্কে একই কথা।

وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَنَّهَم كثيرًا مِنَ الجِنِّ وَ الإِنْسِ، لهم قُلوبٌ لا يَفْقَهُون بِها و لهم أَعْيُنٌ لا يُبْصِرون بها وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعون بها، أُولٰئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هم أَضَلُّ، أولئك هم الغٰفِلون *

বহু জ্বিন ও ইনসানের জন্য আমি জাহান্নাম তৈরী করেছি। তাদের হৃদয় রয়েছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না এবং তাদের চক্ষু রয়েছে কিন্তু তা দ্বারা (সত্য) অবলোকন করে না এবং তাদের কর্ণ রয়েছে কিন্তু তা দ্বারা (সত্য) শ্রবণ করে না। ওরা পশু তুল্য বরং আরো অধম। ওরাই হলো গাফেল–বেখবর।

৪. اسم الإشارة ব্যবহার করার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো আলোচ্য সত্তার প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা। নীচের দুটি উদাহরণে বিষয়টি অতি সহজেই তুমি বুঝতে পারবে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে কাফিররা যে বেআদবীপূর্ণ মন্তব্য করতো তা আল্লাহ্ পাক এই আয়াতে তুলে ধরেছেন।

وَ إذا رَءاكَ الذين كَفَروا إِنْ يَتَّخِذُونَك إِلَّا هُزُوا * أَ هٰذا الذي يَذكُر

اِلٰـهَتَكُمْ، و هم بِذِكْرِ الرحْمٰن هم كٰفِرون *

কাফিররা যখন আপনাকে দেখে তখন আপনাকে শুধু পরিহাস-পাত্র রূপে গ্রহণ করে (আর বলে) এ-ই কি তোমাদের উপাস্যদের মন্দ বলে? অথচ তারা রহমানের যিকির অস্বীকার করে।

এখানে هذا এর ব্যবহার যে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের জন্য তা পূর্ববর্তী إلا هزوا -এর ক্বারীনা থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। তাছাড়া استفهام এর উদ্দেশ্যও তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা প্রকাশ।

তদ্রূপ فرعونও هؤلاء দ্বারা বনী ইসরাঈলের প্রতি অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করে বলেছে।

إِنَّ هٰؤلاءِ لَشِـرْذِمَةٌ قَلِيْلُون

৫. اسم الإشـارة ব্যবহার করার আরেকটি উদ্দেশ্য হল এ কথা বোঝানো যে, আলোচ্য বিষয়টি অতি সুস্পষ্ট এবং বোধগম্যতার ক্ষেত্রে এত নিকটবর্তী যে, তা বোঝার জন্য বেশী দূর চিন্তা করতে হয় না। নিকটবর্তী اسم الإشـارة ব্যবহার করে এ ভাব প্রকাশ করা হয়ে থাকে। উদাহরণ দেখো–

إن هذا القرآنَ يَهْدِي لِلَّتِيْ هي أَقْوَمُ

এখানে ال অব্যয় যোগেই تعريف এর উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে গেছে। তদুপরি هذا ইসমুল ইশারা ব্যবহার করার বাড়তি উদ্দেশ্য হলো এদিকে ইংগিত করা যে, এই কোরআন সুস্পষ্টতা ও সহজবোধ্যতার দিক থেকে তোমাদের অতি নিকটের জিনিস।

৬. আলোচ্য সত্তার নিকটবর্তিতা ও দূরবর্তিতার অবস্থা বোঝানোর জন্যও ইসমুল ইশারা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ স্থান-কাল-পাত্র যদি আলোচ্য সত্তার নিকটবর্তিতা বা দূরবর্তিতা বা মধ্যবর্তিতা প্রকাশ করার দাবী জানায় তখন যথাক্রমে নিকটবর্তী, দূরবর্তী ও মধ্যবর্তী اسم الإشارة ব্যবহার করা হয়। যেমন–

هذا يوسـف و ذاك أخوه و ذلك غـلامه

৭. আলোচ্য বিষয়ের অদ্ভুতত্ব ও অভিনবত্ব-এর প্রতি ইংগিত করার জন্য ও ইসমুল ইশারা ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ দেখো–

كَمْ عاقِلٍ عاقـلٍ اَعْـيَتْ مَذَاهِبُه + وَ جـاهِلٍ جـاهِلٍ تَلْقَاه مَرْزُوقَا

هٰذا الذي تَرَكَ الأَوْهامَ حائِرةً + و صَيَّرَ العالِمَ النِّحْرِيرَ زِنْدِيقَا

কত জ্ঞানীর জীবিকার সকল পথ রুদ্ধ, অথচ কত মূর্খকে দেখতে পাবে বেশ সুখী সচ্ছল। এ এমন বিষয় যা চিন্তাকে বিমূঢ় করে দেয় এবং মহান আলিমকে পর্যন্ত ধর্মহীন করে ছাড়ে।

দেখো, এখানে هذا-এর مشار إليه হচ্ছে فقر العاقل ও رزق الجاهل এবং উপরোক্ত বিষয়টি সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করার জন্যই اسم الإشارة ব্যবহার করা হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় একে বলা হয় اظهار الاستغراب

خلاصة الكلام

يُؤْتى بِاسْمِ الإشارَةِ إذا تَعَيَّنَ طريقًا لِلتَّعْرِيفِ بِالْمُشَارِ إليه، كَمَا أَشَرْتَ إلى شَيْءٍ لا تَعْرِفُ له اسْمًا و لا وَصْفًا فقلتَ بِعْنِي هٰذا .

أَمَّا إذا لَمْ يَتَعَيَّنْ اسْمُ الإشارَةِ طريقًا لِلتَّعريفِ بالمشار إليه فيكونَ اسْتِعمالُه حِيْنَئِذٍ لِأَغْراضٍ أُخْرٰى . و هي :

(١) تَمْيِيْزُ المتحدَّثِ عنه أَكْمَلَ تَمْيِيْزٍ وَ إِحضارُه في ذِهْنِ السامِعِ مَعَ كَمَالِ التَّعْيِيْنِ وَ يَحْسُنُ هذا في المَدْحِ أو في الهِجاءِ .

(٢) تعظِيمُ المتحدَّثِ عنه وَ بيانُ ارْتِفاعِ مَنْزِلَتِه، و ذٰلك بِاسْتِعمَالِ اسْمِ الإشارَةِ للبَعيدِ .

(٣) إهانَةُ المتحدَّثِ عنه و بيانُ انْحِطاطِ مَنْزِلَتِه، و ذٰلك بِاسْتِعْمَالِ اسْمِ الإشارَةِ للبَعيدِ أَيْضاً .

(٤) تحقير المتحدث عنه .

(٥) بَيانُ أَنَّ المتحدَّثَ عنه وَاضِحٌ جَلِيٌّ حاضِرٌ قَريبٌ إلى الفَهْمِ .

(٦) بَيانُ حالِ المشار إليه في القُرْبِ وَ البُعْدِ .

(٧) إظهار الاستغراب .

الـموصـول

সাত প্রকার مَعرفة -এর তৃতীয় প্রকার হলো اسم الموصول – এটি এমন একটি মারিফা যা আপন উদ্দেশ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। প্রথম বিষয়টি হলো পরবর্তী صلة

صلة অর্থ اسم الموصول -এর পরবর্তী جملة خبرية কিংবা شبه الجملة (অর্থাৎ ظرف কিংবা جار ও مجرور যা বাধ্যতামূলকভাবে উহ্য একটি عامل -এর সাথে متعلق হয়ে থাকে।)

এই صلة পূর্ববর্তী اسم الموصول -এর উদ্দেশ্যকে শ্রোতার সামনে প্রকাশ করে।

উদাহরণগুলো যথাক্রমে দেখো–

১. الذي خلقَ كلَّ شيءٍ ২. الذي في الدار ৩. الذي عندك

বিশেষভাবে ال الموصولية -এর ক্ষেত্রে وصف صريح 'ছিলাহ' হয়ে থাকে, যেমন–

هـذا المغلوبَ (أَيْ الذي غُـلِبَ عَلَى اَمْرِه .

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো عائد যা صلة ও موصول -এর মাঝে সংযোগ সৃষ্টি করে। এ কথাগুলো نحو -এর কিতাবেই তুমি পড়ে এসেছো।

মোটকথা, اسم الموصول তার উদ্দেশ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুটি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অস্পষ্টতাসম্পন্ন একটি معرفة এবং পরবর্তী صلة টি মূলতঃ موصول -এর উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুটিকে নির্ধারণ করে দেয়।

اسم الموصول -এর এই প্রাথমিক অস্পষ্টতা শ্রোতার অন্তরে পরবর্তী صلة দ্বারা موصول -এর উদ্দেশ্যটি জানবার একটি কৌতুহল ও আগ্রহ সৃষ্টি করে থাকে। এটা اسم الموصول -এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যা অন্যান্য প্রকার معرفة -এর মাঝে পাওয়া যায় না।

এবার আমরা اسم الموصول -এর ব্যবহারক্ষেত্র সম্পর্কে তোমাকে কিঞ্চিৎ ধারণা দিতে চাই। বালাগাতশাস্ত্র বিশারদগণ বলেছেন, যখন আলোচ্য সত্তাকে শ্রোতার সামনে পরিচিত রূপে তুলে ধরার অন্য কোন উপায় না থাকে অর্থাৎ

اسم الموصول ছাড়া অন্য কোন প্রকার معرفة ব্যবহার করার সুযোগ না থাকে তখন অনিবার্যভাবেই اسم الموصول ব্যবহার করা হয়। যেমন, ধরো, তোমার বন্ধু সম্পর্কে শ্রোতাকে তুমি কোন খবর দিতে চাও। কিন্তু তার নাম শ্রোতার জানা নেই; সুতরাং علم -এর মাধ্যমে তাকে শ্রোতার সামনে পরিচিত রূপে তুলে ধরার সুযোগ নেই। তদ্রূপ সে যে তোমার বন্ধু সেটাও শ্রোতার জানা নেই; সুতরাং صديقي এই إضافة ব্যবহার করারও সুযোগ নেই। তদ্রূপ মনে করো, লোকটি সম্মুখে উপস্থিত নেই; সুতরাং اسم الإشارة -এর মাধ্যমে তাকে শ্রোতার সামনে তুলে ধরার সুযোগ নেই।

মোটকথা, অন্য কোন প্রকার معرفة ব্যবহার করে উক্ত ব্যক্তিকে শ্রোতার সামনে তুলে ধরার সুযোগ নেই। কিন্তু তার একটি গুণ বা অবস্থা শ্রোতার জানা আছে। যেমন ধরো, গতকাল সে শ্রোতার সাথে কথা বলেছিলো। এখন তুমি এই অবস্থাটিকে صلة বানিয়ে যদি اسم الموصول ব্যবহার করো তাহলে শ্রোতার সামনে আলোচ্য ব্যক্তিটি পরিচিত রূপে উপস্থিত হবে। যেহেতু এ ক্ষেত্রে اسم الموصول ছাড়া অন্য কোন প্রকার معرفة ব্যবহার করার সুযোগ নেই সেহেতু অনিবার্যভাবেই তোমাকে اسم الموصول ব্যবহার করতে হবে। যেমন তুমি বললে–

الذي تَحَدَّثَكَ بِالْأَمْسِ يَدعوك

কোরআনের একটি উদাহরণ দেখো, হযরত মুসা (আঃ)-এর ঘটনা প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা ঐ ইসরাইলী ব্যক্তিটির কথা উল্লেখ করেছেন যে, তার প্রতিপক্ষ কিবতীর বিরুদ্ধে হযরত মুসা (আঃ)-এর সাহায্য প্রার্থনা করেছিল এবং মুসা (আঃ) তাকে সাহায্য করেছিলেন–

فَأَصْبَحَ في المدينَةِ خائفًا يَتَرَقَّب فَإِذَا الذي اسْتَنْصَره بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُه قالَ له موسى إِنَّك لَغَوِيٌّ مُبين *

অতঃপর তিনি শহরে ভীত-সংকিত অবস্থায় প্রাতঃযাপন করলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন, গতকাল যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়ে ছিলো সে চিৎকার করে তার সাহায্য প্রার্থনা করছে। (তখন) মূসা (আঃ) তাকে বললেন, তুমি প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট।

দেখো, আমরা যারা এই ঘটনার শ্রোতা আলোচ্য ব্যক্তিটির নামধাম বা অন্য কোন পরিচয় জানি না। শুধু ঘটনার শুরুতে বর্ণিত এ কথাটুকুই জানি যে, পূর্ববর্তী দিন সে হযরত মুসার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল আর তিনি

কিবতীকে এক চড়ে মেরে ফেলেছিলেন। যেহেতু আলোচ্য লোকটিকে আমাদের সামনে পরিচিত রূপে তুলে ধরার জন্য অন্য কোন প্রকার معرفة ব্যবহার করার সুযোগ ছিল না, اسم الموصول ই ছিল একমাত্র উপায়; সে কারণেই এখানে ইসমুল মাওছূল ব্যবহার করা হয়েছে।

কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুটিকে অন্যান্য প্রকার معرفة দ্বারা শ্রোতার সামনে পরিচিত রূপে তুলে ধরার সুযোগ রয়েছে। যেমন ধরো, তার নাম শ্রোতার জানা আছে কিংবা ব্যক্তি বা বস্তুটি সামনে উপস্থিত রয়েছে; এমতাবস্থায় اسم الموصول ব্যবহার করা অনিবার্য নয়। তা সত্ত্বেও দেখা যায়, متكلم আলোচ্য ব্যক্তি বা বস্তুটিকে اسم الموصول -এর মাধ্যমে শ্রোতার সামনে তুলে ধরছে, তাহলে বুঝতে হবে যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুটিকে শ্রোতার সামনে পরিচিত রূপে তুলে ধরা ছাড়াও متكلم -এর অন্য কোন উদ্দেশ্য রয়েছে।

কি কি উদ্দেশ্যে متكلم অন্য প্রকার معرفة ব্যবহারের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও اسم الموصول ব্যবহার করে থাকে সেগুলো এখানে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

১. হযরত যাহ্যাক বিন সুফয়ান (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

إِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ مَا يَخْرُجُ مِنِ ابْنِ آدَمَ مَثَـلًا لِلدُّنْيَـا

আদম সন্তান থেকে যা বের হয় সেটাকে আল্লাহ দুনিয়ার উদাহরণ নির্ধারণ করেছেন।

দেখো, এখানে ما يخرج দ্বারা الغائط উদ্দেশ্য। সুতরাং المعرف بال দ্বারা বিষয়টি শ্রোতার চিন্তায় পরিচিত রূপে তুলে ধরার সুযোগ ছিলো। তাসত্ত্বেও اسم الموصول কেন ব্যবহার করা হলো? কারণ এই যে, এ ধরনের জিনিস প্রত্যক্ষ শব্দ দ্বারা উল্লেখ করতে ভদ্র রুচিতে বাঁধে এবং লজ্জাবোধ হয়। তাই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اسم الموصول যোগে ইংগিতে সেটা প্রকাশ করেছেন। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, আলোচ্য বিষয়টি প্রত্যক্ষ শব্দে উল্লেখ করা রুচিবিরুদ্ধ, লজ্জাষ্কর বা আদবের খেলাফ হলে সেটাকে ইসমুল মাওছূলের মাধ্যমে ইংগিতে প্রকাশ করা হয়।

২. নীচের আয়াতটি দেখো,

إِنَّ الـذين آمَنوا و عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كانَتْ لهم جَنّٰتُ الفِرْدَوْسِ نُزُلًا *

নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস হবে বাসস্থান।

দেখো, আলোচ্য আয়াতে যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাদের জান্নাতুল ফেরদাউস লাভের কারণ কি? ঈমান ও নেক আমলই হলো কারণ। এটা আমরা ইসমে মাউছূলের صلة থেকে জানতে পেরেছি। মোটকথা, اسم الموصول -এর صلة টি এখানে বাক্যস্থ حكم -এর علة বা হেতু ও কারণ বর্ণনা করেছে।

আবার দেখো, কোরআন শরীফের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ

এখানে اسم الوصول -এর صلة এদিকে ইংগিত করছে যে, ঈমানের দাবী হলো পরবর্তী আদেশটি পালন করা অর্থাৎ তাকওয়া অবলম্বন করা।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, اسم الموصول ব্যবহারের একটি উদ্দেশ্য হলো صلة -এর মাধ্যমে বাক্যস্থ حكم -এর কারণ বর্ণনা করা এবং এ দিকে ইংগিত করা যে, صلة টির দাবী হচ্ছে পরবর্তী আদেশ প্রতিপালন করা। নীচের উদাহরণ দু'টি সম্পর্কেও একই কথা।

إِنَّ الذين كَفَروا بِاٰيٰتِنا سوفَ نُصْلِيهِم نارًا

অর্থাৎ এই কঠিন শাস্তি লাভের কারণ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করা।

يَا اَيُّهَا الذي رَبَّيْتُه صَغيرًا ارْحَمْنِي كبيرًا

হে ঐ ব্যক্তি যাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছি আজ (আমার) বার্ধক্যের অবস্থায় আমার প্রতি রহম করো।

অর্থাৎ শৈশবে তোমাকে প্রতিপালন করার দাবী হচ্ছে বার্ধক্যে আমার প্রতি করুণা করা।

৩. এবার নীচের উদাহরণটি দেখো–

إِنَّ الذينَ تَرَوْنَهُمْ إِخْوانَكُمْ + يَشْفِيْ غَلِيْلَ صُدورِهم أَنْ تُصْرَعُوا

যাদের তোমরা বন্ধু ভাবছো তোমাদের ধ্বংসই শুধু তাদের বুকের প্রতিহিংসার উপশম করতে পারে।

অর্থাৎ যাদেরকে তোমরা বন্ধু ভাবছ তারা তোমাদের ধ্বংস কামনা করে। সুতরাং তোমাদের এই ভাবনা ভুল।

তুমি নিশ্চিয় বুঝতে পারছো যে, এখানে اسم الموصول ও صلة দ্বারা শ্রোতাদেরকে তাদের ভুল চিন্তার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।

যদি এখানে অন্য কোন প্রকার معرفة ব্যবহার করা হতো যেমন إن أعداءكم কিংবা إن هؤلاء কিংবা إن القومَ الفُلانِيَّ তাহলে শ্রোতার চিন্তায় আলোচ্য ব্যক্তিদেরকে পরিচিত রূপে পেশ করার উদ্দেশ্যটি অবশ্যই অর্জিত হতো কিন্তু শ্রোতাকে তার ভুল চিন্তার ব্যাপারে সতর্ক করার উদ্দেশ্যটি হাছিল হতো না।

৪. নীচের উদাহরণটি দেখো–

إنَّ الذي سَمَكَ السَّماءَ بَنَى لَنا + بَيْتًا دَعائِمُه أَعَزُّ وَ أَطْوَلُ

যিনি আকাশকে সুউচ্চ করেছেন তিনি আমাদের জন্য মর্যাদার এমন এক ইমারত তৈরী করেছেন যার খুঁটিগুলো সংহত ও সুউচ্চ।

দেখো, কবির বর্ণনা থেকে আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে, কবি-গোত্রের জন্য মর্যাদা ও আভিজাত্যের যে ইমারত তৈরী হয়েছে তা অনন্য সাধারণ। কেননা তা এমন সত্তা তৈরী করেছেন যিনি আসমানকে সুউচ্চ করেছেন। সুতরাং বোঝা গেল যে, الذي سمك السماء অংশটি মূলতঃ بناء البيت -এর অনন্যসাধারণতা ও বড়ত্বের প্রতি ইংগিত করছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, اسم الموصول ব্যবহারের একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে صلة -এর মাধ্যমে পরবর্তী خبر -এর বড়ত্ব ও অসাধারণত্ব প্রকাশ করা।

৫. এবার নীচের উদাহরণটি লক্ষ্য করো।

و رَاوَدَتْه التي هو في بيتِها عَنْ نفسِه و غَلَّقَتِ الأَبْوابَ و قالَتْ هَيْتَ لَك، قال معاذَ اللّٰهِ إنه ربي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إنه لا يُفلح الظلمون *

ঐ নারী তাকে প্ররোচিত করলো যার বাড়ীতে তিনি ছিলেন এবং দরজা বন্ধ করে বললো, শোনো, আসো আমার কাছে। তিনি বললেন, আল্লাহ রক্ষা করুন। তিনি আমার আশ্রয়দাতা। আমাকে উত্তম আশ্রয় দান করেছেন। নিঃসন্দেহে সীমালঘনকারীরা সফল হতে পারে না।

দেখো, শ্রোতার চিন্তায় স্ত্রীলোকটিকে পরিচিতরূপে তুলে ধরার জন্য অন্যান্য

প্রকার معرفة ব্যবহার করার সুযোগ ছিলো। যেমন– و راودته امرأة العزيز কিংবা و راودته زليخا – কিন্তু সেগুলোর পরিবর্তে اسم الموصول দ্বারা স্ত্রীলোকটির পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেলো যে, এখানে ভিন্ন একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। সেটি কি?

দেখো, আলোচ্য আয়াতটির মূল বক্তব্য হচ্ছে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর চরিত্রের শুচি-শুভ্রতা বর্ণনা করা। আর তা اسم الموصول ও صلة দ্বারা অধিক জোরদারভাবে পেশ করা হয়েছে। কেননা এ থেকে জানা গেল যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) উক্ত নারীর গৃহে বাস করতেন এবং ঐ নারীর পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে ছিলেন। এমতাবস্থায় তার ইচ্ছা পূর্ণ না করে সত্যের পথে অবিচল থাকা সুকঠিন ছিলো, তা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে পুতপবিত্র রাখতে পেরেছিলেন, যা তার চারিত্রের অনন্য সাধারণ দৃঢ়তা প্রমাণ করে। বলাবাহুল্য যে, অন্য معرفة দ্বারা এই উদ্দেশ্য প্রকাশ পেতো না।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, মূল বক্তব্যকে জোরদার রূপে পেশ করার উদ্দেশ্যে কখনো কখনো اسم الموصول ও صلة ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

নীচের কবিতাটি সম্পর্কেও একই কথা–

أَعُبَّادَ الْمَسِيْحِ يَخَافُ صَحْبِي + وَ نَحْنُ عَبِيْدُ مَنْ خَلَقَ الْمَسِيْحَا

হে মাসীহের বান্দাগণ! আমার সাথীরা (মুসলমানেরা) তোমাদের ভয় পাবে! অথচ আমরা হলাম ঐ সত্তার বান্দা যিনি মাসীহকে সৃষ্টি করেছেন।

দেখো, এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে মসীহের অনুসারী খৃষ্টানদেরকে মুসলমানদের ভয় পাওয়ার কথা অস্বীকার করা। কেননা মুসলমানেরা তো আল্লাহর ইবাদত করে, যিনি হযরত ঈসা (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আমাদের খালেকের বান্দার বান্দাদেরকে ভয় পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। দেখো, যদি نحن عبيد الله বলা হতো তাহলে এই বক্তব্যটি এতো জোরদার হতো না।

৬. اسم الموصول ব্যবহার করার আরেকটি উদ্দেশ্য হলো اسم الموصول দ্বারা উদ্দিষ্ট বিষয়টির গুরুতরতা ও ভয়াবহতা প্রকাশ করা। যেমন–

فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ

ডুবিয়ে দিয়েছিল যা তাদের ডুবিয়ে দিয়েছিল।

অর্থাৎ বিরাট এক ঢেউ তাদের ডুবিয়ে দিয়েছিল। এখানে اسم الموصول

ব্যবহার করার অর্থ যেন এই যে, ঢেউয়ের বিরাটত্ব ও ভয়াবহতা কোন শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব নয় তাই اسم الموصول ও صلة এর আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে।

৭. اسم الموصول ব্যবহারের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো উদ্দিষ্ট সত্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করা। যেমন–

جاءَ الذي أدَّبَكَ وَ رَبَّاكَ فَأَحْسَنَ تَربِيتَكَ ·

যিনি তোমাকে উত্তম রূপে প্রতিপালন করেছেন এবং শিষ্টাচার শিক্ষা দান করেছেন তিনি এসেছে (সুতরাং তার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করো)।

خلاصة الكلام

إِنْ لم يَعْلَمِ المخاطَبُ عن المتحدَّثِ عنه مَا يُعَرِّفُه سِوَى الصِّلَةِ، تَعَيَّنَ الموصولُ وَ صِلَتُه لِإِحْضارِ معناهَ في ذهنِ المخاطَبِ ·

أَما إذا لم يتعيَّنِ الموصولُ و صِلَتُه طريقًا لِإِحْضارِ المتحدَّثِ عنه في ذهنِ السامِعِ فحِ يكونُ اسْتعمالُ الموصولِ لِأَغْراضٍ أُخْرٰى و هي :

(١) إرادةُ عدمِ التصريحِ بالاسم تَأَدُّبًا أَوِ اسْتِحْياءً أو لِكَوْنِه مُسْتَهْجَنًا

(٢) بيانُ عِلَّةِ الحكم (١)

(٣) زيادةُ تقريرِ الغَرَضِ الذي سِيْقَ لِأَجْلِه الكلامُ ·

(٤) تعظيم شأنِ الخبَرِ

(٥) إرادةُ تنبيهِ المخاطَبِ على خَطإٍ وقَعَ فيه ·

(٦) إخفاءُ الأمرِ عن غيرِ المخاطَبِ نَحْوَ: أخذتُ ما جادَ الأميرُ به ·

(٧) بيانُ تهويلِ ما أُرِيْدَ بِالمَوْصُولِ ·

(٨) الحث على تعظيم المتحدَّث عنه ·

(٩) التهكم ·

(١٠) الحث على الترحم ·

---

١ – أي بيان أن الوصف الذي دلت عليه الصلة هو علة الحكم الذي في الجملة · أو بيان أن الوصف الذي دلت عليه الصلة يقتضي إطاعة الأمر الذي بعدها·

المعرف بأل

তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করি ما الإنسان মানুষ কাকে বলে বা মানুষের পরিচিয় কি? তাহলে তুমি বলবে الإنسانُ حَيَوانٌ ناطِقٌ (মানুষ হলো সবাক প্রাণী)

এখানে الإنسان দ্বারা মানুষের جنس বা জাতিসত্তা উদ্দেশ্য। অন্য কথায় মানুষের হাকীকত ও ماهية (ভাবসত্তা উদ্দেশ্য)। মানুষের কোন فرد বা সদস্য উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে اُدْعُ هذا الإنسانَ দ্বারা মানুষের জাতিসত্তা উদ্দেশ্য নয়; বরং বাস্তবে বিদ্যমান উক্ত জাতিসত্তার একটি নির্দিষ্ট فرد বা সদস্য উদ্দেশ্য।

আবার দেখো, الإنسانُ إمَّا في النارِ وَ إمَّا في الجَنَّةِ (প্রতিটি মানুষ হয় জাহান্নামী, নয় জান্নাতী।) বাক্যটিতে الإنسان দ্বারা جنس الإنسان -এর সকল فرد বা সদস্য উদ্দেশ্য।

উপরের আলোচনাটুকু চিন্তায় রেখে এবার নীচের কথাগুলো পড়ো।

কোন শব্দকে لام التعريف যুক্ত করার উদ্দেশ্য চারটি।

প্রথমতঃ কোন কিছুর جنس বা حقيقة ও ماهية -এর দিকে ইংগিত করা। উক্ত جنس বা حقيقة -এর কোন فرد বা সদস্য তখন উদ্দেশ্য হবে না। যেমন– الإنسان حيوان ناطق – এখানে أل দ্বারা إنسان -এর حقيقة ও ماهية বোঝানো উদ্দেশ্য।

তদ্রূপ الذَّهَبُ أَثْمَنُ من الفِضَّةِ বাক্যটি দেখো, এখানে ذهب বলতে যে জাতিসত্তা বা জিন্‌সকে আমরা বুঝি সেটাকে جنس الفضة -এর চেয়ে দামী বলা উদ্দেশ্য। স্বর্ণ বা রূপার কোন فرد বা সমগ্র أفراد উদ্দেশ্য নয়।

أَهْلَكَ الناسَ الدينارُ و الدرهمُ সম্পর্কেও একই কথা। অর্থাৎ দীনার ও দিরহাম বলতে যে জিন্‌স বা জাতিসত্তাকে আমরা বুঝি তা মানবজাতিকে বা جنس الناس কে ধ্বংস করেছে। এখানে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি দীনার ও দিরহাম উদ্দেশ্য নয়। তদ্রূপ বিশেষ কোন দীনার দিরহাম এবং বিশেষ কোন মানুষ উদ্দেশ্য নয়।

وَ جَعلنا مِنَ الماءِ كلَّ شيءٍ حَيٍّ আয়াত সম্পর্কেও একই কথা। অর্থাৎ পানি

বলতে যে জাতিসত্তাকে বা যে হাকীকত ও ماهية কে বোঝা যায় সেটা থেকে প্রতিটি প্রাণসম্পন্ন বস্তুকে আমি সৃষ্টি করেছি। পরিভাষায় এটাকে لام الجنس বলে।

দ্বিতীয়তঃ جنس বা জাতিসত্তার সমগ্র أفراد -এর দিকে ইংগিত করা। যেমন إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ – অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। এখানে পবরর্তী استثناء হচ্ছে جميع الأفراد উদ্দেশ্য হওয়ার قرينة – কেননা استثناء -এর জন্য শর্ত হচ্ছে أداة الإستثناء ব্যবহারের পূর্বে مستثنى পূর্ববর্তী مستثنى منه এর অন্তর্ভুক্ত থাকা। সুতরাং আলোচ্য استثناء দ্বারা বোঝা গেলো যে, সকল ইনসানকে ক্ষতিগ্রস্ত বলা উদ্দেশ্য। পরে استثناء -এর মাধ্যমে কিছু সংখ্যক ইনসানকে ক্ষতিগ্রস্ততার হুকুম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

خُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا এখানেও ইনসানের সমস্ত أفراد উদ্দেশ্য। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষকে দুর্বল রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে جميع الأفراد উদ্দেশ্য হওয়ার قرينة হচ্ছে বাস্তব অবস্থা। অর্থাৎ যেহেতু বাস্তবে প্রতিটি মানুষকে আমরা দুর্বল দেখতে পাই সেহেতু বোঝা গেলো যে, প্রতিটি মানুষকেই দুর্বল রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে।

তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, প্রথম উদাহরণে قرينة হচ্ছে لفظية বা শব্দগত। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় উদাহরণে قرينة হচ্ছে غير لفظية বা حالية (অর্থাৎ অশব্দগত বা অবস্থাগত)।

ذٰلِكَ عٰلِمُ الغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ العزيزُ الرحيم *

এখানেও الغيب দ্বারা সমস্ত অদৃশ্য বিষয় উদ্দেশ্য। এখানে جميع الأفراد উদ্দেশ্য হওয়ার قرينة হচ্ছে الدليل العقلي বা যুক্তিগত প্রমাণ।

এবার وجاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ আয়াতটি দেখো, এখানেও সকল যাদুকর উদ্দেশ্য। তবে বিশ্বের সকল যাদুকর নয় বরং ফিরআউনের রাজত্বে অবস্থানকারী সকল যাদুকর। সুতরাং এখানে السحرة শব্দটি প্রকৃত সামগ্রিকতা বোঝায়নি; বরং আপেক্ষিক সামগ্রিকতা বুঝিয়েছে। পরিভাষায় এটাকে لام الاستغراق বলে।

তৃতীয়তঃ جنس -এর নির্দিষ্ট ও পরিচিত কোন একটি فرد -এর প্রতি ইংগিত করা। যেমন أُدْعُ هذا الإنسانَ – এখানে جنس الإنسان -এর নির্দিষ্ট ও পরিচিত একটি فرد উদ্দেশ্য। هذا শব্দটি থেকে আমরা তা বুঝতে পেরেছি।

সুতরাং এটা হলো قرينة বা আলামত। পরিভাষায় এটাকে لام العهد الخارجي বলে।

তবে উদ্দিষ্ট فرد টির পরিচয়ের বিভিন্ন সূত্র হতে পারে। যেমন দেখো–

إِنَّا أَرسلنا إلى فرعونَ رسولًا فَعَصَى فرعونُ الرسولَ

এখানে رسولا শব্দের উল্লেখ থেকে বোঝা গেলো الرسول দ্বারা فرعون -এর নিকট প্রেরিত নির্দিষ্ট ও পরিচিত রাসূল উদ্দেশ্য। সুতরাং এখানে পরিচয়ের সূত্র হলো পূর্বোল্লেখ।

اللّٰهُ نورُ السَّمٰوٰتِ وَ الأرضِ مثلُ نورِه كَمِشْكوٰةٍ فيها مِصباحٌ * المصباحُ في زُجاجَةٍ * الزجاجةُ كَأَنَّها كوكَبٌ دُرِّيٌّ *

আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি। তার জ্যোতির উদাহরণ যেন এক দ্বীপাধার, যাতে রক্ষিত এক প্রদীপ। প্রদীপটি রক্ষিত এক কাঁচ-পাত্রে। কাঁচ-পাত্রটি যেন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

এখানেও المصباح ও الزجاجة শব্দ দুটি পরিচিত হয়েছে পূর্বোল্লেখ দ্বারা।

তুমি কারো বাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললে افتحْ البابَ – এখানে ال দ্বারা নির্দিষ্ট ও পরিচিত দরজা খুলতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ যে দরজাটি সম্মুখে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে পরিচয়ের সূত্র হলো বস্তুটির সম্মুখ উপস্থিতি।

اليومَ اَكْملتُ لكم دينَكم و أَتممتُ عليكم نِعمتي و رضيتُ لكم الإسلامَ دينًا

আয়াতটি দেখো, এখানে ال দ্বারা নির্দিষ্ট ও পরিচিত দিন বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আলোচ্য আয়াত নাযিল হওয়ার বর্তমান দিনটি (বিদায় হজ্জের আরাফার দিন)। এখানেও দিবসটির পরিচিত হওয়ার সূত্র হচ্ছে বাস্তবে উপস্থিত ও বিদ্যমান থাকা।

قالَ المَلَأُ مِنْ قومِ فرعونَ .... আয়াতে الملأ দ্বারা উপস্থিত সভাসদবর্গ উদ্দেশ্য। সুতরাং এখানেও উপস্থিতি হলো পরিচয়ের সূত্র।

اِلاَّ تَنْصروه فَقَدْ نَصَرَه اللّٰهُ اِذْهما في الغارِ – দেখো, এখানে الغار কে নির্দিষ্ট ও পরিচিত রূপে পেশ করা হয়েছে। অথচ পূর্বে তার উল্লেখ নেই এবং তা সম্মুখে বিদ্যমানও নেই। কিন্তু উক্ত غار সম্পর্কে مخاطب -এর পূর্বজ্ঞান ও অবহিতি রয়েছে। সুতরাং এখানে বস্তুটির পরিচয়ের সূত্র হলো مخاطب এর

পূর্বজ্ঞান

لقد رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ المؤمنين إذْ يُبايِعُوْنَكَ تحتَ الشجرة – আয়াতটি সম্পর্কেও একই কথা।

চতুর্থতঃ কোন جنس বা জাতিসত্তার প্রতি ইংগিত করা। তবে এই জাতিসত্তাটি তার কল্পনায় বিদ্যমান একটি فرد -এর মাধ্যমে মূর্ত হয়েছে। কিন্তু সেই فرد টি বাস্তবে নির্ধারিত ও পরিচিত নয়। কোরআনের একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি সহজে বোঝা যেতে পারে। দেখো, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৎ ভাইয়েরা যখন পিতার নিকট খেলাধূলার নাম করে তাকে সংগে নেয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলো তখন তিনি আশংকা ব্যক্ত করে তাদের বললেন–

قالَ إني لَيَحْزُنُنِيْ أن تذهَبوا به و أخافُ أنْ يأْكُلَه الذئبُ و أنتم عنه غافلون *

তাকে তোমাদের সংগে নিয়ে যাওয়া আমাকে দুঃখ দিবে। তা ছাড়া আমার আশংকা হয় যে, তোমরা তার প্রতি উদাসীন হওয়ার সুযোগে নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলবে।

দেখো, এখানে الذئب শব্দটি দ্বারা নেকড়ের প্রতিটি فرد উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেননা সকল নেকড়ে একত্রে তাকে ভক্ষণ করবে এ চিন্তা অযৌক্তিক। তদ্রূপ নেকড়ের নির্ধারিত ও পরিচিত কোন فرد উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেননা নির্ধারিত কোন নেকড়ে তার সামনে ছিলো না। তদ্রূপ নেকড়ের কোন فرد ছাড়া নিছক জাতিসত্তা বা جنس -এর উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেননা جنس বা জাতিসত্তা হচ্ছে কতিপয় গুণ সমষ্টি যা বাস্তবে বিভিন্ন فرد -এর মাঝে বিদ্যমান, বাস্তবে আলাদাভাবে বিদ্যমান নয়। সুতরাং جنس দ্বারা ভক্ষণ হতে পারে না; বরং جنس -এর কোন فرد দ্বারা ভক্ষণ হতে পারে। মোটকথা, الذئب -এর ال দ্বারা সমগ্র أفراد বা নির্ধারিত فرد বা فردবিহীন নিছক حقيقة বা جنس এখানে উদ্দেশ্য হতে পারে না। সুতরাং বলতে হবে যে, الذئب দ্বারা হযরত ইয়াকুব (আঃ) একটি প্রাণীর জাতিসত্তাকে বোঝাতে চেয়েছেন, যা তাঁর চিন্তায় একটি مبهم বা অস্পষ্ট فرد -এর রূপ ধরে বিদ্যমান হয়েছিলো। বলাবাহুল্য যে, এই فرد টি বাস্তবে নির্ধারিত ছিলো না; বরং বাস্তবের যে কোন فرد এর উপর তা প্রযুক্ত হতে পারে।

দেখো, যদি তিনি ذئب বলতেন তাহলে বোঝা যেতো যে, বাস্তবে বিদ্যমান নেকড়ের সকল أفراد -এর মধ্য হতে অনির্ধারিত কোন একটি فرد কে তিনি উদ্দেশ্য করেছেন। পক্ষান্তরে الذئب দ্বারা বোঝা যায় যে, একটি জাতিসত্তার প্রতি

ইংগিত করেছেন, তবে يأكل -এর قرينة থেকে বোঝা যায় যে, নিছক জাতিসত্তা উদ্দেশ্য নয়; বরং এমন জাতিসত্তা উদ্দেশ্য যা কাল্পনায় বিদ্যমান একটি مبهم বা অস্পষ্ট فرد -এর আকারে বিদ্যমান। অর্থাৎ نكرة দ্বারা সরাসরি جنس -এর একটি অনির্ধারিত ও অপরিচিত فرد উদ্দেশ্য হয়। পক্ষান্তরে চতুর্থ প্রকার ال দ্বারা সরাসরি جنس -এর প্রতি ইংগিত হয়। অতঃপর قرينة দ্বারা একটি অস্পষ্ট ও অনির্ধারিত فرد -এর ধারণা লাভ হয়।

এ কারণেই এ ধরনের ال যুক্ত শব্দকে অর্থগত দিক থেকে نكرة ধরা হয়। ফলে نكرة -এর মতো এ শব্দকেও جملة -এর موصوف বানানো হয়। পক্ষান্তরে শব্দগতভাবে এটাকে معرفة ধরা হয়। ফলে তা مبتدأ ও ذو الحال হতে পারে। এবং معرفة এর صفة বা موصوف হতে পারে।

وَ لَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِيْ + فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قلتُ لا يَعْنِينِيْ

কখনো কখনো ইতর লোকের পাশ দিয়ে যাই যে আমাকে গালি দেয়, তখন আমি এ কথা বলে চলে যাই যে, সে আমাকে বলছে না।

এ কবিতা সম্পর্কেও একই কথা। দেখো, যদি কবি বলতেন أمر على لئيم তা হলে কোন সমস্যা হতো না। আমরা ধরে নিতাম যে, বাস্তবে বিদ্যমান কোন এক لئيم -এর কথা তিনি বলছেন। কিন্তু তার পরিচয় মনে না থাকায় نكرة শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু اللئيم বলাতে সমস্যা হয়েছে। এখন ال -এর যে কোন একটি অর্থ এখানে প্রয়োগ করতে হবে। استغراق তো হতে পারে না। কেননা সকলের পাশ দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তদ্রূপ العهد الخارجي হতে পারে না। কেননা নির্ধারিত ও পরিচিত হওয়ার কোন সূত্র এখানে নেই। তদ্রূপ الجنس বা الحقيقة উদ্দেশ্য হতে পারে না। কেননা فرد ছাড়া جنس ও حقيقة -এর আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই, যার পাশ দিয়ে যাওয়া কল্পনা করা যায়। সুতরাং বলতে হবে যে, কবি এখানে لئيم -এর جنس ও حقيقة উদ্দেশ্য করেছেন, তবে তা কল্পনায় বিদ্যমান একটি অস্পষ্ট فرد -এর আকারে বিদ্যমান রয়েছে। আর কল্পনার এই فرد টি বাস্তবের যে কোন فرد -এর উপর প্রযুক্ত হতে পারে; বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে لام العهد الذهني বলে। আল্লাহ আমাদেরকে নির্ভুল রূপে বোঝার তাওফীক দান করুন। আমীন।

এবার তুমি চেষ্টা করে দেখো, নীচের কবিতায় বিদ্যমান الغراب কে এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারো কি না।

وَ مَنْ طَلَبَ العلومَ بِغَيرِ كَدٍّ + سَيُدْرِكُها مَتَى شابَ الغرابُ

বিনা পরিশ্রমে যারা ইলমের সন্ধান পেতে চায় তারা তা পাবে যখন কাক সাদা হবে তখন।

নির্ধারিত কোন বাজারের কথা তোমার চিন্তায় নেই, এমতাবস্থায় যদি বল

اِذهبْ إلى السوق وَ اشْتَرِ حاجاتِكَ

তাহলে السوق দ্বারা কি উদ্দেশ্য হবে ব্যাখ্যা করো।

خلاصة الكلام

الغرضُ من المعرَّفِ باللامِ الإشارَةُ إلى الجنسِ وَ الحقيقةِ بلا نَظَرٍ إلى الأَفْرادِ و يُسَمّٰى لامَ الجنسِ، مثاله الإنسان حيوان ناطق و الذهب أثمن من الفضة .

أَوِ الإشارةُ إلىٰ الجِنْسِ في ضِمْنِ فَردٍ مُبْهَمٍ (موجودٍ) في الذهنِ، مثاله أَخافُ أن يأكلَه الذئبُ . فَالإشارةُ هنا إلى حقيقةِ الذئبِ، الموجودَةِ في الذهنِ في ضِمْنِ فردٍ مُبْهَمٍ . و يُسَمّٰى لامَ العهدِ الذهنيِّ .

أَوِ الإشارَةُ إلى فردٍ مُعيَّنٍ من أفرادِ الجِنْسِ، وَ تَعْيِيْنُه بِتَقْديمِ ذِكْرِه أو بِحُضورِهِ أو بِمَعْرِفَةِ السامعِ له و يُسَمّٰى لامَ العَهْدِ الخارجي .

أَوِ الإشارَةُ إلى جميعِ أفرادِ الجِنْسِ . مثاله إنَّ الإنسانَ لَفِيْ خُسْرٍ، و يُسَمّٰى لامَ الاستغراقِ .

و إذا وَقَعَ المُحَلّٰى بِأَلْ خبرًا أَفادَ القَصْرَ . مثاله و هو الغفور الودود .

المُعَرَّفُ بِلَامِ العَهْدِ الذهني كالنَّكِرَةِ في المَعْنَى، فَيُعَامَلُ مُعامَلَتها، فَيُوْصَفُ بِالجُمْلَةِ كما تُوْصَفُ بِها النكرةُ و أَمَّا في اللَّفْظِ فتجري عليه أَحْكامُ المعرفةِ فيقع مبتدأً و ذا حالٍ و وصفًا للمعرفةِ و موصوفًا بها .

و الفرقُ بين المعرَّفِ بهذا اللامِ و بينَ النكرةِ أن المقصودَ من النكرةِ فَرْدٌ غيرُ مُعيَّنٍ و المقصودَ بالمعرَّفِ بهذه اللامِ الجنسُ وَ الحَقِيقَةُ و يُقْصَدُ الفَرْدُ المُبْهَمُ بِسَبَبِ القَرِيْنَةِ .

الإضافة

ইতিপূর্বে নাহ্‌বের কিতাবে তোমরা إضافة -এর পরিচয় জেনেছো এবং এ কথাও জেনেছো যে, إضافة দুই প্রকার। যথা إضافة لفظية ও إضافة معنوية

إضافة لفظية -এর ক্ষেত্রে مضاف إليه মূলতঃ مضاف -এর فاعل বা مفعول به হয়ে থাকে। যথা–

أنتَ حَسَنُ الخُلُقِ، هو مَهْضومُ الحَقِّ، أنا طالِبُ عِلمٍ

এগুলোর মূলরূপ হলো–

أنت حَسَنٌ خلقُك، هو مهضومٌ حَقُّه، أنا طالبٌ علمًا

আর إضافة لفظية -এর উদ্দেশ্য শুধু مضاف থেকে تنوين এবং দ্বিবচন ও বহুবচনের نون বিলুপ্ত করার মাধ্যমে শব্দগত সহজতা সৃষ্টি করা। এই প্রকার ইযাফত مضاف কে মারেফা করে না কিংবা বিশিষ্টও করে না। পক্ষান্তরে إضافة معنوية দ্বারা مضاف কে معرفة তে রূপান্তরিত করা হয় কিংবা বিশিষ্ট করা হয়। তা ছাড়া এই প্রকার إضافة -এর ক্ষেত্রে مضاف إليه ও مضاف এর মাঝে في، من، ل এই তিনটি حرف الجر -এর কোন একটি উহ্য থাকে। যেমন–

إمامُ المسجدِ এর মূল রূপ إمامٌ للمسجدِ
سوارُ ذهبٍ এর মূল রূপ سوارٌ من ذهبٍ
عَملُ الصباحِ এর মূল রূপ عملٌ في الصباحِ

مضاف إليه যদি معرفة হয় তাহলে مضاف ও معرفة তে রূপান্তরিত হবে। তবে مضاف চূড়ান্ত পর্যায়ের অস্পষ্ট শব্দ হলে إضافة দ্বারা মারেফা হবে না। উদাহরণ স্বরূপ غير শব্দটি পেশ করা যেতে পারে। তদ্রূপ مضاف إليه যদি نكرة -এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ضمير হয় তাহলে إضافة দ্বারা مضاف টি মারেফা হবে না। পক্ষান্তরে مضاف إليه যদি نكرة হয় তাহলে উদ্দেশ্য হবে مضاف কে বিশিষ্ট করা।

এ কথাগুলো তোমরা نحو -এর কিতাবেই জেনে এসেছো।

আমরা এখানে বালাগাতের দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে চাই যে, কি কি উদ্দেশ্যে কোন শব্দকে مضاف রূপে ব্যবহার করা হয়। মনে রাখতে হবে যে, إضافة لفظية নয়; শুধু إضافة معنوية হলো বালাগাতের আলোচ্য বিষয়।

জাফর বিন উলবা হারেছী অতি উঁচু স্তরের কবি। কোন কারণে তিনি একবার মক্কায় বন্দী হয়ে পড়েন। তখন তার প্রেমাস্পদ নিঃসংগ অবস্থায় এক ইয়ামানী কাফেলার সাথে ফিরে গিয়েছিলো। কবি জেলখানায় বসে সেই মর্মান্তিক দৃশ্য কল্পনা করছিলেন এবং নীচের কবিতা পংক্তিতে তিনি তার মনের দুঃখ এভাবে ব্যক্ত করলেন–

هَوايَ معَ الرَّكْبِ اليَمانِينَ مُصْعِدٌ + جَنِيبٌ وَ جُثْمانِي بِمكةَ مُوْثَقُ

আমার প্রেমাস্পদ ইয়ামানী কাফেলার সংগে তাদের অনুগত হয়ে ইয়ামানের পথে যাত্রা করেছে অথচ আমার দেহ মক্কায় শৃংখলিত।

هَوًى অর্থ প্রেম ও ভালোবাসা। এখানে مصدر কে مَهْوِيٌّ এই اسم المفعول অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন زيد عدل বাক্যে عدل কে عادل অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

দেখো, এখানে الذي أهواه দ্বারাও কবি তার প্রেমাস্পদের কথা বলতে পারতেন, কিন্তু তাতে إضافة -এর সংক্ষিপ্ততা পাওয়া যেতো না। অথচ স্থানটি সংক্ষিপ্ততা দাবী করে। তাছাড়া هواي দ্বারা যে অর্থময়তা এসেছে الذي أهواه দ্বারা তা হতো না।

মোটকথা, এখানে إضافة -এর উদ্দেশ্য হচ্ছে اختصار ও ايجاز এবং বর্তমান স্থান সেটাই দাবী করছে।

مصعد – أَصْعَدَ অর্থ ঊর্ধ্বভূমিতে গমন করল। مصعد হচ্ছে তার اسم الفاعل – কবির প্রেমাস্পদ মক্কা থেকে য়ামানের পথে যাচ্ছিল, আর মক্কা-ইয়ামান থেকে ঢালুতে তাই مصعد শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

جنيب হলো ঐ বাহন যা মূল বাহনের সাথে টেনে নেয়া হয় এবং মূল বাহনকে বিশ্রাম দেয়ার জন্য মাঝে মধ্যে তাতে আরোহণ করা হয়। যেহেতু কবির প্রেমাস্পদ কাফেলার অনুগত রূপে অসহায়ভাবে যাত্রা করেছিলেন সেহেতু তার জন্য جنيب শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

২. এবার নীচের উদাহরণ দু'টি দেখো–

(ক) أَجْمَعَ علماءُ المسلمين على قَطْعِ يَدِ السارقِ

(খ) أَهْلُ الحَيِّ كِرامٌ

দেখো, এখানে প্রত্যেক আলিমের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব ব্যাপার, কেননা, তাদের সংখ্যা তো হবে লক্ষ লক্ষ। কিন্তু علماء المسلمين এই إضافة সকল আলিমকে সহজে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। পক্ষান্তরে মহল্লার অধিবাসীদের নাম উল্লেখ করা অসম্ভব না হলেও কঠিন। কিন্তু এই إضافة সকল অধিবাসীকে সহজেই অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। মোটকথা উদ্দিষ্ট সকলকে গণনা করা অসম্ভব বা কঠিন হওয়ার কারণে সহজ উপায় হিসাবে إضافة ব্যবহার করা হয়।

৩. মনে করো, শহরের গণ্যমান্য লোক উপস্থিত হয়েছেন। এখন তুমি যদি নাম ধরে বলতে থাকো যে, অমুক অমুক এসেছেন তাহলে নাম আগে পরে বলার কারণে সমস্যা হতে পারে। কিন্তু তুমি যদি إضافة করে বলো– حضر أعيان المدينة তাহলে কোন সমস্যা হবে না। উল্লেখের ক্ষেত্রে অগ্র-পশ্চাৎ করার দায়িত্ব এড়ানোর জন্য এভাবে إضافة -এর আশ্রয় গ্রহণ করা হয়।

৪. إضافة -এর আরেকটি উদ্দেশ্য হলো مضاف এর কিংবা مضاف إليه এর কিংবা তৃতীয় কারো মর্যাদা প্রকাশ করা। নীচের উদাহরণগুলো দেখো,

الكعبة بيت الله – এখানে আল্লাহর সাথে সম্পৃক্তি দ্বারা بيت -এর মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। নীচের আয়াত সম্পর্কেও একই কথা–

سُبْحانَ الذي أَسْــرٰى بِعَبْدِهِ ليلًا مِنَ المسجدِ الحرامِ إلى المسجدِ الأَقْصٰى الذي باركنا حوله ·

এখানে عبد এর মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে।

নীচের কবিতাটি দেখো, কবি فرزدق তার প্রতিদ্বন্দ্বী কবি জারীরের উদ্দেশ্যে গর্ব করে বলছেন–

أُولئك آبائِيْ فَجِئْنِي بِمِثْلِهِمْ + إذا جَمَعَتْنا يا جريرُ المَجامِعُ

এখানে إضافة -এর মাধ্যমে পূর্বপুরুষের পরিচয় দ্বারা নিজের মর্যাদা প্রকাশ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই মর্যাদা লোভী মানুষ বলে থাকে–

هذا القصرُ الشامِخُ قصري٠الوزير صديقي

কোন চেয়ারে বসে কেউ যদি বলে هذا كرسي الوزير তাহলে এই إضافة দ্বারা مضاف বা مضاف إليه -এর মর্যাদা উদ্দেশ্য হবে না; বরং তৃতীয় ব্যক্তির অর্থাৎ তার নিজের মর্যাদা প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হবে।

أتاني كتاب السلطان – বাক্যটি সম্পর্কেও এই কথা।

একই ভাবে مضاف কিংবা مضاف إليه অথবা তৃতীয় কারো অমর্যাদা প্রকাশের উদ্দেশ্যেও إضافة ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- ولد اللص قادم - এখানে مضاف কে অপদস্থ করা উদ্দেশ্য। যদি কারো কুড়ে ঘর সম্পর্কে বলো- أَعْجَبَنِيْ قصرُك هذا তাহলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, مخاطب কে তথা مضاف إليه কে লজ্জিত করা তোমার উদ্দেশ্য। هذا رفيقُ اللصُّ বাক্যটি সম্পর্কেও একই কথা।

কেউ যদি গর্বিত ভংগিতে চেয়ারে বসে থাকে আর তুমি অবজ্ঞার হাসি হেসে বলো هذا كرسيُّ الحَلَّاقِ - এটা তো নাপিতের চেয়ার। তাহলে তোমার উদ্দেশ্য كرسي বা حلاق এর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা অবশ্যই নয়; লোকটিকে নাজেহাল করাই হলো উদ্দেশ্য।

৫. পিতার সংগে অসদ্ব্যবহারকারী পুত্রকে যদি বলো, هذا أبوك الذي رباك তাহলে এই إضافة -এর উদ্দেশ্য হবে সদাচরণে উদ্বুদ্ধ করা।

এ ধরণের আরো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে إضافة ব্যবহার করা হয়। বলাবাহুল্য যে, এই সকল অর্থ অন্য কোন প্রকার মারেফা দ্বারা প্রকাশ করা সম্ভব হতো না।

خلاصة الكلام

يُؤْتَى المضافُ لِمَعْرِفَةٍ لِأَغْراضٍ كثيرةٍ : منها :

الاختصارُ لِضِيْقِ المقامِ

و السلامَةُ مِنْ تَعْدادٍ معتعَذِّرٍ أو متعسِّرٍ

والخروجُ من تَبِعَةِ تقديمِ بعضٍ على بعضٍ

وَ الإشارَةُ إلَى تعظيمِ المضافِ أَوِ المضافِ إليه أو غَيْرِهما ·

و كذا الإشارةُ إلى تحقيرِ المضافِ أو المضافِ إليه أو غيرِهما ·

وَ التحريضُ على الإكرامِ أو البِرِّ،نحو هذا معلمك قادم ، و هذه أمك التى حمَلَتْكَ و وضَعَتْكَ كُرْهًا

و الاستهزاءُ و التهكم، نحو إنَّ رسولَكم الذي أرسِلَ إليكم لَمجنون *

النـكـرة

মনে করো, কোন ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে তুমি কিছু বলতে চাও তাহলে তোমার প্রথম কর্তব্য হবে উক্ত ব্যক্তি বা বস্তুটিকে تعريف -এর কোন একটি উপায় অবলম্বন করে مخاطَب -এর সামনে معرف ও পরিচিত রূপে তুলে ধরা। এ ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি বা বস্তুর علم ব্যবহার করা যেতে পারে কিংবা صلة ব্যবহার করা যেতে পারে কিংবা إضافة করা যেতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু এসব কিছুই যদি তোমার বা مخاطَب -এর জানা না থাকে তখন বাধ্য হয়েই উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুটিকে منكر রূপে অর্থাৎ অপরিচিত রূপে তোমাকে উল্লেখ করতে হবে। যেমন তুমি কাওকে বললে– جاء رجلٌ يَسْأَلُ عنكَ

যেহেতু লোকটির পরিচয় তুলে ধরার মতো কোন কিছু তোমার বা তোমার مخاطَب এর জানা নেই সেহেতু তোমাকে رجل এই منكر শব্দটি ব্যবহার করতে হয়েছে।

আবার এমনও হয় যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর পরিচয় তো জানা আছে। কিন্তু পরিচয় তুলে ধরার বিশেষ কোন ফায়দা নেই বলে منكر (বা অপরিচিত) রূপেই তাকে তুলে ধরা হয়। দেখো, হযরত মুসা (আঃ)-কে ফেরআউনের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে একজন লোক গোপনে এসে জানিয়ে দিয়েছিলো। লোকটির নাম ছিলো হাবীব নাজ্জার। কিন্তু লোকটির পরিচয় তুলে ধরার বিশেষ কোন ফায়দা নেই বলে আল্লাহ পাক নাকেরা শব্দ ব্যবহার করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

و جاء رجـلٌ مِنْ أَقْـصَى المدينةِ يَـسْـعَى *

নগর প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো।

আবার যদি খোদ مخاطَب থেকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুর পরিচয় গোপন করতে চাও তাহলেও তোমাকে منكر শব্দ ব্যবহার করতে হবে। যেমন কাওকে তুমি বললে–

قال لِيْ رجـلٌ إنَّكَ تـكذِبُ و تَـغْـتابُ .

এখানে তুমি লোকটির পরিচয় গোপন করছো, যাতে مخاطَب তাকে হয়রানি না করে। এ ছাড়া অন্য কোন কারণও থাকতে পারে।

নীচের আয়াতটি দেখো–

وَ عَلَى سَمْعِهِمْ وَ عَلَى أبصارِهم غِشَاوَةٌ، و لـهم عذابٌ عظيمٌ *

এখানে غشاوة শব্দটিকে منكر রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হলো এ দিকে ইংগিত করা যে, আবরণ ও পর্দা বলতে মানুষ সাধারণতঃ যা বুঝে এবং মানুষের পরিচিত যে সকল পর্দা ও আবরণ রয়েছে তা এখানে উদ্দেশ্য নয়, বরং বিশেষ এক প্রকার পর্দা ও আবরণ উদ্দেশ্য, যা মানুষের কাছে সাধারণভাবে পরিচিত নয়। আর তা হচ্ছে সত্যের প্রতি অন্ধত্বের পর্দা। তদ্রূপ عذاب শব্দটিকে منكر রূপে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হলো এ কথা বোঝানো যে, বিরাট বিরাট যত আযাব রয়েছে তন্মধ্যে এমন একপ্রকার বিরাট আযাব তাদের জন্য রয়েছে যার হাকীকত ও স্বরূপ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।

প্রচুরতা বা আধিক্য বোঝানোর জন্যও نكرة ব্যবহার করা হয়। যেমন কারো প্রশংসার উদ্দেশ্যে বলা হয় إنَّ له لَإبِـلاً و إنَّ له لَغَنَمًـا (তার উট ও বকরী বেশুমার)।

যেহেতু প্রশংসা হলো এ বাক্যের উদ্দেশ্য। আর উট ও বকরীর আধিক্য ছাড়া প্রশংসার উদ্দেশ্য সার্থক হয় না, সেহেতু বোঝা গেলো যে, এখানে আধিক্য প্রকাশের জন্য نكرة ব্যবহার করা হয়েছে।

قـالوا أ إنَّ لنا لَأجْـرًا আয়াতটি সম্পর্কেও একই কথা। কেননা এটাই স্বাভাবিক যে, জাদুকরেরা বিপুল পুরস্কার পাওয়ার আশা নিয়ে হাজির হয়েছে। সুতরাং বিপুল পুরস্কার পাওয়া যাবে কি না তাই তারা জানতে চাচ্ছে।

তদ্রূপ স্বল্পতা বোঝানোর জন্যও نكرة ব্যবহার করা হয়। যেমন–

لَو كانَ لنا مِنَ الأَمْرِ شَـيْءٌ ما قُتِلْنا هٰهُـنا *

আমাদের সামান্য মতামতও যদি গ্রহণ করা হতো তাহলে এখানে আমরা নিহত হতাম না।

و رِضـوانٌ من اللّٰهِ أكبَرُ এই আয়াতেও رضوان শব্দটি نكرة রূপে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বল্পতা বোঝানো। অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ হতে সামান্য সন্তুষ্টিও (জান্নাত ও তার যাবতীয় নেয়ামত হতে) বড়।

বড়ত্ব বা ক্ষুদ্রতা বোঝানোর জন্যও نكرة ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দেখো কবি মারওয়ান বিন হাফছ তার ممدوح -এর প্রশংসায় যে কবিতা বলেছেন তাতে একই শব্দকে একবার বড়ত্ব বোঝানোর জন্য, আরেকবার ক্ষুদ্রতা বোঝানোর জন্য منكر রূপে ব্যবহার করেছেন–

له حاجِبٌ عن كلِّ أَمرٍ يَشِيْنُه + و ليسَ له عَنْ طالِبِ العُرْفِ حاجِبُ

কবি বলতে চান, আমার মামদূহ এমনই নিষ্পাপ চরিত্রের মানুষ যে, কোন কলংক তার নিকটবর্তীও হতে পারে না। কেননা তা থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য অতি বড় ও মজবুত প্রহরা রয়েছে।

পক্ষান্তরে তিনি এমনই উদার ও দানশীল যে, সকলের জন্য তার দ্বার উন্মুক্ত। দানপার্থীরা সোজা তার সামনে গিয়ে হাজির হতে পারে। তাদেরকে বাধা দেয়ার মত ক্ষুদ্রতম কোন প্রহরাও নেই।

দেখো, প্রথমোক্ত حاجب এর অর্থ অতি বড় প্রহরা এবং দ্বিতীয়োক্ত حاجب -এর অর্থ ক্ষুদ্রতম প্রহরা না করা হলে প্রশংসার উদ্দেশ্য হাছিল হচ্ছে না।

خلاصة الكلام

يُؤْتٰى بِالنَّكِرَةِ إذ لم يُعْلَمْ لِلْمَذكورِ جهةٌ مِنْ جِهاتِ التعريفِ، مِنْ عَلَمٍ أو صِلَةٍ أو غيرِهما، و كذا إذا لم يَكُنْ في التعيينِ فائدةٌ ·

و قد يَختار المتكلمُ النكرةَ لأنه يقصِد بالتنكير التكثيرَ أو التقليلَ أو التعظيمَ أو التحقيرَ و التصغيرَ، و تَدلُّ القرائِنُ على هذه الأمورِ ·

و قد يَختار النكرةَ لاخفاءِ الأمر لِمَصْلَحةٍ مَّا كالخوفِ عليه أو التشويقِ إليه أَوِ انْتِظار المناسَبَةِ المُلائِمَةِ ·

الباب الخامس

فى التقييد

এ কথা তুমি জানো যে, جملة এর মাঝে বিদ্যমান إسناد -এর মূল স্তম্ভ হলো مسند إليه ও مسند – সুতরাং কোন جملة যখন مسند إليه ও مسند - এর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে তখন জুমলাস্থ إسناد বা حكم টি হয় নিঃশর্ত ও বন্ধন মুক্ত। পক্ষান্তরে তুমি যদি مسند إليه ও مسند -এর সাথে সম্পর্কিত কোন বিষয় উল্লেখ করো, কিংবা إسناد এর সাথে সম্পর্কিত কোন বিষয় উল্লেখ করো তাহলে إسناد বা حكم টি শর্তযুক্ত বা বন্ধনযুক্ত হয়ে পড়বে। উক্ত বিষয়টিকে قيد বলা হয়

উদাহরণ দেখো; أعطى راشد বাক্যটি مسند إليه ও مسند এর মাঝে সীমাবদ্ধ। এ বাক্যটি দ্বারা শুধু একটি إسناد সাব্যস্ত হয়েছে। অর্থাৎ শুধু রাশেদের দেওয়া সাব্যস্ত হয়েছে; অতিরিক্ত কোন বিষয় সাব্যস্ত হয়নি। যেমন, কাকে দিয়েছে, কি দিয়েছে, কবে দিয়েছে, এগুলো কিছুই জানা যায়নি। তদ্রূপ রাশেদেরও কোন অবস্থা জানা যায়নি। সুতরাং এ বাক্যের حكم বা إسناد হচ্ছে مطلق ও নিঃশর্ত। পক্ষান্তরে أعطى راشد خالدا বাক্যটি থেকে মূল إسناد -এর অতিরিক্ত একটি বিষয় জানা গেলো। অর্থাৎ রাশেদ কাকে দিয়েছে তা জানা গেলো। সুতরাং এ বাক্যে একটি قيد (বা বন্ধন) রয়েছে। পক্ষান্তরে أعطى راشد خالدا دينارا বাক্যটি থেকে অতিরিক্ত দু'টি বিষয় জানা গেলো অর্থাৎ কাকে দিয়েছে এবং কি দিয়েছে তা জানা গেলো। সুতরাং এ বাক্যে দু'টি قيد রয়েছে। এ قيد দু'টি مسند এর সাথে সম্পর্কিত।

আবার দেখো, উপরের বাক্যগুলোতে مسند সম্পর্কে দু'টি قيد উল্লেখ করা হলেও مسند إليه সম্পর্কে কোন قيد উল্লেখ করা হয়নি। পক্ষান্তরে أعطى راشد السخي বাক্যে مسند إليه -এর সাথে সম্পর্কিত একটি قيد উল্লেখ করা হয়েছে, যার দ্বারা মূল إسناد -এর বাইরে مسند إليه সম্পর্কে অতিরিক্ত একটি বিষয় জানা গেলো।

আশা করি, এ কথাও তুমি বুঝতে পেরেছো মূল إسناد -এর সংগে مسند বা مسند إليه সম্পর্কিত যত বেশী قيد যুক্ত হবে إسناد -এর উপকারিতা ততবেশী বৃদ্ধি পাবে এবং এ সম্পর্কে مخاطب এর জ্ঞান তত সমৃদ্ধ হবে।

مسند ও مسند إليه সম্পর্কিত قيد তুমি দেখেছো, এবার নীচের বাক্যটি দেখো, إن ذهبت ذهب خالد (তুমি গেলে খালেদ যাবে।) এখানে مسند ও مسند إليه দু'টো অংশই مطلق – কোন অংশেই কোন قيد নেই। পক্ষান্তরে ذهاب خالد এই حكم টি مطلق বা নিঃশর্ত নয়। কেননা ذهاب خالد এই হুকুমটি সাব্যস্ত হওয়া নির্ভর করছে তোমার যাওয়ার উপর। সুতরাং বোঝা গেলো যে, إن ذهبت এ শর্তটি ذهب خالد বাক্যে বিদ্যমান إسناد -এর জন্য قيد রূপে যুক্ত হয়েছে।

ذهب خالد বাক্যটির مسند ও مسند إليه এবং إسناد এই তিনটি مطلق বা বন্ধনমুক্ত হয়েছে। কিন্তু ذهب خالد إلى المدينة বাক্যে مسند টি مقيد বা বন্ধনযুক্ত হয়েছে। তদ্রূপ ذهب خالد ماشيا বাক্যে مسند إليه টি مقيد হয়েছে। পক্ষান্তরে إن ذهبت ذهب خالد বাক্যে ذهب خالد বাক্যের إسناد টি مقيد হয়েছে।

মোটকথা, তুমি যদি مخاطب কে শুধু বাক্যস্থ حكم বা إسناد সম্পর্কে অবগত করতে চাও আর অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে নিরবতা অবলম্বন করতে চাও এবং مخاطب কে যা কিছু ইচ্ছা ভাববার সুযোগ দিতে চাও তাহলে তুমি قيد মুক্ত জুমলা ব্যবহার করবে। পক্ষান্তরে যদি مسند বা مسند إليه বা إسناد সম্পর্কে অতিরিক্ত কোন বিষয় জানাতে চাও তাহলে প্রয়োজনীয় قيد ব্যবহার করবে। যেমন ধরো, তুমি শুধু حضور راشد সম্পর্কে مخاطب কে খবর দিতে চাও। কবে এসেছে, কিভাবে এসেছে ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে কিছুই বলতে চাও না তাহলে শুধু مسند ও مسند إليه সম্বলিত مطلق বাক্য বলবে। যেমন حضر راشد

পক্ষান্তরে যদি مخاطب কে মূল إسناد এর অতিরিক্ত কোন বিষয় জানানো তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে উক্ত বিষয় দ্বারা مقيد করে বাক্যটি বলতে হবে। অবশ্য উক্ত قيد এর সম্পর্ক مسند বা مسند إليه এর সাথে হতে পারে, আবার إسناد -এর সাথেও হতে পারে। উপরে তিনোটির উদাহরণ দেয়া হয়েছে।

মনে রেখো, যদিও جملة -এর মূল স্তম্ভ হলো مسند ও مسند إليه এবং قيد গুলো হচ্ছে অতিরিক্ত বিষয়, কিন্তু এ সমস্ত قيد কখনো কখনো খুবই গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করে। এমন কি قيد উল্লেখ না করলে বাক্যের উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যেতে পারে কিংবা বক্তব্যটি মিথ্যা হয়ে যেতে পারে। নীচের আয়াতটি দেখো–

و ما خلقنا السمٰوٰت و الأرض و ما بينهما لاعبين *

এখানে مسند ও مسند إليه সম্বলিত মূল বাক্য হচ্ছে خلقنا (ما) আর السمٰوٰت و الأرض و ما بينهما গুলো হচ্ছে قيد – এ قيد গুলো অতিরিক্ত ফায়দা দান করছে বটে, তবে এ গুলো উল্লেখ না করলেও বাক্যের মূল বক্তব্য অক্ষুণ্ন থাকবে। কিন্তু لاعبين এমন একটি قيد যা উল্লেখ না করলে সমগ্র বক্তব্যটাই পণ্ড ও মিথ্যা হয়ে যাবে। কেননা তখন অর্থ হবে আসমান যমীন এবং তাদের মধ্যবর্তী বস্তুগুলো আমি সৃষ্টি করিনি। (نعوذ بالله) অথচ আল্লাহ বলতে চান এগুলো আমি সৃষ্টি করেছি। তবে (ক্রীড়াচ্ছলে ও) উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করিনি।

একটি বাক্যে مسند ও مسند إليه-এর অতিরিক্ত যে সকল قيد উল্লেখ করা হয় সেগুলো প্রধানতঃ مفاعيل – توابع ও شرط – এই তিন প্রকার হয়ে থাকে।

যদি তুমি مسند তথা فعل এর وقوع-এর পাত্র সম্পর্কে مخاطب কে জ্ঞান দান করতে চাও তাহলে مفعول به দ্বারা مسند কে বন্ধনযুক্ত করবে। তদ্রূপ وقوع المسند এর স্থান বা কাল সম্পর্কে যদি مخاطب কে জ্ঞান দান করতে চাও তাহলে ظرف দ্বারা مسند কে বন্ধনযুক্ত করবে। তদ্রূপ যদি وقوع المسند-এর কারণ বা উদ্দেশ্য সম্পর্কে مخاطب কে জ্ঞান দান করতে চাও তাহলে مفعول له দ্বারা مسند কে বন্ধনযুক্ত করবে।

তদ্রূপ যদি مخاطب-এর সামনে وقوع المسند-এর বিষয়টিকে জোরালো রূপে তুলে ধরতে চাও কিংবা وقوع المسند-এর সংখ্যা জানাতে চাও কিংবা وقوع المسند ধরন জানাতে চাও তাহলে مسند কে مفعول مطلق দ্বারা বন্ধনযুক্ত করবে।

তদ্রূপ যদি وقوع المسند-এর সময় مسند إليه-এর معية সম্পর্কে বা مسند إليه-এর حال সম্পর্কে مخاطب কে জ্ঞান দান করতে চাও তাহলে مفعول معه ও حال দ্বারা مسند বা فعل কে বন্ধনযুক্ত করবে।

এগুলো হচ্ছে আলোচ্য قيد ও বন্ধন সমূহের সাধারণ উদ্দেশ্য যা نحو-এর

কিতাবে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

তবে একজন بليغ আরো সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যও এ সমস্ত قيد ব্যবহার করে থাকেন। এগুলোর সম্পর্ক আগাগোড়া বালাগাতশাস্ত্রের সংগে।

এখানে আমরা বিভিন্ন قيد উল্লেখ করার বালাগাতশাস্ত্রীয় কতিপয় সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য আলোচনা করবো। নীচের কবিতাটি দেখো–

وَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَبْكِيَ دمًا لَبكيتُه + عليهِ و لكنْ ساحةُ الصَّبْرِ أَوْسَعُ

দেখো, কবি ইচ্ছা করলে أن أبكي এই مفعول به উল্লেখ না করে شئت বাক্যটিকে مطلق রেখে و لو شئتُ لبكيت عليه دمًا বলতে পারতেন। তদ্রূপ دما এই مفعول به কে উল্লেখ না করে أبكي বাক্যটিকে مطلق রেখে و لو شئتُ أن أبكيَ لبكيتُ عليه دمًا বলতে পারতেন। তাতে ভাব ও বক্তব্যে কোন ত্রুটি হতো না। কিন্তু একটি সূক্ষ্ম ভাবগত কারণে কবি এখানে قيد উল্লেখ করেছেন। কারণ এই যে, কবির অন্তরে প্রিয়জনের মৃত্যুশোক যে রক্তাশ্রু বর্ষণের মত গুরুতর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে সে কথা কবি তার শ্রোতার সামনে যথাসম্ভব দ্রুত প্রকাশ করে বুক হালকা করতে চান। তাই কবি دما বা রক্তাশ্রু কথাটা প্রথম সুযোগেই উল্লেখ করেছেন। এজন্য প্রথমে তিনি شئت এর মাফউলে বিহী أن أبكي উল্লেখ করেছেন এবং أبكي -এর সংলগ্ন পরে دما উল্লেখ করেছেন। এটা না করলে তাকে لبكيت -এর পরে عليه বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো।

নীচের বাক্যটি দেখো, جاء علية القوم راكبين – এখানে حال এর قيد উল্লেখ করার সাধারণ উদ্দেশ্য তো হলো وقوع المسند -এর সময় مسند إليه -এর কি অবস্থা ছিলো তা প্রকাশ করা। কিন্তু এমনও হতে পারে যে, متكلم ইংগিতে এ কথা বোঝাতে চান যে, যারা বাহনে করে আসেনি তারা গোষ্ঠীর বিশিষ্ট ব্যক্তি নয়।

তাছাড়া ذكر প্রসংগে যে সকল উদ্দেশ্য আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো এখানে স্মরণ করা যেতে পারে।

التقييد بالتوابع

توابع দ্বারা مقيد করার বিভিন্ন উদ্দেশ্যের কথা كتب النحو এ আলোচনা করা হয়েছে। তাই এখানে আমরা এ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করছি।

التقييد بالنعت এর উদ্দেশ্য

موصوف যদি معرفة হয় তাহলে نعت এর উদ্দেশ্য হলো موصوف কে অন্যান্য থেকে পৃথক করা এবং তার পরিচয় পূর্ণ রূপে স্পষ্ট করে দেয়া। নীচের উদাহরণ দেখো–

فَتحُ البارِى هو تالِيفُ ابنِ حَجَرٍ أَحْمَدَ العسقلانِيِّ و تحفةُ المحتاجِ هو تالِيفُ ابنِ حَجَرٍ أحمدَ الهَيْتَمِيِّ .

দেখো, উভয় ব্যক্তিত্বকে পরস্পর থেকে পৃথক করার জন্য العسقلاني ও الهيثمي শব্দ দু'টিকে وصف রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

তদ্রূপ রাশেদ যদি দু'জন থাকে, একজন লেখক অন্যজন লেখক নয়; আর তুমি যদি বলো جاء راشدٌ الكاتِبُ তাহলে তোমার উদ্দেশ্য হবে লেখক রাশেদকে অলেখক রাশেদ থেকে পৃথক করা।

আবার দেখো, جسم বলা-ই হয় দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতাবিশিষ্ট বস্তুকে। সুতরাং তুমি যদি বলো–

الجسمُ الطويلُ العريضُ العميقُ يَشْغَلُ حَيِّزًا مِنَ المَكانِ

দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতাবিশিষ্ট বস্তু কোন না কোন স্থান অধিকার করে থাকে।

তাহলে نعت দ্বারা مقيد করার উদ্দেশ্য হবে শুধু جسم -এর হাকীকত ও পরিচয় খোলাসা করা এবং স্পষ্ট রূপে তুলে ধরা।

পক্ষান্তরে موصوف যদি نكرة হয় তাহলে উদ্দেশ্য হবে موصوف -এর ব্যাপকতাকে সংকুচিত করা। যেমন, جاء رجل দ্বারা শ্রোতা যে কোন লোকের আসার কথা ভাবতে পারে। কিন্তু যদি বলো جاء رجل عالم তাহলে আলেম নয় এমন লোকেরা শ্রোতার চিন্তা থেকে বাদ যাবে। কেননা رجل -এর প্রয়োগ ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে গেছে। মোটকথা, موصوف মারেফা হলে نعت -এর উদ্দেশ্য হবে الكشفُ عن حقيقةِ الموصوفِ কিংবা تَمييزُ الموصوفِ عن غيرِه

পক্ষান্তরে موصوف নাকেরাহ হলে نعت -এর উদ্দেশ্য হবে تخصيص الموصوف

এ ছাড়া আরো কিছু উদ্দেশ্য রয়েছে, যথা–

১. منعوت -এর প্রশংসা করা, উদাহরণ– بسم الله الرحمن الرحيم

২. منعوت এর নিন্দা করা, উদাহরণ– اعوذ باللهِ مِنَ الشيطانِ الرجيمِ

৩. করুণা প্রকাশ করা, উদাহরণ– جاء خالدٌ المِسكينُ

নীচের আয়াতটি দেখো–

فإذا نُفِخَ في الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ

এখানে تاء الوحدة -এর কারণে نفخة শব্দটি নিজেই একত্বের অর্থ প্রকাশ করছে। সুতরাং واحدة বলার উদ্দেশ্য হলো একত্বের অর্থকে শুধু জোরদার করা। সুতরাং আয়াতের তরজমা হবে, যখন শিংগায় একটি মাত্র ফুঁক দেয়া হবে।

تلك عَشَرَةٌ كامِلَةٌ বাক্যের كاملة শব্দটি সম্পর্কেও একই কথা।

التقييد بالتوكيد এর উদ্দেশ্য

তাকীদ দ্বারা বন্ধনযুক্ত করার সাধারণ উদ্দেশ্য তো হলো শ্রোতা যেন متبوع থেকে শিথিল ও রূপক অর্থ বোঝার সুযোগ না পায়। যেমন ধরো جاء الوزير বাক্য থেকে শ্রোতা ভাবতে পারে যে, আসলে মন্ত্রী স্বয়ং আসেননি, বরং তার নায়েব এসেছে, বক্তা এখানে শিথিল অর্থে الوزير ব্যবহার করেছে। কিন্তু جاء الوزير نفسه বললে শিথিল অর্থ গ্রহণের অবকাশ থাকে না।

তদ্রূপ শ্রোতা ভাবতে পারে যে, মন্ত্রী এখনো আসেননি বরং এক্ষুণি এসে পড়বেন এ জন্য হয়ত বক্তা শিথিল অর্থে جاء ব্যবহার করেছে। কিন্তু جاء جاء বলা হলে শিথিল অর্থ গ্রহণের অবকাশ থাকে না। অর্থাৎ বাক্যের যে অংশটিতে শ্রোতা শিথিল অর্থ গ্রহণ করতে পারে বলে আশংকা হয় সে অংশটাকেই توكيد দ্বারা مقيد করা হয়।

তদ্রূপ তুমি বলতে চাও যে, সকল ছাত্র উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু حضر التلاميذ বাক্য থেকে শ্রোতা ভাবতে পারে যে, অধিকাংশ ছাত্র হয়ত এসেছে। তাই বক্তা শিথিল অর্থে التلاميذ শব্দ ব্যবহার করেছে। কিন্তু حضر التلاميذ كلهم বললে শিথিল অর্থ গ্রহণের কোন অবকাশ থাকে না। মোটকথা, إسناد -এর কোন অংশ সম্পর্কে শিথিল অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা থাকতে পারে, আবার কোন শব্দের সামগ্রিকতা সম্পর্কে শিথিল অর্থ গ্রহণের সম্ভাবনা থাকতে পারে, توكيد দ্বারা তা দূর করা হয়। এগুলো হচ্ছে توكيد দ্বারা كلام কে مقيد করার সাধারণ উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে নিছক বালাগাতসংক্রান্ত কিছু উদ্দেশ্যও রয়েছে। যেমন ধরো–

ارحموا ارحموا من في الأرض এখানে উদ্দেশ্য শ্রোতাকে উদ্বুদ্ধ করা।

তদ্রূপ قتلت الآعداء كلهم – এখানে উদ্দেশ্য হলো গর্ব ও বীরত্ব প্রকাশ। ইত্যাদি।

التقييد بعطف البيان এর উদ্দেশ্য

عطف البيان -এর সাধারণ উদ্দেশ্য হলো শুধু متبوع -এর অস্পষ্টতা ও অপরিচয় দূর করা এবং শ্রোতার সামনে তাকে অধিকতর পরিচিত করে তোলা। উদাহরণ দেখো–

كان الشيخُ محمَّدُ اللّٰهِ شمسَ الهدايةِ في سَماءِ بنغلاديش

বাংলাদেশের আকাশে মুহম্মদুল্লাহ হেদায়াতের সূর্য ছিলেন।

মুহম্মদুল্লাহ নামটি শ্রোতার নিকট তেমন পরিচিত নয়, তাই আলোচ্য বাক্য দ্বারা উক্ত নামের মহান ব্যক্তিটি শ্রোতার সামনে স্পষ্ট হলো না। কিন্তু তুমি যদি বলো–

كان محمدُ اللّٰهِ حافظجي حضور شمسَ الهدايةِ في سَماءِ بنغلاديش

তাহলে নামের অপরিচয় দূর হয়ে যাবে। কেননা মুহম্মদুল্লাহ নামের মহান ব্যক্তিটি হাফেজ্জী হুজুর নামে অধিক পরিচিত। বলাবাহুল্য যে, محمد الله নামের পরে হাফেজ্জী হুজুর কথাটা যোগ করার উদ্দেশ্য শুধু পূর্বোক্ত নামের অপরিচয় দূর করা এবং আলোচ্য ব্যক্তিকে শ্রোতার সামনে পরিচিত করো তোলা। তবে একজনকে অন্যজন থেকে পৃথক করার উদ্দেশ্যও থাকতে পারে, যেমন نعت -এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। উদাহরণ দেখো, বিখ্যাত কয়েকজন ছাহাবীর নাম হলো আব্দুল্লাহ এবং তাদের এ নাম অপরিচিত নয়। কিন্তু শুধু আব্দুল্লাহ বললে বোঝা যাবে না যে, কোন্ আব্দুল্লাহ উদ্দেশ্য। তাই বলা হয়– عبد الله بن عمر কিংবা عبد الله بن عباس কিংবা عبد الله بن مسعود কিংবা عبد الله بن الزبير বলাবাহুল্য যে, এই عطف البيان গুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে এক আব্দুল্লাহকে অন্য আব্দুল্লাহ থেকে পৃথক করা।

মোটকথা, প্রথম উদাহরণে عطف البيان -এর উদ্দেশ্য হচ্ছে متبوع -এর অপরিচয় দূর করা। আর দ্বিতীয় উদাহরণে প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে تمييز বা পৃথক করা।

عطف البيان ব্যবহারের পিছনে বালাগাতশাস্ত্রীয় বিভিন্ন উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। যেমন শুধু প্রশংসা করা, নিন্দা করা, গর্ব করা ইত্যাদি। উদাহরণ দেখো,

جَعَلَ اللّٰهُ الكَعْبَةَ البيتَ الحرامَ قِيامًا لِلنَّاسِ.

এখানে الكعبة নামটি নিজস্বভাবেই সুপরিচিত। সুতরাং এখানে إيضاح (বা পরিচায়ন) উদ্দেশ্য হতে পারে না, বরং البيت الحرام বা পবিত্র ঘর বলে الكعبة -এর প্রশংসা করাই হলো উদ্দেশ্য।

নীচের উদাহরণটি দেখো, أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ

কাফফারা শব্দটি অর্থগতভাবে অপরিচিত নয়। তবে কাফফারা আদায়ের কয়েকটি ছুরত রয়েছে। এখানে طعام مساكين দ্বারা كفارة -এর পরিধি সংকোচন করে একটি ছুরতকে খাছ করা হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, متبوع নাকেরা হলে عطف البيان -এর উদ্দেশ্য হবে تخصيص (বা সংকোচন)।

التقييد بالبدل -এর উদ্দেশ্য

بدل -এর সাধারণ উদ্দেশ্য তো হলো تقرير বা সুদৃঢ়করণ। কেননা বদলযুক্ত বাক্য অর্থগতভাবে দু'টি إسناد ধারণ করে। যেমন– جاء صديقي راشد অর্থগতভাবে جاء صديقي ও جاء راشد -এর স্থলবর্তী।

তবে একজন بليغ আরো নিগূঢ় উদ্দেশ্যে بدل ব্যবহার করে থাকেন।

যেমন প্রথমে সংক্ষিপ্ত বা অস্পষ্ট বা সাধারণ আকারে বিষয়টি উপস্থাপন করে পবরর্তীতে ব্যাখ্যা করা কিংবা স্পষ্ট করা কিংবা বিশিষ্ট করা। এভাবে শ্রোতার অন্তরে বিষয়টির রেখাপাত ঘটানো উদ্দেশ্য হয়। আর এটা সাধারণতঃ بدل الكل -এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। উদাহরণ দেখো–

أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمون –

এখানে কি দ্বারা আল্লাহ সাহায্য করেছেন তা অস্পষ্ট রেখেছেন; যাতে শ্রোতার অন্তরে বিষয়টি জানবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অতঃপর বলা হয়েছে– أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَ بَنِيْنَ – ফলে সম্পদ ও সন্তান যে আল্লাহর বড় নেয়ামত তা শ্রোতার অন্তরে বিশেষভাবে রেখাপাত করবে। শুরুতে স্পষ্ট করে বলা হলে তা ততটা রেখাপাত করতো না।

আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন বস্তুর অংশবিশেষের গুরুত্ব প্রকাশ করা। এটা

بدل البعض -এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

তদ্রূপ আরেকটি উদ্দেশ্য হতে পারে গুরুত্ব প্রকাশের জন্য মূলকে আগে উল্লেখ করা। অতঃপর বক্তব্যের আসল উদ্দেশ্যকে উল্লেখ করা। দেখো, نفعني المعلم علمه এবং علم المعلم উভয় বাক্যের বক্তব্য অভিন্ন। কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যটিতে بدل ব্যবহারের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে علم -এর মূল যিনি তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা। এটা সাধারণতঃ بدل الاشتمال -এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

التقييد بضمير الفصل

مسند إليه কে ضمير الفصل দ্বারা বন্ধনযুক্ত করার বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে। যেমন পরবর্তী مسند টি مسند إليه -এর মাঝেই সীমাবদ্ধ এ কথা বোঝানো। উদাহরণ দেখো–

أَ لَمْ يعلَموا أَنَّ اللّٰهَ هو يَقْبَلُ التوبةَ عن عبادِه و أَن اللّٰهَ هو التَّوَّابُ الرحيم

এখানে هو শব্দটি এ কথা বোঝাচ্ছে যে, قبول التوبة আল্লাহর মাঝে সীমাবদ্ধ; আল্লাহ ছাড়া তাওবা কবুল করার অন্য কেউ নেই। هو অব্যয়টি ছাড়া قصر বা বিশিষ্টতা বোঝা যেতো না।

যদি কোন বাক্যে قصر বা বিশিষ্টতা বোঝানোর অন্য কোন মাধ্যম থেকে থাকে তাহলে ضمير الفصل -এর উদ্দেশ্য হবে قصر কে অধিকতর জোরদার করা। পূর্বোক্ত উদাহরণের দ্বিতীয় অংশটি দেখো, এখানে إسناد -এর উভয় অংশ মারেফা হওয়ার কারণে قصر বা বিশিষ্টতা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং مسند إليه কে ضمير الفصل দ্বারা مقيد করার উদ্দেশ্য হবে قصر কে অধিকতর জোরদার করা।

خلاصة الكلام

أصلُ الإسنادِ هو المُسْنَدُ و المسْنَدُ إليه، فإذا اقْتُصِرَ في الجملةِ على ذِكْرِ المسنَدِ و المسنَدِ إليه فَالحُكْمُ مُطْلَقٌ . و إذا زِيدَ عليهما ما يَتَعَلَّقُ بِأَحَدِهما أَوْ بِالإسْنادِ فالحكمُ مقيَّدٌ .

و يكونُ التقيِيْدُ لِزيادَةِ الفائدَةِ، و بعضُ القُيودِ يكون مقصودًا بالذاتِ،

فيكونُ الكَلامُ بِدونه كاذبًا، مثاله قوله تعالى و ما خَلقْنا السمٰوٰتِ و الأرضَ و ما بينهما لاعِبين .

و يكونُ التقيِيْدُ بالمفَاعِيلِ و نحوِها و بالتوابِعِ و بِضَميرِ الفَصْلِ و بالشرْطِ و بالنواسِخِ .

فالمراد بالمفعول به بَيانُ ما وَقَعَ عليه الفِعْلُ .

وَ بالمفعولِ فيه بيانُ الزّمانِ أو المَكانِ الذي وَقَعَ فيه الفِعْلُ و قِسْ عليهما بَقِيَّةَ المفاعيلِ .

وَ المرادُ بِالنَّعْتِ إيضاحُ المَوْصوفِ و تمييزُه إذا كانَ معرِفَةً و تخصيصَ الموصوفِ إذا كان نكرةً، و الكشفُ عن الحقيقَةِ و التوكيدُ و المدحُ و الذمُّ و الترَحُّمُ، نحو جاء خالد المسكين .

وَ المراد بالتوكيدِ، التقريرُ و دَفْعُ التوهُّمِ و قد يَقْصِدُ به البَليغُ التعريضَ بِغباوَةِ المخاطَبِ أَوِ الافتخارَ أو الترغيبَ أو المدحَ أو الذمَّ و غيرَها من الأَغْراضِ.

و المراد من البَدَلِ زيادةُ التقريرِ و قد يُراد به التفسيرُ و التوضيحُ بعدَ الإجمالِ أو الإبهامِ أو التعميمِ لِتَثْبِيْتِ المعنَى في نفسِ المخاطَبِ . و هذا يَظْهَرُ في بدَلِ الكلِّ .

أَوْ بَيانُ أَهَمِّيَّةِ البَعْضِ، و هذا يظهَر في بدَلِ البعضِ .

أو بيانُ الاهتمامِ بالأَصْلِ و هذا يظهَر في بدَلِ الاشتمالِ .

و المراد من عطفِ البَيَانِ هو الايضاحُ أو التمييزُ أو المدحُ أوِ الذمُّ (و ما إلى ذلك) .

و يكون التقييدُ بضميرِ الفَصْلِ لِقَصْرِ المسند على المسند إليه أو لِتاكيدِ القَصْرِ أو لِتَمْييزِ الخبَرِ عن الصفَةِ .

التقييد بالشرط

উপরে যে ক'টি قيد সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো مسند বা مسند إليه -এর সাথে সম্পৃক্ত قيد

যেমন أتى راشد صباحا এখানে صباحا শব্দটি مسند -এর قيد রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এটা রাশেদের আগমনের সময়কাল বুঝিয়েছে।

তদ্রূপ أتى راشد نفسه এখানে نفسه শব্দটি مسند إليه -এর قيد রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এর দ্বারা রাশেদ সম্পর্কে শিথিল ধারণা পোষণের অবকাশ দূর করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে একটি জুমলাকে যখন অন্য একটি জুমলার شرط রূপে ব্যবহার করা হয় তখন প্রকৃত পক্ষে সেটা দ্বিতীয় জুমলার তথা جزاء -এর মাঝে বিদ্যমান إسناد বা حكم -এর قيد রূপে গণ্য হয়। উদাহরণ দেখো–

من آمن و عمل صالحا دخل الجنة

এখানে প্রথম বাক্যের বর্ণিত ঈমান ও নেক আমলকে দ্বিতীয় বাক্যস্থ حكم তথা دخول الجنة -এর জন্য قيد বা শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে।

شرط -এর أدوات বা অব্যয়সমূহ প্রধানত দু' প্রকার।

১. الأدوات العاملة – এগুলো দু'টি فعل -এর শুরুতে আসে এবং مضارع হলে প্রথমটিকে শর্ত রূপে এবং দ্বিতীয়টিকে جزاء রূপে جزم দান করে। অব্যয়গুলো হচ্ছে– إن، إذما (এ দু'টি হরফ) أيان، أينما، أين، متى، ما، من

أي، مهما، كيفما، حيثما، أنى (এগুলো ইসম)।

২. الأدوات غير العاملة – এগুলো দু'টি জুমলার মাঝে শুধু শর্তের বন্ধন সৃষ্টি করে। কিন্তু فعل কে جزم দান করে না। অর্থাৎ বাক্যে এগুলোর অর্থগত ভূমিকা রয়েছে কিন্তু ব্যকরণগত কোন ভূমিকা নেই।

কোন জুমলার حكم কে অন্য একটি জুমলার حكم দ্বারা বন্ধনযুক্ত করার উদ্দেশ্য হলে এ সকল অব্যয় ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি أداة الشرط -এর নিজস্ব অর্থ রয়েছে। যেমন متى ও أيان অব্যয় দু'টি সময় ও কাল বোঝায়। তদ্রূপ حيثما، أنى، أين অব্যয় তিনটি স্থান বোঝায় এবং كيفما অব্যয়টি অবস্থা বোঝায়। সুতরাং যখন যে অর্থের শর্ত উদ্দেশ্য হবে তখন সেই অর্থবিশিষ্ট أداة الشرط

ব্যবহার করতে হবে।

এভাবেও বলতে পারো যে, যখন যে বিষয়টি শর্তের কেন্দ্রবিন্দু হবে তখন সে বিষয়ের أداة ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং শর্তের কেন্দ্রবিন্দু যদি হয় সময় বা স্থান তখন সময় বা স্থানবাচক أداة الشرط ব্যবহৃত হবে। যেমন متى تذهب أذهب এবং أين تذهب أذهب – তদ্রূপ যদি শর্তের কেন্দ্রবিন্দু হয় কোন عاقل বা غير عاقل তখন عاقل বা غير عاقل নির্দেশক অব্যয় ব্যবহৃত হবে। যেমন– مَنْ آمنَ باللهِ دخلَ الجنةَ এবং ما تَزْرَعْ تَحْصِدْ ইত্যাদি।

যাবতীয় أدوات الشرط -এর অর্থ ও ব্যবহার সম্পর্কিত আলোচনার মূল ক্ষেত্র তো হলো علم النحو – সুতরাং সে আলোচনা এখানে আমরা করবো না।

এখানে আমরা শুধু إن، إذا، لو – এই তিনটি অব্যয়ের অর্থগত ও ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা করবো। কেননা বালাগাতশাস্ত্রের সাথে এ সকল বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ ও গভীরভাবে জড়িত।

বালাগাতশাস্ত্র বিশারদগণ উচ্চাংগ ও প্রামাণ্য আরবী সাহিত্য অনুসন্ধান করে إن ও إذا -এর একটি সূক্ষ্ম ব্যবহারগত পার্থক্য দেখতে পেয়েছেন। তা এই যে, মুতাকাল্লিমের দৃষ্টিতে শর্তটি যদি অনিশ্চিত বা সন্দেহযুক্ত হয় কিংবা যদি বিরল হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে সাধারণতঃ إن ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে যদি শর্তটি ঘটার ব্যাপারে মুতাকাল্লিম নিশ্চিত বা আশাবাদী হয় কিংবা শর্তটি যদি অবিরল হয়, তদ্রূপ যদি শর্তটি মুতাকাল্লিমের কাম্য হয় তাহলে এ সকল ক্ষেত্রে إذا ব্যবহার করা হয়।

দেখো, কোন অসুস্থ ব্যক্তি যদি বলে إِنْ أَبرَأْ من مَرَضِيْ أَتصدَّقْ (যদি আমি অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করি তাহলে এক হাজার দীনার দান করবো।) তাহলে আমি বুঝবো, লোকটি আরোগ্য লাভের ব্যাপারে সন্দীহান বা নিরাশ।

পক্ষান্তরে যদি সে বলে– إذا بَرِئْتُ من مرضي تصدَّقْتُ তাহলে বুঝবো, লোকটি আরোগ্য লাভের ব্যাপারে আশাবাদী।

দেখো, উভয় বাক্যের শর্তগত অর্থ অভিন্ন, কিন্তু إن ও إذا -এর ব্যবহার দ্বারা কেমন সূক্ষ্ম অর্থগত পার্থক্য বোঝানো হয়েছে।

আবার দেখো তুমি যদি কাউকে বলো–

إنْ عَصَيْتَ ربَّكَ هَلَكْتَ و إذا أَطَعْتَه كنتَ من الفَائِزِينَ .

যদি তুমি আপন প্রতিপালকের অবাধ্যতা করো তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি তার আনুগত্য করো তাহলে সফলকাম হবে।

এ ক্ষেত্রে আমরা পরিষ্কার বুঝবো যে, লোকটির অবাধ্যতা তোমার কাম্য নয় বরং তার আনুগত্য কাম্য।

এ ধরনের সূক্ষ্ম ইংগিতময়তা আরবী বালাগাতের একক বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য ভাষায় সচরাচর এগুলো তুমি খুঁজে পাবে না।

উপরের আলোচনার আলোকে নীচের আয়াতটি দেখো, হযরত মূসা ও ফিরআউনের ঘটনা প্রসংগে আল্লাহ পাক বলেন–

وَ لقد أَخَذْنا آلَ فِرْعونَ بالسِّنينَ و نَقْصٍ من الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهم يَذَّكَّرون * فَإذا جاءَتْهُمْ الحَسَنَةُ قالوا لَنا هذه، وَ إِنْ تُصِبْهم سَيِّئَةٌ يَطَّيَّروا بِمُوسَى و من معه، اَلا إِنَّما طائِرُهم عندَ اللّٰهِ و لكنَّ أكثرَهم لا يَعْلَمون *

দেখো, দুনিয়ার জিন্দেগীতে আল্লাহর পক্ষ হতে দান-অনুগ্রহ বর্ষণের বিষয়টি সুনিশ্চিত ও সুপ্রচুর। মুমিন-কাফির নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রে এটা সাধারণ সত্য; এমনকি ফিরআউন ও তার পরিবারও এর ব্যতিক্রম নয়। পক্ষান্তরে আযাব ও শাস্তি দানের ঘটনা সে তুলানয় বিরল ও অনিশ্চিত। এ কারণেই مجيء الحسنة কে যেখানে শর্ত রূপে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে إذا অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে الإصابة بالسيئة কে إن অব্যয়যোগে শর্ত রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

তুমি যদি بليغ হতে চাও তাহলে তোমাকেও এমন সূক্ষ্ম রুচিবোধ অর্জন করতে হবে, যাতে إن ও إذا -এর ব্যবহারক্ষেত্র বুঝতে পারো এবং সঠিক ক্ষেত্রে সঠিক অব্যয়টি প্রয়োগ করতে পারো।

جار الله নামে খ্যাত আল্লামা যামাখশারী (রহঃ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ কাশশাফে এ বিষয়ে সতর্ক করে লিখেছেন–

إن ও إذا এর আলাদা ব্যবহারক্ষেত্র বুঝতে না পেরে বিশিষ্ট লোকেরাও ভুল করে থাকেন। আব্দুর রহমান বিন হাসসানের কবিতাই ধরো; জনৈক প্রশাসকের নিকট একবার তিনি কোন প্রয়োজন প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু প্রশাসক তার প্রয়োজন পূর্ণ করেননি। এতে অসন্তুষ্ট কবি তার নিন্দা করে কবিতা বলেছেন–

أَبَى لَكَ كَسْبَ الحَمْدِ رَأْيٌ مُقَصِّرٌ + وَ نَفْسٌ أَضَاقَ اللّٰهُ بِالْخَيْرِ باعَها

إذا هِيَ حَثَّتْه عَلَى الخيرِ مَرَّةً + عَصَاها وَ إِنْ هَمَّتْ بِشَرٍّ أَطاعَها

তোমার জন্য প্রশংসা বয়ে আনতে অস্বীকার করেছে তোমার নীচ চিন্তা এবং তোমার সেই মন, কল্যাণের ব্যাপারে যার পরিধিকে আল্লাহ সংকীর্ণ করেছেন।

কোন একবার মন যদি তাকে কল্যাণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তখন সে মনের অবাধ্য হয়। আর যদি মন্দের উদ্যোগ নেয় তখন সে মনের আনুগত্য করে।

দেখো, নিন্দার ক্বারীনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কবি বলতে চান লোকটির মন কদাচিৎ তাকে কল্যাণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মন্দের দিকেই টানে। সুতরাং তিনি যদি إن ও إذا -এর বিপরীত ব্যবহার করতেন তাহলেই বক্তব্যটি مقتضى الحال অনুযায়ী হতো এবং কবিতাটি بلاغة -এর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হতো।

তবে বিশেষ কিছু উদ্দেশ্যে إن ও إذا অব্যয় দু'টিকে একটির পরিবর্তে অন্যটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দেখো, পিতা তার অবাধ্য পুত্রকে বলছেন-

إن كنتَ ابْنِي حَقًّا فلا تَعْصِنِي

(যদি সত্যি তুমি আমার পুত্র হয়ে থাক তাহলে আমার অবাধ্যতা করো না।)

যেহেতু পুত্র হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত এবং পুত্র সেটা অস্বীকার করছে না সেহেতু إذا -এর ব্যবহারই ছিলো যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আচরণ যেহেতু পুত্রের মত নয় সেহেতু তাকে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক অস্বীকারকারীর পর্যায়ে নামিয়ে আনা হয়েছে। إن অব্যয় ব্যবহার করে সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলে تَنزيلُ المخاطَبِ منزلةَ منكرِ الحقيقَةِ -

আবার দেখো, তুমি একটি অপরাধ করেছো, আর সেটা তোমার জানাও রয়েছে। অথচ তুমি বলছো إن كنتُ فعلتُ هذا فَأرجو العَفْوَ (যদি এটা করে থাকি তাহলে মাফ চাই।)

বিষয়টি জেনেও না জানার ভান করার জন্য তুমি এখানে إذا -এর পরিবর্তে إن -এর আশ্রয় নিয়েছো। আবার দেখো, নিজের মিথ্যাবাদিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েও যদি কেউ এভাবে বলে- إذا كنتُ صادقًا أظهَرَ اللّٰهُ صِدْقِي (যদি আমি সত্যবাদী হয়ে থাকি তাহলে আল্লাহ আমার সত্যবাদিতা প্রকাশ করবেন।

এখানেও নিজের মিথ্যাবাদিতার বিষয়টি জেনেও না জানার ভান করার জন্য

إن -এর পরিবর্তে إذا -এর আশ্রয় নেয়া হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় تجاهُلُ العارِفِ

এবার আমরা لو অব্যয়টি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

لو অব্যয়টি অতীতকালের শর্ত প্রকাশ করে এবং এ কথা বোঝায় যে, শর্তটি সংঘটিত হলে جوابُ الشرط ও সংঘটিত হতো। কিন্তু শর্তটি যেহেতু ঘটেনি সেহেতু جوابُ الشرط ও সংঘটিত হয়নি। উদাহরণ দেখো– وَلو شاءَ لَهَداكم أجْمَعِينَ (তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের সকলকে হেদায়াত দান করতেন।)

এখানে لو অব্যয় থেকে বোঝা গেলো যে, সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের হিদায়াত লাভ করা আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যেহেতু আল্লাহর পক্ষ হতে ইচ্ছা পাওয়া যায়নি সেহেতু সমগ্র মানবগোষ্ঠীর হিদায়াত লাভ হয়নি। হিদায়াতের অনস্তিত্বের কারণ হলো আল্লাহর ইচ্ছার অনস্তিত্ব।

যেহেতু لو অব্যয়টির সম্পর্ক হলো বিগত কালের সাথে সেহেতু পরবর্তী ফেয়েল দু'টি ماضي হওয়া আবশ্যক। উপরের উদাহরণ থেকেই তুমি তা বুঝতে পারো। যদি এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে এবং لو -এর পরে ماضي এর পরিবর্তে مضارع ব্যবহৃত হয় তাহলে বুঝতে হবে যে, বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে এ ব্যতিক্রম করা হয়েছে। নীচের আয়াতটি দেখো–

وَاعْلَمو أَنَّ فيكم رسولَ اللّٰهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ في كَثيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ

জেনে রেখো যে, তোমাদের মাঝে আল্লাহর রাসূল রয়েছেন, যদি তিনি বহু ক্ষেত্রে তোমাদের (ইচ্ছা ও মতামতের) অনুসরণ করতেন তাহলে অবশ্যই তোমরা ভ্রান্তিতে নিপতিত হতে।

দেখো, তাদের ইচ্ছা ও আবদার ছিলো এই যে, আল্লাহর রাসূল যেন তাদের মতামত মেনে চলেন এবং তাদের এ আবদার শুধু বিশেষ একটি ক্ষেত্রে ছিল না; বরং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে তারা এ আবদার করতো। في كثير من الأمر অংশটি থেকে এটা বোঝা যায়। অর্থাৎ তাদের আবদার ছিলো, রাসূলের তরফ থেকে তাদের মতামতের অনুসরণ যেন পুনঃ পুনঃ হয়। ماضي দ্বারা কিন্তু এই পুনঃপৌনিকতার অর্থ প্রকাশ পেতো না। বরং لو اطاعكم বললে তাদের পক্ষ হতে শুধু إطاعة الرسول -এর আবদার বোঝা যেতো। পক্ষান্তরে مضارع

ব্যবহারের সুফল এই যে, لو -এর মাধ্যমে কালগত বিষয়টি مستقبل থেকে ماضي তে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। কিন্তু مضارع -এর মধ্যে পুনঃপৌনিকতা বোঝানোর যে যোগ্যতা রয়েছে তা অক্ষুণ্ন থাকবে। ফলে তাদের আবদারের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পাবে।

মোটকথা, অতীতকালীন শর্তটির পুনঃপৌনিকতা বোঝানোর উদ্দেশ্যে لو -এর পর ماضي -এর পরিবর্তে مضارع ব্যবহার করা হয়।

এবার নীচের আয়াতটি দেখো–

وَ لَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِم عِنْدَ رَبِّهِم رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَ سَمِعْنَا
فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ *

তুমি যদি দেখতে সেই দৃশ্য যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে তাদের মাথা নত করে রাখবে। (আর বলবে) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা দেখলাম, শুনলাম (এবং নিজেদের ভুল বুঝতে পারলাম) সুতরাং আপনি আমাদেরকে (দুনিয়াতে) প্রত্যাবর্তন করান; আমরা নেক আমল করবো। (এখন) আমরা (প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে) বিশ্বাস করছি।

দেখো, এখানে দু'টি বিষয় বোঝানো উদ্দেশ্য। প্রথমতঃ বিষয়টি বিগত কালের নয় বরং ভবিষ্যতে আখেরাতে সংঘটিত হবে।

দ্বিতীয়তঃ বিষয়টি অতি শুনিশ্চিত এবং অতি অবশ্যম্ভাবী। কেননা এটা ঐ মহান সত্তার প্রদত্ত সংবাদ যিনি মিথ্যার সম্ভাবনা থেকে চির পবিত্র। সুতরাং ধরে নাও যে, তা যেন ঘটেই গিয়েছে। যুগপৎ এ দু'টি বিষয় বোঝানোর জন্যই لو এবং তার পরে مضارع ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ مضارع দ্বারা 'ভবিষ্যদতার' দিকে ইংগিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে অতীত কালের সাথে সম্পৃক্ত শর্তের অব্যয় لو দ্বারা সুনিশ্চয়তার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কেননা ভবিষ্যত হলো অনিশ্চিত, পক্ষান্তরে অতীত হলো সুনিশ্চিত।

মোটকথা এখানে ব্যতিক্রম ঘটিয়ে لو -এর পরে ماضي এর পরিবর্তে مضارع ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এদিকে ইংগিত করা যে, ঘটনাটি যদিও ভবিষ্যতের কিন্তু অতি সুনিশ্চিত হওয়ার কারণে যেন ঘটেই গেছে। কথাটা আরবীতে এভাবে বলা যায়–

تَصْوِيرُ مَا سَيَحْدُثُ بِصُورَةِ الأَمْرِ الذي وَقَعَ و حَدَثَ

অতীতকালীন শর্তের অর্থ প্রকাশ করাই হলো لو -এর সাধারণ ব্যবহার। তবে কখনো কখনো إن -এর সমার্থক রূপে ভবিষ্যতের শর্তের অর্থেও এর ব্যবহার হয়ে থাকে। উদাহরণ দেখো,

وَ لْيَخْشَ الذِينَ لو تركُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافًا خَافُوا عَليهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْيَقولوا قَوْلًا سَدِيْدًا *

তারা যেন ভয় করে যারা যদি নিজেদের মৃত্যুর পর দুর্বল সন্তান-সন্ততি রেখে যায় তাহলে তাদের ব্যাপারে আংশকা বোধ করে। সুতরাং তারা যেন (অন্যের এতীম বাচ্চাদের ব্যাপারে) আল্লাহকে ভয় করে এবং সঠিক কথা বলে।

দেখো, যাদেরকে লক্ষ্য করে এ কথা বলা হয়েছে তাদের বাচ্চাদের এতীম হওয়ার বিষয়টি ভবিষ্যতের ব্যাপার। সুতরাং বোঝা গেলো لو অব্যয়টিকে إن -এর সমার্থক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে এবং পরবর্তী ماضي কে مستقبل -এর অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। বালাগাতের দৃষ্টিকোণ থেকে এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ভবিষ্যতের বিষয়টিকে বিগত কালের বিষয় রূপে তুলে ধরা যাতে নিজেদের সন্তানদের এতীমির বিষয়টি সুনিশ্চিত ভেবে সংকিত হয়ে অন্যের এতীম সন্তানদের প্রতি সদাচারে উদ্বুদ্ধ হয়।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেই আমরা শর্তসংক্রান্ত আলোচনার ইতি টানছি।

তুমি জানো যে, جملة شرطية মূলতঃ দু'টি جملة -এর সমন্বয়ে গঠিত এবং দ্বিতীয় জুমলাটিই হলো মূল উদ্দেশ্য। প্রথম জুমলাটি শুধু দ্বিতীয় জুমলার حكم বা نسبة -এর জন্য شرط ও قيد রূপে যুক্ত হয়ে থাকে। সুতরাং দ্বিতীয় বাক্যটি তথা جواب الشرط যদি خبرية হয় তাহলে পুরো جملة شرطية টি خبرية হবে। পক্ষান্তরে সেটা إنشائية হলে পুরো جملة شرطية টি انشائية হবে। উদাহরণ দেখো,

إِنْ نَجَحْتَ أُكافِئْكَ

এখানে جواب الشرط হচ্ছে خبرية । সুতরাং পুরো جملة شرطية টি خبرية হবে। কেনেনা এর মূল বক্তব্য হলো أكافئك حين نجاحك

পক্ষান্তরে إن جاءَكَ زيد فاكرِمْه বাক্যটির جواب الشرط হচ্ছে أمر – সুতরাং পুরো বাক্যটি انشائية হবে। কেননা, এর মূল বক্তব্য হচ্ছে أكرمه حين مجيئه

خلاصة الكلام

الشرطُ فى الأصلِ قيدٌ لِلْحُكْمِ الذي بينَ المسنَدِ و المسنَدِ إليه . و لِلشَّرْطِ أَدَواتٌ، منها إن، و إذا و لو .

و نحنُ هنا نَقْتَصِرُ على بَيَانِ الفَرْقِ بينَ معانِيْ هذه الأَدَواتِ الثَّلاثِ و مواقِعِ اسْتِعمالِها، لِأَنَّ لها مَزَايا بَلاغِيَّةً

وَ أمّا بَقِيَّةُ أدواتِ الشَّرطِ فالبَحْثُ عنها في كُتبِ النحْوِ .

فإن و إذا للشرطِ فى الاستقبالِ، و يُستعمَل إن معَ الشرطِ الذي لا يَجْزِم المتكلِّمُ بِوُقوعِه في المستَقْبَلِ، و يُستعمَل إذا مع الشرطِ الذي يُجزَمُ بِوُقوعِه، فإذا قلتَ : إنْ أَبْرَأْ من مَرَضي أتصدَّقْ بألفِ دينارٍ كنتَ شاكًّا في البُرْءِ، وإذا قلتَ إذا برئتُ من مرضي تصدَّقْتُ، فقد رجوتَ البُرْءَ و جَزَمْتَ به

و كذا يَستعمَل إن مع الشرطِ الذي يَنْدُر وقوعُه .

و إذا مع الشرط الذي يَكْثُر وقوعُه كما جاءَ في الآيةِ الشريفَةِ، فإذا جاءتهم الحسَنَة قالوا لنا هذه و إن تُصِبْهم سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بموسى و من معه .

و قد يُستَعْمَل إن و إذا في مَوْضِعِ الآخَرِ لِأَغْراضٍ بلاغِيَّةٍ، منها :

تجاهُلُ العارِفِ، و تنزيلُ المخاطَبِ منزِلَةَ منكرِ الحقيقَةِ .

وَ لو للشَّرطِ في الماضي، وَ لِذَا يَلِيْهـا الفِعْلُ الماضِيْ، فَإِنْ دخلَتْ على مضارعٍ كان ذلك لِغَرَضٍ بَلاغِيٍّ . و هو قَصْدُ الاستِمْرارِ في الماضي أو تصويرُ ما سَيَحْدُثُ بِصُورَةِ الأمرِ الذي وَقَعَ وَحَدَثَ .

و قليلًا يُستعمل لو للشرط في المستقبَل لِغَرَضٍ بَلاغِيٍّ، و هو جعلُ الأمرِ المستقبَلِ بِمَثابَةِ الأَمْرِ الماضي لِفائدَةِ التَّحْذِير وَ التخويفِ .

و المقصودُ منَ الجملَةِ الشرطيَّةِ هو الجواب، فَعَلَى هذا تُعَدُّ الجملَةُ الشرطِيَّةُ خَبَرِيَةً أو إِنْشائِيَّةً باعتبارِ جَوابِها .

الباب السادس

في القصر

قصر শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো সীমাবদ্ধ করা, আবদ্ধ করা। যেমন বলা হয়– قصر دارسته على علم البلاغة – সে বালাগাতশাস্ত্রের মাঝেই তার অধ্যয়ন সীমাবদ্ধ রেখেছে।

তদ্রূপ বলা হয় قصر نفسه على عبادة الله – সে নিজেকে (বা নিজের নফ্সকে) আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে আবদ্ধ রেখেছে।

বালাগাতশাস্ত্রের পরিভাষায় قصر অর্থ বিশেষ পদ্ধতিতে একটি বিষয়কে আরেকটি বিষয়ের সাথে বিশিষ্ট করা। উদাহরণ দেখো– لا يفلح الا مؤمن

এখানে فلاح বা সফলকাম হওয়ার বিষয়টিকে مؤمن -এর সাথে বিশিষ্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ মুমিন ছাড়া অন্য কেউ সফলকাম হবে না।

যেহেতু فلاح কে বিশিষ্ট করা হয়েছে, সেহেতু এটা হলো مقصور এবং মুমিনের সাথে বিশিষ্ট করা হয়েছে, সেহেতু مؤمن হলো مقصور عليه

এবার নীচের বাক্য দু'টিকে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

১. يفلح المؤمن ২. لا يُفْلِحُ إلا المؤمِنُ

দেখো, প্রথম বাক্যটি থেকে বোঝা গেলো যে, মুমিন সফলকাম হবে। মুমিন ছাড়া অন্য কেউ সফলকাম হবে কি হবে না সে সম্পর্কে বাক্যটি নিরব। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্য থেকে বোঝা গেলো, শুধু মুমিন সফলকাম হবে; মুমিন ছাড়া অন্য কেউ সফল কাম হবে না। অর্থাৎ প্রথম বাক্যে قصر নেই। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্যে قصر রয়েছে।

এখন দেখো, এই অতিরিক্ত অর্থ বোঝানোর জন্য দ্বিতীয় বাক্যে অতিরিক্ত কি কি শব্দ রয়েছে? أداة النفي ও أداة الاستثناء রয়েছে। তাহলে আমরা বলতে

পারি, أداة النفي ও أداة الاستثناء হচ্ছে طريق القصر বা قصر -এর অর্থ প্রকাশের মাধ্যম। মোটকথা এ বাক্যে–

১. فلاح হচ্ছে مقصور ২. مؤمن হচ্ছে مقصور عليه ৩. ما و إلا হচ্ছে طريق القصر

একইভাবে নীচের উদাহরণটি দেখো– إنما الخَمْرُ نَجِسٌ (মদ শুধু অপবিত্র) এ বাক্যের মর্মার্থ এই যে, মদ জিনিসটি نجاسة বা অপবিত্রতা গুণের সাথে বিশিষ্ট হয়েছে। এগুণের পরিবর্তে طهارة বা পবিত্রতা গুণের সাথে তা কখনো যুক্ত হতে পারে না।[১]

আশা করি, তুমি বুঝতে পেরেছো যে, এ বাক্যটিতে قصر -এর অর্থ রয়েছে এবং তা إنما অব্যয়টির মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। কেননা إنما অব্যয়টি বাদ দিলে الخمر نجس বাক্যটি থেকে قصر -এর অর্থ বুঝে আসে না।

মোটকথা, যেহেতু এখানে إنما অব্যয়যোগে الخمر কে نجاسة গুণের সাথে বিশিষ্ট করা হয়েছে। সেহেতু الخمر হলো مقصور এবং نجاسة গুণটি হলো مقصور عليه আর إنما অব্যয়টি হলো طريق القصر বা قصر -এর মাধ্যম।

একইভাবে নীচের তিনটি উদাহরণ দেখো–

১. الأرض متحركة لا ثابتة ২. ما الارض ثابتة بل متحركة

৩. ما الأرض ثابتة لكن متحركة

এখানে الأرض বা পৃথিবীকে تحرك বা গতিশীলতা গুণটির সাথে বিশিষ্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ এই গুণের পরিবর্তে ثبوت বা স্থিরতা গুণটির সাথে তা কখনো যুক্ত হবে না।[২] সুতরাং الأرض হলো مقصور এবং تحرك গুণটি হলো مقصور عليه

আশা করি এ কথা তুমি বুঝতে পেরেছো যে, لا، بل ও لكن এই অব্যয়গুলো দ্বারা عطف করার কারণেই আলোচ্য বাক্যগুলোতে قصر -এর অর্থ এসেছে। সুতরাং এগুলো হচ্ছে طريق القصر বা قصر -এর মাধ্যম।

নীচের আয়াতটি দেখো– إياك نعبد و إياك نستعين

---

১. অপবিত্রতা গুণটি কিন্তু মদের সাথে বিশিষ্ট নয়। কেননা মদ ছাড়া অন্যান্য জিনিসেও অপবিত্রতা গুণটি পাওয়া যায়, যেমন পেশাব।

২. পক্ষান্তরে গতিশীলতা গুণটি পৃথিবীর সংগে বিশিষ্ট নয়। কেননা অন্যান্য গ্রহও গতিশীল।

এখানেও قصر রয়েছে। কেননা আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ আমাদের ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনা আপনার মাঝেই সীমাবদ্ধ। আপনার সাথেই বিশিষ্ট। আপনার পরিবর্তে অন্য কারো সাথে তা যুক্ত হবে না। সুতরাং عبادة ও استعانة গুণটি হচ্ছে مقصور এবং ضمير الخطاب হচ্ছে مقصور عليه

আবার দেখো نعبدك و نستعينك বাক্যটিতে উপরোক্ত قصر বিদ্যমান নেই। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, مفعول به কে فعل থেকে অগ্রবর্তী করার কারণেই قصر-এর অর্থ সৃষ্টি হয়েছে। তাই বালাগাতের পরিভাষায় বলা হয়–

تَقْدِيمُ ما حَقُّه التاخِيرُ يُفِيدُ القَصْرَ

উপরের সমগ্র আলোচনার সার কথা এই যে, বিশেষ পদ্ধতিতে কোন কিছুকে কোন কিছুর সাথে বিশিষ্ট করাকে قصر বলে। যাকে বিশিষ্ট করা হবে তাকে مقصور এবং যার সাথে বিশিষ্ট করা হবে তাকে مقصور عليه বলে। قصر -এর মাধ্যম হলো চারটি। এগুলোকে طرق القصر বলে।

قصر صفة على موصوف و عكسه

এবার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমার সামনে তুলে ধরছি।

لا يفلح إلا المؤمن উদাহরণটি আবার লক্ষ্য করো, فلاح হচ্ছে একটি গুণ বা صفة এবং مؤمن হচ্ছে এই গুণে গুণান্বিত বা موصوف – আর যেহেতু এখানে صفة – কে موصوف -এর সাথে বিশিষ্ট করা হয়েছে সেহেতু বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে قصر صفة على موصوف বলে।

এবার إنما الخمر نجس উদাহরণটি লক্ষ্য করো, এখানে نجاسة হচ্ছে একটি গুণ বা صفة এবং خمر হচ্ছে এই গুণে গুণান্বিত বা موصوف – আর যেহেতু এখানে موصوف কে صفة -এর সাথে বিশিষ্ট করা হয়েছে সেহেতু বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে قصر موصوف على صفة বলে।

قصر -এর যেখানে যত উদাহরণ রয়েছে গভীরভাবে লক্ষ্য করলে তুমি দেখতে পাবে যে, হয় সেখানে صفة কে موصوف -এর সাথে বিশিষ্ট করা হয়েছে কিংবা موصوف কে صفة -এর সাথে বিশিষ্ট করা হয়েছে। অর্থাৎ হয় সেটা قصر صفة على موصوف হবে কিংবা قصر موصوف على صفة হবে।

অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, قصر বিষয়ক আলোচনায় صفة ও موصوف

শব্দদুটি দ্বারা نحو-এর পরিচিত صفة ও موصوف উদ্দেশ্য নয়, বরং এখানে صفة অর্থ যাবতীয় গুণ বা ক্রিয়া। বাক্য কাঠামোতে ব্যাকরণগত দিক থেকে তা صفة হোক বা অন্য কিছু। তদ্রূপ এ গুণ বা ক্রিয়া যার সঙ্গে বিশিষ্ট হবে সেটাই হবে موصوف – বাক্য কাঠামোতে ব্যাকরণগতভাবে তা موصوف হোক বা অন্য কিছু।

সুতরাং لا يفلح إلا المؤمن বাক্যের يفلح অংশটি ব্যাকরণগত দিক থেকে فعل হলেও এখানে আমরা فلاح কে صفة বলবো। তদ্রূপ المؤمن শব্দটি فاعل হলেও এখানে সেটাকে فلاح ছিফাতের موصوف বলবো।

তদ্রূপ إياك نعبد বাক্যে عبادة হচ্ছে صفة এবং যেহেতু তা ك এই مفعول به -এর সাথে বিশিষ্ট হয়েছে, সুতরাং এখানে সেটাই হলো موصوف

তদ্রূপ إنما الخمر نجس বাক্যে نجاسة হচ্ছে صفة আর যেহেতু خمر জিনিসটি এই গুণের সাথে বিশিষ্ট হয়েছে সেহেতু এখানে এটা হলো موصوف যদিও বাক্য কাঠামোতে نجس হচ্ছে خبر এবং الخمر হচ্ছে মুবতাদা।

তদ্রূপ ما صمت إلا يوما বাক্যে صوم হচ্ছে صفة এবং يوم হচ্ছে موصوف অথচ বাক্যকাঠামোতে তা فعل ও مفعول فيه।

خلاصة الكلام

القَصْرُ لغةً التخصيصُ وَ الحَبْسُ، تقول : قَصَرَ دراسَتَه على علمِ البلاغَةِ، و قَصَر نَفْسَه على عِبادَةِ اللّٰهِ .

وَ القَصْرُ اصطلاحًا : تَخصِيْصُ شيءٍ بِشيءٍ بِطَرِيقٍ مخصوصٍ .

وَ لِكلٍّ قَصْرٍ طَرْفانِ مقصورٌ و مقصورٌ عليهِ و طُرُقُ القَصْرِ المشهورَةِ أربَعَةٌ:

(أ) النفي و الاستثناء (و هنا يكون المقصورُ عليه ما بعدَ أداةِ الاستثناء)

(ب) إنما (و هنا يكون المقصور عليه مُؤَخَّرًا وجوبًا)

(جـ) العطف بلا أو بل أو لكن (و في العطف بلا يكون المعطوف عليه هو

المقصورَ عليه و أما فى العطف بِبَلْ أو لكن فيكون المقصور عليه ما بعدَ هما)

(د) تقديمٌ ما حَقُّه التاخِيرُ (و يكون المقصور عليه هو المقدَّمَ)

و ينقسم القصرُ باعتبارِ طَرْفَيْهِ قسمين :

(ا) قصرُ صفةٍ على موصوفٍ (بـ) قصرُ موصوفٍ على صفةٍ.

القصر الحقيقي - القصر الإضافي

لا إله إلا الله কালিমাটি লক্ষ্য করো, পূর্ববর্তী পাঠের আলোকে আশা করি তুমি সহজেই বুঝতে পারছো যে, এ বাক্যে قصر হয়েছে এবং সেটা হচ্ছে قصر صفة على موصوف অর্থাৎ এখানে إلـهية বা মাবুদ হওয়ার গুণকে الله -এর সাথে বিশিষ্ট করা হয়েছে। (إله শব্দটি থেকে লব্ধ) إلـهية হলো গুণ বা صفة আর الله হলেন এই গুণের সাথে বিশিষ্ট বা موصوف – আর এই صفة টি বাস্তবিকই অন্য কোন موصوف -এর সাথে যুক্ত হতে পারে না। অর্থাৎ সমগ্র অস্তিত্বের জগতে আল্লাহ ছাড়া আর কোন সত্য মাবুদ নেই। কথাটা আরবীতে এভাবে বলা যায়–

حِينَما نقولُ لاْ إله إلَّا اللّٰهُ فَإِنَّنا نَقْصِرُ وَصْفَ الإِلٰهِيَّةِ الحَقِّ على موصوفٍ هو اللّٰهُ وَحْدَه، أَيْ لا يُوجَدُ في الوُجودِ كلِّه معبودٌ حَقٌّ سِوَى اللّٰهِ عز و جل .

انما الرزاق الله বাক্যটি সম্পর্কেও একই কথা। অর্থাৎ এখানে قصر صفة على موصوف হয়েছে। আর رزق দানের গুণটি সমগ্র অস্তিত্বের জগতে বাস্তবিকই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো সাথে যুক্ত হতে পারে না।

مقصور عليه -এর সাথে مقصور -এর বিশিষ্টতা যদি বাস্তবভিত্তিক হয় অর্থাৎ কখনো কোনক্রমে অন্য কারো সাথে আর যুক্ত না হয়, বরং مقصور عليه -এর সাথে এককভাবে যুক্ত থাকে তাহলে বালাগাতের পরিভাষায় সেই قصر কে قصر حقيقي বলে।

মনে করো, ভণ্ড মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে কেউ নবী বলে দাবী করল আর তুমি তার দাবী নাকচ করে দিয়ে বললে– لا نبي إلا محمد তাহলে বাক্যটিও قصر صفة على موصوف হবে, যেমন لا إله إلا الله বাক্যটিতে হয়েছিলো।

কিন্তু উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। সেটা এই যে, কালিমা বাক্যটিতে

إلهية গুণকে আল্লাহ ছাড়া সৃষ্টিজগতের অন্য সকল সত্তা থেকে বিযুক্ত করা উদ্দেশ্য এবং এটা বাস্তবভিত্তিক। পক্ষান্তরে نبوة গুণটিকে মুহম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর সকল মানব থেকে বিযুক্ত করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা সেটা বাস্তবভিত্তিক নয়। বাস্তব তো এই যে, হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আরো বহু নবী ও রাসূল রয়েছেন। বরং তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষ একটা ব্যক্তি থেকে نبوة গুণটিকে বিযুক্ত করে হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে বিশিষ্ট করা। অর্থাৎ এই قصر বা বিশিষ্টতা সার্বিক নয় আপেক্ষিক।

তদ্রূপ নীচের আয়াতটি দেখো–

وَ ما محَمَّدٌ إِلاَّ رسولٌ قد خَلَتْ من قَبْلِه الرُّسُلُ أ فَئِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلىٰ أَعْقابِكُمْ*

মুহাম্মদ তো রাসূল ছাড়া অন্য কিছু নন। তার পূর্বে বহু রাসূল বিগত হয়েছেন। (সুতরাং তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন কিংবা নিহত হন তাহলে কি তোমরা তোমাদের পিছনের জীবনে ফিরে যাবে?)

দেখো, যাদের মনে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে শুরু করেছিলো যে, মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল এবং তিনি অমর; অন্যান্য মানুষের মতো তাঁর মৃত্যু নেই। অর্থাৎ তাদের ধারণায় ছিলো যে, তিনি রিসালাত ও অমরত্ব এ দু'টি গুণে গুণান্বিত। এ ভুল ধারণা খণ্ডন করার জন্যই আলোচ্য আয়াত এসেছে। সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য হলো মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অমর গুণটি থেকে বিযুক্ত করে রিসালাত গুণের সাথে বিশিষ্ট করা। অন্যান্য যাবতীয় গুণ থেকে বিযুক্ত করে শুধু এই গুণটির সাথে বিশিষ্ট করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা এটা বাস্তবভিত্তিক নয়। বাস্তব তো এই যে, রিসালাত ছাড়াও তাঁর অসংখ্য গুণ রয়েছে। তা ছাড়া আয়াতের যারা مخاطب তাদেরও অন্যান্য গুণ সম্পর্কে কোন চিন্তাভাবনা ছিল না, শুধু উপরোক্ত গুণ দু'টি তাদের চিন্তায় ছিলো। সুতরাং আয়াতেরও উদ্দেশ্য হলো শুধু অমরত্ব গুণটির পরিবর্তে এই গুণটির সাথে তাঁকে বিশিষ্ট করা। মোটকথা, এখানে বিশিষ্টতাটি সার্বিক নয়, আপেক্ষিক।

যদি সমগ্রের পরিবর্তে বিশেষ কোন একটির মুকাবেলায় مقصور কে

মাকছুর আলাইহির সাথে বিশিষ্ট করা হয় তাহলে সেই قصر কে قصر إضافي বলে।

এবার তোমার সামনে এমন একটি উদাহরণ তুলে ধরবো যা অবস্থা ভেদে قصر حقيقي হতে পারে, আবার قصر إضافيও হতে পারে।

মনে করো, শহরে একজন মাত্র দানশীল ব্যক্তি আছেন। আর তিনি হচ্ছেন আলী। এ ছাড়া আর কোন দানশীল ব্যক্তি নেই। এই যদি হয় বাস্তব অবস্থা আর তুমি যদি বলো لا جواد في المدينة إلا علي তাহলে এটা قصر حقيقي হবে।

পক্ষান্তরে অবস্থা যদি এই হয় যে, শহরে আলী ছাড়া আরো বহু দানশীল রয়েছেন; কিন্তু আলোচনা হচ্ছিলো মনে করো আলী ও খালেদ সম্পর্কে। তখন তুমি বললে لا جوادَ في المدينة إلا عَلِيٌّ তখন এটা قصر إضافي হবে। কেননা তোমার উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধু খালেদের মোকাবেলায় দানশীলতার গুণটিকে আলীর সাথে বিশিষ্ট করা। অন্য সকল ব্যক্তি থেকে গুণটিকে বিযুক্ত করে শুধু আলীর সাথে বিশিষ্ট করা উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া অন্য সকলের প্রসংগ তো আলোচনায় আসেওনি। শুধু খালেদের প্রসংগই এসেছে। অবশ্য একটা বিষয় জেনে রাখা দরকার যে, শহরের অন্যান্য দানশীল লোকদের উপস্থিতি জানা সত্ত্বেও যদি সমগ্রের মুকাবেলায় গুণটিকে শুধু আলীর সাথে বিশিষ্ট বলে দাবী করা হয় তাহলে বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলা হয়– القصرُ الحقيقيُّ الادِّعائِيُّ

তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, قصر إضافي ও قصر ادعائي এ দিক থেকে অভিন্ন যে, مقصور উভয় ক্ষেত্রে مقصور عليه ছাড়া অন্যত্র বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু এদিক থেকে ভিন্ন যে, قصر إضافي -এর ক্ষেত্রে متكلم সেটা স্বীকার করে তবে তার লক্ষ্য থাকে বিশেষ একটি পাত্রের প্রতি। পক্ষান্তরে قصر ادعائي -এর ক্ষেত্রে মুতাকাল্লিম مقصور عليه ছাড়া অন্য কারো অস্তিত্ব স্বীকারই করে না। বলাবাহুল্য যে, এর উদ্দেশ্য হচ্ছে مبالغة বা অতিশয়োক্তি। আর বালাগাতের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষেত্রবিশেষে এর প্রয়োজনও হয়ে থাকে। নীচের কবিতা পংক্তিতে যে قصر রয়েছে সেটা কিন্তু قصر ادعائي শ্রেণীর।

لا سيفَ إلا ذُو الفَقَارِ + وَ لا فَتَى إلا عَلِيٌّ

যুলফিকার ছাড়া কোন তরবারি নেই আর আলী ছাড়া কোন যুবকও নেই।

যেহেতু হযরত আলী ও তার যুলফিকার তরবারির প্রশংসা এখানে উদ্দেশ্য সেহেতু বোঝা যায় যে, কবি فتوة গুণটিকে আর সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু আলীর সাথে বিশিষ্ট করতে চান। তদ্রূপ তরবারিত্ব গুণটি শুধু যুলফিকারের সাথে বিশিষ্ট

করতে চান। অথচ বাস্তবে হযরত আলী ছাড়া যেমন বহু যুবক রয়েছে তেমনি যুলফিকার ছাড়া বহু তরবারি রয়েছে; কিন্তু আলী ছাড়া অন্য কোন যুবকের এবং যুলফিকার ছাড়া অন্য কোন তরবারির অস্তিত্বই যেন কবি স্বীকার করতে চান না।

خلاصة الكلام

ينقسِمُ القَصْرُ باعتبارِ الحقيقَةِ قِسْمَيْنِ :

(١) حَقيقِيٌّ و هو أن يُخْتَصَّ المقصورُ بالمقصورِ عليه باعتبارِ الحقيقَةِ، فلا يَتَعَدَّاه إلى غيرِه أَصْلاً ·

(٢) إِضافِيٌّ و هو أن يكونَ الاختصاصُ بِالنِّسْبَةِ إلى شَيْءٍ معيَّنٍ ·

وَ إذا ادَّعَى المتكلِّم اختصاصَ المقصورِ بالمقصُوْرِ عليه اختصاصًا كُلِّيًّا على خِلَافِ الوَاقِعِ فهو قَصْرٌ حقيقِيٌّ ادِّعائِيٌّ ·

القصرُ الحقيقِيٌّ يَكْثُرُ في قَصْرِ الصفَةِ على الموصوفِ و لا يَكادُ يُوْجَدُ في قصرِ الموصوفِ على الصفَةِ، و القصر الإضافيُّ يأتِيْ في قصرِ الصفَةِ على الموصوفِ و فى قَصْرِ الموصوفِ على الصفةِ عَلَى السَّواءِ :

নীচের বাক্য দু'টি লক্ষ্য করো–

১. لا شجاع إلا علي ২. ما أحمد إلا تاجر

এখানে প্রথম বাক্যে قصر صفة على موصوف হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্যে قصر موصوف على صفة হয়েছে।

এখন আমরা চিন্তা করে দেখবো যে, مخاطب এই বাক্য দু'টি সম্পর্কে কি চিন্তা ও ধারণা পোষণ করে। প্রথম বাক্যটি দেখো, مخاطب যদি মনে করে যে, شجاعة গুণটি (উদাহরণ স্বরূপ) আলী ও খালেদ উভয়ের মাঝে রয়েছে। অর্থাৎ এই গুণের ক্ষেত্রে উভয়ে শরীক, তাহলে এটা হবে قصر إفراد – কেননা এখানে শরীকানার ধারণা খণ্ডন করে صفة কে এককভাবে আলীর সাথে বিশিষ্ট করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে مخاطب যদি ধারণা করে যে, شجاعة গুণটি আলীর সাথে নয় বরং

খালেদের সাথে বিশিষ্ট, তাহলে এটা হবে قصر قلب – কেননা এখানে مخاطب -এর ধারণার বিপরীত বিষয় সাব্যস্ত করা হয়েছে।

আর যদি مخاطب মনে করে যে, দু'জনের কোন একজনের সাথে গুণটি বিশিষ্ট হয়েছে কিন্তু সে জনটি কে তা জানা নেই, তাহলে এটা হবে قصر تعيين – কেননা مخاطب -এর ধারণায় যা নির্ধারিত ছিল না متكلم তা নির্ধারণ করে দিয়েছে।

এবার দ্বিতীয় বাক্যটি দেখো, এটা হলো قصر موصوف على صفة – এখানেও একই কথা। অর্থাৎ مخاطب যদি ধারণা করে যে, আহমদ শুধু تجارة গুণের সাথে বিশিষ্ট নয় বরং (উদাহরণ স্বরূপ) زراعة ও تجارة উভয় গুণের সাথে বিশিষ্ট, তাহলে এটা হবে قصر إفراد

পক্ষান্তরে যদি তার ধারণা হয় যে, আহমদ تجارة গুণের সাথে নয় বরং زراعة গুণের সাথে বিশিষ্ট, তাহলে এটা হবে قصر قلب – আর যদি তার ধারণা হয় যে, أحمد উপরোক্ত দু'টি গুণের কোন একটির সাথে বিশিষ্ট কিন্তু সে গুণ কোনটি তা জানা নেই, তাহলে এটা হবে قصر تعيين

خلاصة الكلام

القصر الإضافِيُّ ينقَسِم باعتبار حَالِ المخاطَبِ إلي ثَلاثةِ أَقْسَامٍ : قصرِ إفرادٍ، و قصر قَلْبٍ، و قصرِ تَعْيِيْنٍ .

فإذا قلتَ في قصرِ الصفَةِ على الموصوفِ لا شجاعَ إلا عَلِيٌّ

و كانَ المخاطَبُ يَعْتَقِدُ اشتراكَ عَلِيٍّ و خَالِدٍ (مَثَلًا) في صفَةِ الشَّجاعَةِ كانَ القصرُ قصرَ إفرادٍ .

و إذا كانَ المخاطَبُ يعتَقِدُ عَكْسَ ما تقول كانَ القصرُ قصرَ قَلْبٍ .

و إذا كانَ المخاطَبُ مُتَرَدِّداً لا يَدْرِيْ أَيُّهما الشَّجاعُ كانَ القصرُ قَصْرَ تَعْيِيْنٍ.

و إذا قلتَ في قصر الموصوفِ على الصفَةِ ما أحمد إلا تَاجِرٌ

وَ كانَ المخاطَبُ يعتَقِدُ اخْتِصاصَ أحمدَ بِالتجَارَةِ وَ الزِّراعَةِ كِلَيْهِما كانَ القصرُ قصرَ إفرادٍ

و إذا كانَ المخاطَبُ يعتَقِدُ اخْتِصاصَ أَحْمدَ بِالزِّراعَةِ لا التجَارَةِ كانَ القَصْرُ قصرَ قلبٍ ·

وَ إذا كانَ المخاطَبُ متردِّداً لا يَدرِي أَيُّ الصِّفَتَيْنِ هي صفةُ أحمدَ كان القصرُ قصرَ تعيينٍ ·

الباب السابع

الفصل و الوصل

বালাগাতশাস্ত্র বিশারদদের মতে وصل অর্থ একটি জুমলাকে আরেকটি জুমলার উপর و অব্যয়যোগে عطف করা এবং فصل অর্থ দু'টি জুমলার মাঝে عطف বর্জন করা।

এ প্রসংগে বালাগাত বিশারদগণ হরফুল আতফ الواو -এর মাঝেই তাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কেননা لكن، حتى، ثم، ف ইত্যাদি প্রতিটি হরফুল আত্ফের একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে। যার কারণে এগুলোর প্রয়োগক্ষেত্র বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু و অব্যয়টি শুধু দু'টি বিষয়কে একত্রীকরণ বোঝায়, অতিরিক্ত কোন অর্থ প্রকাশ করে না, যেমন ف ও ثم অব্যয় দুটি একত্রীকরণের সাথে সাথে বিলম্বিত ক্রম কিংবা অবিলম্বিত ক্রম প্রকাশ করে। এ কারণে অন্যান্য حرف العطف -এর ক্ষেত্র যেমন সহজে বোধগম্য العطف بالواو -এর ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করা তেমন সহজ নয়।

বস্তুতঃ وصل বা فصل -এর নির্ভুল প্রয়োগ ও অলংকারসম্মত ব্যবহার এমন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব যাকে আল্লাহ্ আরবী সাহিত্যের স্বভাব সুরুচিতা ও অলংকার জ্ঞান দান করেছেন এবং দীর্ঘ অনুশীলনের মাধ্যমে বিষয়টিকে যিনি আত্মস্থ করতে পেরেছেন। এমন কি বিষয়টির গুরুত্ব ও নিগূঢ়তা বোঝানোর জন্য অলংকারশাস্ত্রের কোন কোন ইমাম الوصل و الفصل -কে বালাগাতের সীমা ও পার্থক্য-রেখা সাব্যস্ত করেছেন। শুধু তাই নয়; বরং ما البلاغة؟ এ প্রশ্নের জবাবে তারা বলেছেন– هي معرفةُ الفصلِ وَ الوَصْلِ.

সূতরাং নীচে আমরা وصل ও فصل -এর ক্ষেত্রগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা তোমার সামনে তুলে ধরতে চাই, যাতে বিষয়টি সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা তুমি পেতে পারো এবং وصل ও فصل -এর ভুল প্রয়োগ থেকে তোমার 'কলম ও জিহ্বা'কে রক্ষা করতে পারে।

الفصل

পরপর দু'টি جملة যখন উচ্চারিত হয় তখন দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির উপর عطف করা হবে, না কি عطف বর্জন করা হবে তা বোঝার জন্য একটি মৌলিক কথা মনে রাখতে হবে। সেটা এই যে, যেহেতু عطف -এর অর্থ হলো দু'টি ভিন্ন বিষয়কে واو অব্যয়যোগে সংযুক্ত ও সম্বন্ধিত করা সেহেতু عطف করার জন্য একদিকে যেমন বাক্য দু'টির মাঝে অর্থগত ভিন্নতা থাকতে হবে তেমনি উভয়ের মাঝে অর্থগত একটা সাধারণ সম্পর্কও বিদ্যমান থাকতে হবে। কেননা অভিন্নতার ক্ষেত্রে عطف বা সংযুক্তির কোন সার্থকতা নেই। আবার একেবারে সম্পর্কহীন দুইয়ের মাঝে সংযোগেরও অবকাশ নেই। উপরের এই মৌলিক আলোচনাটুকু চিন্তায় রেখে এসো, প্রথমে আমরা فصل বা عطف বর্জনের ক্ষেত্রগুলো আলোচনা করি।

দুটি বাক্যের মাঝে فصل -এর ক্ষেত্র হলো চারটি। প্রথমতঃ দু'টি বাক্যের মাঝে যদি পূর্ণ অভিন্নতা, অবিচ্ছেদ্যতা ও নিবিড়তম সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে তাহলে وصل -এর পরিবর্তে فصل করতে হবে।

পূর্ণ অভিন্নতার ক্ষেত্র আবার তিনটি–

(ক) দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের তাকীদ হবে এবং উদ্দেশ্য হবে প্রথম বাক্যের বিষয়বস্তুকে জোরদার করা এবং কোন প্রকার ভুল ধারণার অবকাশ দূর করা। উদাহরণ দেখো–

فَمَهِّلِ الكَافرين اَمْهِلْهُم رُوَيْدًا এখানে দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্যের অর্থকে জোরদার করার জন্য توكيد لفظي রূপে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং উভয় বাক্যের মাঝে অর্থগতভাবে পূর্ণ অভিন্নতা ও অবিচ্ছেদ্যতা রয়েছে, যার কারণে উভয়ের মাঝে عطف বর্জন করে فصل করা হয়েছে।

তদ্রূপ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ মিশরের অভিজাত নারী সমাজের মন্তব্য (আল কোরআনের ভাষায়) দেখো–

ما هٰذا بشـرًا إن هٰذا إلا مَلَكٌ كَرِيمٌ *

ইনি তো মানুষ নন। ইনি তো মহান ফিরেশতা ছাড়া অন্য কিছু নন।

প্রথম বাক্যের মূল কথা হলো হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর 'মানবত্ব'কে

নাকচ করা এবং দ্বিতীয় বাক্যের মূল কথা হলো তার জন্য 'ফিরিশতা সত্তা' সাব্যস্ত করা, যার অনিবার্য ফল হলো মানবত্ব নাকচ করা। সুতরাং বোঝা গেল যে, দ্বিতীয় বাক্যটিকে প্রথম বাক্যের বক্তব্যকে জোরদার করার জন্য توكيد معنوي রূপে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই অর্থগত অভিন্নতার কারণে উভয়ের মাঝে فصل করা হয়েছে। নীচের কবিতাটি সম্পর্কেও একই কথা–

إنما الدنيا فناءٌ + ليسَ لِلدنيا ثُبوتٌ

(খ) দু'টি বাক্যের মাঝে পূর্ণ অভিন্নতার আরেকটি ক্ষেত্র এই যে, দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্য থেকে بدل হবে। উদাহরণ দেখো–

بَلْ قالوا مِثْلَ ما قال الأوّلونَ. قالوا أَءِذا مِتْنَا وَ كُنَّا ترابًا وَعِظامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُوْنَ ؟

বরং পূর্ববর্তীরা যা বলেছে তারা [illegible]লো, তারা বললো, আমরা যখন মরে যাবো এবং মৃত্তিকা ও (মৃত্তিকা [illegible]তে পরিণত হবো তখন কি আমাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে?

এখানে দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্য থেকে بدل الكل হয়েছে। কেননা দ্বিতীয় বাক্যে যে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে প্রথম বাক্যে হুবহু সে বক্তব্যের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্যের বিশদ বক্তব্যই এখানে উদ্দেশ্য। প্রথম বাক্য দ্বারা বক্তব্যটির প্রতি ইংগিত করে শুধু ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে, যাতে বক্তব্যটি শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করে। আর 'নহ্‌বের' কিতাবে তুমি জেনে এসেছো যে, এটাই হলো بدل ও بدل الكل -এর সারকথা।

যাই হোক بدل الكل হিসাবে এখানে অর্থগতভাবে পূর্ণ অভিন্নতা বিদ্যমান থাকায় উভয় বাক্যের মাঝে فصل করা হয়েছে।

নীচের বাক্যটি সম্পর্কেও একই কথা।

هُوَ جَمْعٌ بينَ أمرينِ، بَيْنَ طهارَةِ السَّرِيرَةِ و بين طهارَةِ السِّيْرَةِ

আপন সত্তায় তিনি দু'টি গুণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। চিত্তের পবিত্রতা ও চরিত্রের পবিত্রতার মাঝে সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

তদ্রূপ নীচের আয়াতটি দেখো, হযরত হুদ (আঃ) তার কাওমকে সম্বোধন করে বলছেন–

فَاتَّقُوا اللّٰهَ و اَطِيعون * وَ اتَّقُوا الذي أَمَدَّكُم بما تعلَمون * أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ و بَنِيْنَ و جَنّٰتٍ وَ عُيونٍ *

সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো এবং ঐ সত্তাকে ভয় করো যিনি ঐ সকল নিয়ামত দ্বারা তোমাদের সাহায্য করেছেন যা তোমরা জানো। তিনি তোমাদেরকে পশুসম্পদ ও পুত্র-সন্তান এবং বিভিন্ন উদ্যান ও ঝরণা দ্বারা সাহায্য করেছেন।

এখান দ্বিতীয় ... أمدكم প্রথম أمدكم থেকে بدل العبض হয়েছে। কেননা বর্ণিত চারটি নেয়ামত হচ্ছে তাদের জানা অসংখ্য নেয়ামতের অংশবিশেষ। আর بدل البعض হিসাবে যে অর্থগত অবিচ্ছেদ্যতা রয়েছে সে কারণে উভয় বাক্যের মাঝে عطف -এর পরিবর্তে فصل করা হয়েছে।

এখানে بدل البعض ব্যবহারের সার্থকতা এই যে, সংক্ষেপে যাবতীয় নেয়ামতের আলোচনার পর বিশেষভাবে সেই নেয়ামতগুলো উল্লেখপূর্বক مخاطبদের উদ্বুদ্ধ করা যেগুলোর মূল্য ও গুরুত্ব তাদের স্থূল চিন্তায়ও বদ্ধমূল রয়েছে এবং সেগুলোর প্রতি তাদের বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে।

নীচের আয়াতটি সম্পর্কেও একই কথা।

يَسُومونَكُمْ سُوْءَ العَذابِ يُذَبِّحُونَ أَبْناءكُمْ

তারা তোমাদেরকে কঠিন নির্যাতন করতো, তোমাদের জবাই করতো।

(গ) দু'টি বাক্যের মাঝে পূর্ণ অভিন্নতার আরেকটি ক্ষেত্র এই যে, প্রথম বাক্যটিতে বিষয়বস্তুর অস্পষ্টতা থাকবে আর দ্বিতীয় বাক্যটি সেই অস্পষ্টতার বিশদ বিবরণ বা বায়ান তুলে ধরবে। উদাহরণ হিসাবে নীচের আয়াতটি দেখো–

فَوَسْوَسَ إليه الشَّيْطانُ، قالَ يا آدمُ هَلْ أَدُلُّكَ على شَجَرَةِ الخُلْدِ و مُلْكٍ لا يَبْلٰى

তখন শয়তান তাকে 'ওয়াসওয়াসা' দিলো। বললো, হে আদম তোমাকে কি আমি অমরত্ব লাভের বৃক্ষ এবং অক্ষয় রাজত্বের সন্ধান দেবো।

দেখো, প্রথম আয়াত থেকে শুধু শয়তানের 'ওয়াসওয়াসা' প্রদানের কথা জানা গেলো। কিন্তু ওয়াসওয়াসার কোন বিবরণ জানা গেলো না। এই অস্পষ্টতা দূর করার জন্য দ্বিতীয় বাক্যটিকে বিবরণ ও 'বায়ান' রূপে ব্যবহার করা হয়েছে।

উভয় বাক্যের মাঝে এই যে অভিন্নতা ও অবিচ্ছেদ্যতা সেটাই হলো فصل বা عطف বর্জনের কারণ। নীচের আয়াতটি সম্পর্কে একই কথা।

وَ إِذْ أَنْجَيْنٰكُمْ مِنْ اٰلِ فرعونَ يَسُومونَكم سُوْءَ العذابِ يُقَتِّلونَ أَبْناءَكُمْ وَ
يَسْتَحْيُوْنَ نِساءَكم وَ في ذٰلِكم بَلاءٌ من رَبِّكم عَظيمٌ *

ঐ সময়ের কথা স্মরণ করো যখন তোমাদেরকে আমি ফেরআউনের গোষ্ঠী থেকে মুক্তি দান করেছি। তারা তোমাদেরকে কঠিন নির্যাতন করতো। তোমাদের পুত্রদের নির্মমভাবে হত্যা করতো এবং তোমাদের স্ত্রীলোকদের (দাসী বানানোর জন্য) জীবিত রাখতো। বস্তুতঃ তাতে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিরাট পরীক্ষা ছিলো।

এ সকল ক্ষেত্রে বালাগাতের পরিভাষায় বলা হয় যে, দুটি বাক্যের মাঝে كمال الاتصال [illegible]।

[illegible] فصل -এর দ্বিতীয় ক্ষেত্র এই যে, উভয় বাক্যের মাঝে بدل – توكيد বা بيان [illegible] পূর্ণ অভিন্নতা ও অবিচ্ছেদ্যতা না থাকলেও তার কাছাকাছি সম্পর্ক রয়েছে। বালাগাতের [illegible] এ ধরনের 'প্রায় পূর্ণ অভিন্নতার' সম্পর্ককে شبه كمال اتصال বলে।

'প্রায় পূর্ণ অভিন্নতা' বা شبه كمال الاتصال অর্থ এই যে, দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথম বাক্য থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর রূপে ব্যবহৃত হবে। উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি আরো সহজ হতে পারে।

قال لي كيفَ أنت ؟ قلتُ عليلٌ + سَهرٌ دائِمٌ وَ حُزْنٌ طويلٌ

সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কেমন আছো? আমি বললাম, অসুস্থ। দীর্ঘ দুঃখ বেদনা এবং লাগাতার বিনিদ্রা।

দেখো, 'আমি অসুস্থ' কথাটা শোনার পর সভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে- ما سبب علتك؟ (তোমার অসুস্থতার কারণ কি?) এমন একটি প্রশ্নের সম্ভাবনা সম্পর্কে متكلم যেহেতু সচেতন ছিলেন, তাই তিনি مخاطب -এর পক্ষ হতে প্রশ্ন উত্থাপনের অপেক্ষা না করে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে مخاطب -এর অন্তরে উদ্ভূত প্রশ্নের উত্তর রূপে দ্বিতীয় বাক্য বলে দিলেন, আমার অসুস্থতার কারণ হচ্ছে বন্ধু বিচ্ছেদের ফলে দুঃখ ও অনিদ্রার শিকার হওয়া।

মোটকথা, প্রথম বাক্যটি যেহেতু একটি প্রশ্নের উৎস এবং দ্বিতীয় বাক্যটি হলো সেই প্রশ্নের উত্তর, সেহেতু আমরা বলতে পারি যে, উভয় বাক্যের মাঝে পূর্ণ অভিন্নতা বা كمال الاتصال না থাকলেও প্রায় পূর্ণ অভিন্নতা বা شبه كمال الاتصال রয়েছে এবং সেই কারণে উভয়ের মাঝে فصل করা হয়েছে।

আবার দেখো, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নির্দোষিতা প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর তিনি বলছেন (আল কোরআনের ভাষায়)–

وَ ما أُبَرِّئُ نفسي، إنَّ النفسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

নিজের নফসকে আমি নির্দোষ বলি না। নিঃসন্দেহে নফস মন্দের প্ররোচনা দানকারী।

প্রথম বাক্যটি শ্রবণের পর শ্রোতার মনে যেন প্রশ্ন উঠেছে؛ فما حال النفس নফসের অবস্থা তাহলে কি? দ্বিতীয় বাক্যটি যেন সেই প্রশ্নের উত্তর। আর যেহেতু দ্বিধাগ্রস্ত ও উৎসুক প্রশ্নকারীকে কল্পনা করে বাক্যটি বলা হয়েছে সেহেতু তাকে إن দ্বারা موكد করা হয়েছে। আশা করি বিষয়টি তোমার মনে আছে। যাই হোক আলোচ্য বাক্য দু'টির মাঝে প্রায় পূর্ণ অভিন্নতা বা شبه كمال الاتصال বিদ্যমান থাকার কারণে فصل করা হয়েছে।

৩. فصل এর তৃতীয় ক্ষেত্র এই যে, দু'টি বাক্যের মাঝে পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা ও বৈপরীত্য বিদ্যমান থাকবে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে كمال الانقطاع বলে। পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা বা كمال الانقطاع অর্থ এই যে, একটি বাক্য انشاء হলে অন্যটি خبر হবে। উদাহরণ রূপে নীচের আয়াতগুলো দেখো–

وَ اَقْسِطُوا إنَّ اللّٰهَ يُحب المُقْسِطين

إياكَ نعبُدُ و إيَّاكَ نستعين، اِهْدِنا الصراطَ المستقيمَ

(١) جزَىَ اللّٰهُ الشَّدائِدَ كلَّ خيرٍ + عرفتُ بها عَدُوِّيْ من صديقِيْ

لا تَحْسَبِ المَجْدَ تمرًا أنتَ آكِلُه + لَنْ تَبْلُغَ المَجْدَ حَتّٰى تَلْعَقَ الصَّبِرَ

كمال الانقطاع -এর আরেকটি রূপ হলো উভয় বাক্যের মাঝে অর্থগত

---

১. এটা شبه كمال الاتصال -এর উদাহরণও হতে পারে। কেননা প্রথম বাক্য শ্রবণের পর প্রশ্ন হতে পারে, বিপদাপদের জন্য এরূপ অস্বাভাবিক দু'আ করার কারণ কি? এর উত্তরে যেন বলা হলো, কারণ এই যে,.........

সামান্যতম সম্পর্কও বিদ্যমান না থাকা এবং উভয় বাক্যের مسند إليه -এর মাঝে কিংবা مسند এর মাঝে অভিন্নতা না থাকা। উদাহরণ স্বরূপ নীচের কবিতাটি দেখো–

إِنَّمَا الْمَرْءُ بِأَصْغَرَيْهِ + كُلُّ امْرِئٍ رهنٌ بِما لَدَيْهِ

মানুষ তার ক্ষুদ্রতম অংগ দু'টি দ্বারা তথা যবান ও কলব দ্বারা বিচার্য। অর্থাৎ কলব দ্বারা যা ভাবে এবং যবান দ্বারা যা বলে তা দিয়েই তাকে বিচার করা হয়। প্রতিটি মানুষ তার নিজের আমল দ্বারা দায়বদ্ধ। অর্থাৎ যেমন আমল করবে তেমন প্রতিফল পাবে।

দেখো, এখানে উভয় বাক্যের বিষয়বস্তুর মাঝে অর্থগত কোন সম্পর্ক নেই। অথচ দু'টি বাক্যের মাঝে عطف করার জন্য অর্থগত ভিন্নতা যেমন দরকার তেমনি উভয়ের মাঝে ন্যূনতম একটা অর্থগত সম্পর্কও থাকা দরকার। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, এখানে বাক্যদুটির মাঝে كمال الانقطاع বা পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার কারণে وصل -এর পরিবর্তে فصل করা হয়েছে।

উপরের বক্তব্যের আলোকে কবি আবু তামামের নিম্নোক্ত কবিতাটির সমালোনা করো।

لَا وَ الذي هو عالِمٌ اَنَّ النَّوَى + صَبِرٌ و أَنَّ أَبَا الحُسَيْنِ كَرِيمُ

৪. এবার নীচের উদাহরণটি দেখো–

وَ تَظُنُّ سَلْمَى أَنَّنِيْ أَبْغِيْ بها + بَدَلًا أُرَاهَا فى الضَّلَالِ تَهِيْمُ

সালমা ভাবে যে, আমি তার 'বিকল্প' সন্ধান করছি। আমি মনে করি যে, সে ভ্রান্ত চিন্তায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

দেখো, أراها অর্থ أظن – সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, تظن سلمى ও أراها বাক্য দু'টির মাঝে অর্থগত সাধারণ একটা যোগসূত্র বিদ্যমান রয়েছে। কেননা مسند দু'টি অভিন্ন। তদুপরি প্রথম বাক্যের مسند إليه হলো محبوب (প্রেমাস্পদ)। দ্বিতীয় বাক্যের مسند إليه হচ্ছে محب বা প্রেমিক। তা ছাড়া উভয় বাক্য হলো خبرية – সুতরাং সাধারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে উভয় বাক্যের মাঝে عطف হওয়াই স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু এখানে عطف -এর মাধ্যমে وصل করার পরিবর্তে فصل করা হয়েছে। কেননা কবি তো تظن -এর উপর عطف করার নিয়তে واو অব্যয় যোগ করলেন। কিন্তু ভাষাজ্ঞান অল্প এমন যে কোন ব্যক্তি

ভেবে বসতে পারে যে, বাক্যটি أبغي বাক্যের উপর عطف হয়েছে। তখন عطف -এর নিয়ম হিসাবে أبغي بها بدلا এবং أراها في الضلال تهيم উভয় বাক্য سلمى -এর ধারণাভুক্ত হয়ে যাবে। কেননা معطوف ও معطوف عليه একই হুকুমভুক্ত হয়ে থাকে। অথচ প্রকৃত পক্ষে أبغي بها بدلا হচ্ছে কবি সম্পর্কে সালমার ধারণা। আর أراها হচ্ছে সালমা সম্পর্কে কবির ধারণা ও সিদ্ধান্ত। মোটকথা, পূর্ববর্তী ভুল বাক্যের উপর عطف -এর সম্ভাবনা দূর করার জন্য وصل -এর পরিবর্তে فصل করা হয়েছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, কোন جملة -এর পূর্বে যদি দু'টি جملة থাকে যার একটির উপর উক্ত جملة কে عطف করা যায় কিন্তু অর্থগত ত্রুটির কারণে অপরটির উপর عطف করা যায় না। অথচ সাধারণ মানুষ ভুল স্থানেই عطف করে বসতে পারে। এই ভুল সম্ভাবনা দূর করার জন্য عطف বর্জন করা হয়। এটা হচ্ছে فصل এর চতুর্থ ক্ষেত্র। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় شبه كمال الانقطاع (প্রায় পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থা)।

অবশ্য একটা বিষয় আশা করি তুমি একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে যে, এই চতুর্থ প্রকারকে খুব সহজেই আমরা فصل এর দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত ধরে নিতে পারি। কেননা প্রথম বাক্য শ্রবণের পর প্রশ্ন হতে পারে فكيف تراها في ظنها (তার এ ধারণা সম্পর্কে তাকে তুমি কেমন মনে করো?) তখন পরবর্তী বাক্যটি হবে তার উত্তর। এ কারণেই বহু বালাগাত বিশারদ এটাকে فصل -এর আলাদা ক্ষেত্র বলে গণ্য করেননি।

خلاصة الكلام

يجب الفصلُ بين الجملتين في أربعَةِ مواضِعَ :

(أ) إذا كان بينهما اتحادٌ تامٌّ، و معنى تمامِ الاتحاد أن تكونَ الجملةُ الثانيةُ توكيدًا لِلْأُولٰى أو بَدَلًا منها أو بيانًا لها و يقال حينئذ إنَّ بين الجمليتين كمالَ الاتصالِ .

و سببُ الفصلِ هنا أن العطفَ يقتضي التغايُرَ بين الجملتين في المعنٰى .

(ب) إذا كانت الجملة الثانية جوابًا عن سؤالٍ نَشَأَ من الجملةِ الأُولٰى و يقال هنا إن بين الجملتين شِبْهَ كمالِ الاتصال .

(جـ) إذا كان بين الجملتين تَبَايُنٌ تامٌّ .

و معنَى تمامِ التبَايُنِ أَنْ تختَلِفَ الجملتان خَبَرًا و إنشاءً أو أن لا يوجَدَ بينهما أيُّ مناسَبةٍ في المعنَى .

و يقال حينئذ إِنَّ بين الجملتين كمالَ الانقطاعِ .

* إذا كان قبلَ جملةٍ جملتان، يَصِحُّ عطفُها على أَحَدِهما لِوُجودِ المناسَبَةِ بينهما و لا يَصِحُّ عطفُها على الأخرىٰ لأنه يُفسِدُ المعنَى المقصودَ للمتكلِمِ، فَيُتْرَكَ العَطْفُ كي لا يَقَعَ المخاطَبُ في خَطإٍ في تَعْيِيْنِ العطفِ و يقال حينئذٍ إِنَّ بين الجملتين شِبْهَ كمالِ الانقطاعِ .

وَ هٰذا الوَجْهُ مِنَ الفَصْلِ يُمكن رَدُّه إلى الوَجْهِ الثاني فَإِنَّ الجملةَ التالِيَةَ هنا جوابٌ عن سُؤالٍ يُفهَمُ مِنَ الأولىٰ .

مواضع الوصل

কবি আবুল আলা আল মাআররীর কবিতা দেখো–

وَ حُبُّ العَيْشِ أَعْبَدَ كُلَّ حُرٍّ + وَ عَلَّمَ سَاغِبًا أَكْلَ المُرَارِ

জীবনের প্রতি আসক্তি সকল স্বাধীনচেতা মানুষকে দাসত্ব শৃংখলে আবদ্ধ করেছে এবং ক্ষুধার্তকে 'তিক্তফল' ভক্ষণের শিক্ষা দান করেছে।

দেখো, এখানে أعبد كل حر বাক্যটি পূর্ববর্তী মুবতাদার খবর হিসাবে একটি إعرابগত স্থান গ্রহণ করেছে আর কবি وعلم ساغبا – এই দ্বিতীয় বাক্যটিকেও পূর্বোক্ত বাক্যের إعرابগত স্থানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ উভয় বাক্যকে পূর্ববর্তী মুবতাদার অভিন্ন খবর সাব্যস্ত করেছেন এবং এ কারণেই দ্বিতীয় বাক্যটিকে প্রথমটির উপর عطف করেছেন। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, দু'টি جملة কে একই محل الإعراب -এর অন্তর্ভুক্ত করা উদ্দেশ্য হলে عطف -এর মাধ্যমে উভয় جملة -এর মাঝে وصل বা সংযোগ সাধন করা আবশ্যক।

رَبِّ إني وَهَنَ العَظْمُ مِني و اشتَعَلَ الرأسُ شَيْبًا

আয়াতটি সম্পর্কেও একই কথা। কেননা এখানেও উভয় বাক্যকে পূর্ববর্তী إن -এর خبر হিসাবে একই محل الإعراب -এর অন্তর্ভুক্ত করা উদ্দেশ্য।

এবার নীচের দু'টি আয়াত দেখো–

إِنَّ الأبـرارَ لَفِيْ نعيمٍ و إن الفجارَ لَفي جحيمٍ ∗

فَلْيَـضْحَـكوا قليـلاً وَ لْيَـبْكُوا كـثيرًا ∗

এখানে দু'টি বাক্যের মাঝে واو দ্বারা কি কারণে عطف করা হয়েছে তা বুঝতে হলে উভয় আয়াতের বাক্য দুটির অবস্থা বিশ্লেষণ করতে হবে।

আমরা আয়াতসংশ্লিষ্ট তিনটি বিষয় তোমার সামনে তুলে ধরছি। প্রথমতঃ উভয় আয়াতের বাক্য দু'টি خبرية বা إنشائية হওয়ার ক্ষেত্রে অভিন্ন। অর্থাৎ প্রথম আয়াতের উভয় বাক্য হলো خبرية – পক্ষান্তরে দ্বিতীয় আয়াতের উভয় বাক্য হলো إنشـائية

দ্বিতীয়তঃ আয়াতের উভয় বাক্যের মাঝে একটা 'যোগসূত্র' রয়েছে, যা সংযোগ অব্যয় দ্বারা উভয় বাক্যকে সংযুক্ত করার দাবী জানায়।

মানুষের চিন্তা স্বভাবগতভাবেই একটি বস্তুর কল্পনা থেকে তার বিপরীত বস্তুর কল্পনায় চলে যায়। যেমন জান্নাত ও তার নেয়ামতের কল্পনার সাথে সাথে অবধারিতভাবে জাহান্নাম ও তার আযাবের কল্পনা চলে আসে। তদ্রূপ নেককারদের প্রসংগে বদকারদের কল্পনাও চলে আসে। তদ্রূপ হাসি কান্নার ক্ষেত্রে একটির কল্পনা অবধারিতভাবেই অন্যটির কল্পনা টেনে আনে। তদ্রূপ قلة ও كثرة একটি ছাড়া অন্যটি বোঝা সম্ভব নয়। মোটকথা, বৈপরীত্যের শক্তিশালী যোগসূত্র এখানে দু'টি বাক্যের মাঝে একটি সেতুবন্ধন রচনা করেছে, যা দু'টি বাক্যকে সংযোগ অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত করার দাবী জানাচ্ছে।

তৃতীয়তঃ فصل বা عطف বর্জনের যে সকল কারণ পিছনে বলা হয়েছে তার কোনটি এখানে নেই।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে–

১. দু'টি جملة যদি خبرية বা إنشائية হওয়ার ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়।

২. উভয়ের মাঝে যদি পারস্পরিক অনিবার্যতামূলক [১] যোগসূত্র থাকে,

৩. এবং عطف করার ক্ষেত্রে কোন বাধা না থাকে তাহলে উভয় বাক্যের মাঝে عطف করা আবশ্যক।

যোগসূত্র বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন–

১. দুইয়ের মাঝে বিদ্যমান বৈপরীত্য।

২. কিংবা উভয়ের মাঝে এমন সম্পর্ক যে, একটিকে বোঝা অন্যটিকে বোঝার উপর নির্ভরশীল। যেমন পিতৃত্ব ও পুত্রত্ব, উপর ও নীচ, কম ও বেশী, বেচা-কেনা ইত্যাদি। এ কারণেই أنت أبي و أنا ابنك বাক্য দু'টির মাঝে عطف আবশ্যক হয়েছে।

৩. কিংবা উভয় বাক্যের مسند ও مسند إليه অথবা তাদের قيد অভিন্ন হওয়া। যেমন– محمد يكتب و يشعر

এখানে উভয় বাক্যের مسند إليه অভিন্ন। আবার كتابة ও شعر -এর মাঝেও এমন সম্পর্ক যে, একটির কল্পনা অন্যটি কল্পনা টেনে আনে।

---

[১] অর্থাৎ এমন যোগসূত্র যে একটির কল্পনা অন্যটির কল্পনাকে অনিবার্য করে তোলে।

তদ্রূপ নীচের কবিতাটি দেখো–

يَشْقَى النَّاسُ وَ يَشْقَي آخرونَ بِهم + و يُسْعِدُ اللّٰهُ أقوامًا بِأَقْوامِ

একদল মানুষ নিজে দুর্ভাগা হয়, এমন কি তাদের কারণে অন্যরাও দুর্ভাগ্যের শিকার হয়। আবার এমনও হয় যে, আল্লাহ্ এক দলের উছিলায় অন্য দলকে সৌভাগ্যবান করেন।

এখানে প্রথম দু'টি বাক্যে مسند অভিন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে شقاء ও سعادة -এর মাঝে বৈপরীত্যের যোগসূত্র রয়েছে।

পক্ষান্তরে خَالِدٌ الكاتِبُ أَدِيبٌ و محمدٌ الكَاتِبُ فَقِيهٌ বাক্য দু'টিতে দুই মুসানাদ ইলাইহির قيد -এর মাঝে অভিন্নতা রয়েছে।

৪. যোগসূত্রের আরেকটি রূপ হলো, ব্যক্তিবিশেষের চিন্তায় দু'টি বিষয় সহাবস্থান করা। যেমন লেখকের চিন্তায় قلم و قرطاس সহাবস্থান করে। আবার যোদ্ধার চিন্তায় سيف و رمح সহাবস্থান করে ইত্যাদি।

নীচের আয়াতটি দেখো,

أَ فَلا يَنْظُرونَ إلىٰ الإبِلِ كيفَ خُلِقَتْ وَ إلى السَّماءِ كيفَ رُفِعَتْ و إلىٰ الجِبَالِ كيفَ نُصِبَتْ و إلى الأَرْضِ كيفَ سُطِحَتْ *

এখানে বাক্যগুলোর মাঝে عطف -এর কারণ ব্যক্তিবিশেষের চিন্তায় উল্লেখিত জিনিসগুলোর সহাবস্থান। কেননা আমার তোমার চিন্তায় যদিও উট ও আসমানের মাঝে সহাবস্থান নেই কিন্তু আয়াতের প্রত্যক্ষ সম্বোধনপাত্র হচ্ছে আরবরা। আর উটতো প্রিয় সম্পদ হিসাবে তাদের চিন্তার সিংহভাগই জুড়ে আছে। পক্ষান্তরে উটের দানা ও পানির জন্য আসমান ও যমীনও তাদের চিন্তায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আর বিপদাপদে পাহাড়ই হলো তাদের আশ্রয়স্থল। সুতরাং একজন আরবের চিন্তায় এগুলোর সহাবস্থান অতি স্বাভাবিক। مخاطب -এর চিন্তায় এগুলোর সহাবস্থানের কারণেই বাক্যগুলোর মাঝে عطف করা হয়েছে।

العدل نور و الظلم ظلام এখানে উভয় বাক্যের مسند ও مسند إليه এর মাঝে تضاد বা বৈপরীত্যের সম্পর্ক রয়েছে।

الأمير يعطي و يمنع এখানে উভয় বাক্যের مسند إليه -এর মাঝে اتحاد বা অভিন্নতা রয়েছে এবং উভয় مسند -এর মাঝে تضاد রয়েছে।

أقبل علي و أدبر أخوه এখানে উভয় বাক্যের مسند -এর মাঝে تضاد রয়েছে এবং مسند إليه -এর মাঝে تماثل বা নিকট সম্পর্ক রয়েছে।

فليضحكوا قليلا و ليبكوا كثيرا এখানে উভয় বাক্যের مسند إليه -এর মাঝে اتحاد বা অভিন্নতা রয়েছে। আর مسند এর মাঝে تضاد বা বৈপরীত্য রয়েছে। পক্ষান্তরে দু'টি قيد -এর মাঝে تضايف বা আপেক্ষিকতার সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ একটিকে বোঝা অন্যটিকে বোঝার উপর নির্ভরশীল।

দু'টি বাক্যের মাঝে 'যোগসূত্র'-এর ব্যাখ্যা হিসাবে এ ধরনের বহু উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে।

এবার নীচের উদাহরণটি লক্ষ্য করো–

কেউ তোমাকে জিজ্ঞাসা করলো– هل بَرِئَ أخوك من مَرَضِه ؟ – উত্তরে তুমি বললে, لا .. و شفاه الله – এখানে তো উভয় বাক্য إنشائية ও خبرية -এর দিক থেকে অভিন্ন নয়। তা সত্ত্বেও কেন তুমি উভয়ের মাঝে عطف করেছো? عطف বর্জন করে لا شفاه الله বললে অসুবিধা কি ছিলো?

অসুবিধা ছিলো এই যে, তোমার উদ্দেশ্য হলো لا দ্বারা ভাইয়ের সুস্থ না হওয়ার খবর দেয়া এবং شفاه الله দ্বারা তার জন্য দু'আ করা। অথচ لا شفاه الله বললে শ্রোতার পক্ষে এরূপ ভুল ধারণা করার সম্ভাবনা রয়েছে যে, তুমি বুঝি তার জন্য বদদোয়া করে বলছো, لا شفاه الله আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান না করুন।

মোটকথা, عطف বর্জনের অবস্থায় শ্রোতার পক্ষে ভুল অর্থ বোঝার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই তুমি এখানে عطف -এর আশ্রয় গ্রহণ করেছ।

এখানে তোমাকে দুটি ঘটনা বলি, হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) একবার এক লোকের হাতে একটি কাপড় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, أ تبيع هذا ؟ – সে অসম্মতি প্রকাশ করে বললো, لا .. يرحمك الله – তখন তিনি তাকে সংশোধন করে বললেন, لا تقل هكذا، و قل لا .. و يرحمك الله

খলীফা হারুন রশীদ একবার তার প্রধানমন্ত্রীকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলেন। মন্ত্রী নাবাচক উত্তর দিয়ে বললেন, لا .. و أيَّدَ اللّٰهُ الخليفةَ – সে যুগের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও বিদগ্ধ পণ্ডিত الصاحب ابن عباد বিষয়টি শুনে চমৎকার মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন–

هذه الوَاوُ أَحْسَنُ مِنَ الوَاوَاتِ فِي خُدودِ المِلَاحِ

রূপসীদের গণ্ডদেশের واو -গুলোর চেয়ে এই واو অনেক অনেক সুন্দর।

(গণ্ডদেশের واو অর্থ দুপাশের জুলফি যা দেখতে واو এর মতো বক্রাকৃতির।)

দেখো, প্রথম ঘটনায় বালাগাত জ্ঞান না থাকার কারণে লোকটি وصل ও **فصل** -এর ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারেনি। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ঘটনায় খলীফার মন্ত্রী বালাগাত জ্ঞানের কল্যাণে **وصل** -এর স্থানে **وصل** করতে সক্ষম হয়েছেন।

خلاصة الكلام

الوصل هو العطفُ بينَ الجملتين بالوَاوِ و الفصلُ هو ترك العطفِ بينهما .

يجب الوصلُ بينَ الجملتين في ثلاثَةِ مواضِعَ :

(١) إذا قُصِدَ إِشْراكُهما في الحُكْمِ الإِعْرابِيِّ .

(٢) إذا اتَّحَدَتا خَبَرًا أَوْ إِنْشاءً و وُجِدَ جامِعٌ يجمَعُ بينهمَا و لم يُوْجَدْ مانِعٌ من العطفِ .

و الجامِعُ هو اتحادٌ في المسنَدِ إليه أو في المسنَدِ أو في قَيْدٍ من قُيودِهما .
أَوْ تَضادٌ بينهما
أو تَماثُلٌ بينَهما (بِحَيْثُ يجتَمِعَانِ في الفِكْرِ)
أَوْ تَضايُفٌ بَيْنَهما (بِحيثُ يَتوَقَّفُ فهمُ أحدِهما على فَهْمِ الآخَرِ)

(٣) إذا اختلَفَتا خَبَرًا و إنشاءً و أَوْهَمَ الفصلُ خلافَ المقصودِ .

الباب الثامن

في الإيجاز و الإطناب و المساواة

যে কোন ভাষায় শব্দ যোগে মনের ভাব প্রকাশের তিনটি পন্থা রয়েছে। একজন بليغ তার মনের ভাব প্রকাশের জন্য স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা বা مقتضى الحال -এর তারতম্য হিসাবে তিনটি পন্থার কোন একটি গ্রহণ করে থাকেন। অর্থাৎ কখনো সুসংক্ষিপ্ত আকারে এবং কখনো সুবিশদ আকারে বক্তব্য পেশ করেন। আবার কখনো মধ্যবর্তী পন্থায় অর্থাৎ সুসংক্ষিপ্তও নয়; সুবিশদও নয় বরং সুপরিমিত আকারে বক্তব্য পেশ করে থাকেন। বালাগাতের পরিভাষায় বক্তব্যের সুসংক্ষিপ্ত উপস্থাপনকে إيجاز বলে এবং সুবিশদ উপস্থাপনকে إطناب বলে, পক্ষান্তরে সুপরিমিত উপস্থাপনকে مساواة বলে।

তবে মনে রাখতে হবে যে, বক্তব্য উপস্থাপনের উপরোক্ত তিনটি পন্থার প্রতিটিরই নিজস্ব ক্ষেত্র রয়েছে এবং বালাগাতসম্মত কারণ বা داعي রয়েছে। তুমি এবং তোমার কালাম তখনই بليغ হবে যখন প্রতিটি পন্থা বা أسلوب নিজস্ব ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে এবং স্থান-কাল-পাত্রের দাবী বা مقتضى الحال অনুযায়ী হবে। সুতরাং স্থান- কাল-পাত্রের দাবী যদি হয় إيجاز আর তুমি কর إطناب বা مساواة কিংবা তার উল্টো তাহলে তোমার কালাম বালাগাতের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হবে না এবং তুমি بليغ রূপে স্বীকৃতি পাবে না। এজন্যই বালাগাত শাস্ত্রের ইমামগণ বলেছেন لكل مقام مقال – প্রতিটি স্থানের রয়েছে নিজস্ব 'বক্তব্যরূপ'। আর আল্লামা যামাখশারী (রহঃ) বলেছেন–

كما يَجِبُ على البليغ في مَكانِ الإجمالِ أن يُجْمِلَ و يُوْجِزَ فكذلك الواجِبُ عليه في مَوارِدِ التفصيلِ أَنْ يُفَصِّلَ و يُشْبِعَ .

জাফর বিন ইয়াহয়া আলবারমাকী ছিলেন সর্বমহলে সুস্বীকৃত সাহিত্য ব্যক্তিত্ব। তিনিও একই কথা বলেছেন।

এবার আমরা মূল আলোচনায় অগ্রসর হবো। ভাব প্রকাশের তিনটি পদ্ধতির প্রথম পদ্ধতি হলো الإيجاز।

শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো সংক্ষিপ্ত করা। যেমন বলা হয় أوجز في كلامه তদ্রূপ বলা হয় كلام وجيز

إيجاز -এর পরিচয় সম্পর্কে বালাগাত শাস্ত্র বিশারদগণ বিভিন্ন সংজ্ঞা পেশ করেছেন। তবে সবগুলোর মূল বক্তব্য এই–

إيجاز হলো সহজবোধ্যতার সাথে অধিক ভাব ও মর্মকে স্বল্প শব্দে প্রকাশ করা। অর্থাৎ 'ভাব ও মর্ম'-এর তুলনায় শব্দের পরিমাণ হবে কম তবে তাতে শ্রোতার বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না। উদাহরণ দেখো,

قِفَا نَبْكِ من ذِكْرَى جَبِيْبِي و مَنْزِلِ

এখানে কবি বলছেন, হে বন্ধুদ্বয় একটু দাঁড়াও, আমি আমার বন্ধু ও তার বাস্তুভিটা স্মরণ করে কাঁদি। (কেঁদে দুঃখের বোঝা হালকা করি।)

দেখো, উল্লেখিত ভাবটুকু প্রকাশের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ শব্দ হলো–

يَا صَاحِبَيَّ قِفَا نَبْكِ من ذِكْرَى حَبِيْبِيْ وَ مَنْزِله

এখানে ভাব ও মর্মের তুলনায় শব্দের পরিমাণ অল্প কিন্তু তাতে কবিতার উদ্দেশ্য বুঝতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি; সাধারণ চিন্তাতেই তা বুঝে এসে যায়।

পক্ষান্তরে যদি শব্দ স্বল্পতার কারণে বক্তব্যের উদ্দেশ্য এবং ভাব ও মর্ম অনুধাবনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় এবং গভীর চিন্তাভাবনা ও সূক্ষ্ম পর্যালোচনার মাধ্যমে তা বুঝতে হয় তবে সেটা إيجاز নয় বরং সেটা হলো اخلال। – বালাগাতের মানদণ্ডে এটা একটা বড় দোষ। উদাহরণ দেখো, আরব জাহেলিয়াতের একটি ঝুলন্ত গীতিকার কবি الحارِثُ بْنُ حِلِّزَةَ اليَشْكُرِيُّ বলেছেন–

عِشْ بِجَدٍّ لا يَضِرْكَ النَّوْكُ ما أُوْلِيْتَ جَدًّا
وَ العَيْشُ خَيْرٌ في ظِلَالِ النَّوْكِ مِمَّنْ عاش كَدًّا

সম্পদ সচ্ছলতার ছায়ায় তুমি জীবন যাপন করো। কেননা যতক্ষণ তুমি সম্পদ সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে ততক্ষণ বুদ্ধিহীনতা তোমার কোন ক্ষতি করবে না।

দ্বিতীয় পংক্তির ভাব ও মর্ম হলো–

বুদ্ধিহীনতার ছায়ায় সুখ সচ্ছলতাপূর্ণ জীবন বুদ্ধির ছায়ায় অসচ্ছলতা ও

কষ্টের জীবনের চেয়ে উত্তম।

কিন্তু পংক্তিটিতে প্রয়োজনীয় قرينة ছাড়াই অতিরিক্ত পরিমাণ حذف বা অনুক্তির কারণে চিন্তার কসরত ছাড়া কবির বক্তব্য বুঝে আসে না, বরং প্রথম পংক্তিটি না হলে তো দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য উদ্ধার করাই সম্ভব হতো না।

অনুক্ত শব্দগুলো উচ্চারণে আনলে পূর্ণ ইবারত এরূপ হবে–

وَ العيشُ بِجَدٍّ في ظِلالِ النَّوْكِ خيرٌ ممن عاشَ عَيْشًا كَدًّا في ظلالِ العَقْلِ و الرُّشْدِ ·

إطناب -এর আভিধানিক অর্থ হলো স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে দীর্ঘ করা বা অতিরিক্ত করা। তদ্রূপ দীর্ঘ হওয়া বা অধিক হওয়া। যেমন বলা হয় أطنب النهر নদীটি দীর্ঘ হলো। أطنبت الريح বাতাস তীব্র হলো। তদ্রূপ أطنبت الدواب পশুদল লম্বা কাতার করে চলল। أطنب في العدو দূর পর্যন্ত প্রাণপণ দৌড়ল।

أَطْنَبَ الرجلُ في الكَلامِ أَوِ الوَصْفِ *

লোকটি দীর্ঘ কথা বললো। বিশদ বিবরণ দিল।

পরিভাষায় إطناب অর্থ কোন ভাব ও মর্মকে যে পরিমাণ শব্দে প্রকাশ করা সম্ভব বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে তার চেয়ে অধিক শব্দে তা প্রকাশ করা। উদাহরণ দেখো–

رَبِّ إنى وَهَنَ العَظْمُ منى وَ اشْتَعَلَ الرأسُ شَيْبًا

দেখো, 'আমি বৃদ্ধ ও দুর্বল হয়ে পড়েছি' এই ভাব ও মর্ম প্রকাশের জন্য সমপরিমাণ শব্দ ছিলো كَبِرْتُ وَ ضَعُفْتُ কিন্তু এখানে বেশ কিছু শব্দ অতিরিক্ত যোগ করে বলা হয়েছে– رب إني وهن العظم مني – তদুপরি এতটুকু দ্বারাই বার্ধক্য ও দুর্বলতার বিষয়টি উত্তম রূপে সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা শরীরের মূল স্তম্ভ হলো অস্থিমালা। সুতরাং সেটা দুর্বল হওয়ার অনিবার্য অর্থ হলো বার্ধক্য ও দুর্বলতা। কিন্তু এখানে كبرت و ضعفت -এর পরিবর্তে অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ উদ্দেশ্যহীন নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অনুগ্রহ আকর্ষণকারী ভাষায় দুর্বলতার প্রকাশ। দেখো, দ্বিতীয় পর্যায়ে এই উদ্দেশ্যকে আরো আবেদনপূর্ণ করার জন্য উপমা প্রয়োগ করে বলা হয়েছে, و اشتعل الرأس شيبًا – মাথায় বার্ধক্য প্রোজ্জ্বল হয়েছে। এই যে সংক্ষিপ্ত ভাব ও মর্মকে প্রলম্বিত ভাষায় প্রকাশ করা, এটাই হলো إطناب

অবশ্য ভাব ও মর্মের তুলনায় ভাষা ও বক্তব্যের দীর্ঘায়ন যদি উদ্দেশ্যহীন হয় তাহলে সেটা কিন্তু إطناب হবে না, বরং تطويل বা حشو হবে। উদাহরণ দেখো-

وَ أَلْفَى قَوْلَها كَذِبًا وَ مَيْنًا

তার কথাকে সে মিথ্যা রূপে পেলো।

এখানে كذبا ও مينا শব্দ দু'টি সমার্থক। সুতরাং ভাব ও মর্ম প্রকাশের জন্য যে কোন একটি শব্দই যথেষ্ট ছিলো। অন্য শব্দটি এখানে অপ্রয়োজনীয় এবং তা যোগ করার বিশেষ কোন উদ্দেশ্য বা অর্থবহতা নেই। কিন্তু অতিরিক্ত শব্দটি এখানে নির্ধারিত নেই। এটাকে تطويل বলে।

পক্ষান্তরে و اَعْلَمُ عِلْمَ اليومِ و الأَمْسِ قَبْلِه বাক্যটি দেখো; এখানে الأمس ও قبله শব্দ দু'টি সমার্থক। সুতরাং একটি শব্দ অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় এবং তা সুনির্ধারিত। কেননা الأمس এর অনুপস্থিতিতে قبله শব্দটির ব্যবহার গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা তাতে مرجع সংক্রান্ত বিভ্রাট দেখা দেবে। এটা হলো حشو - মোটকথা, অতিরিক্ত শব্দটিকে যদি চিহ্নিত করা সম্ভব হয় তাহলে সেটা হবে حشو - পক্ষান্তরে চিহ্নিত করা সম্ভব না হলে সেটা হবে تطويل

একজন بليغ তার মনের ভাব ও মর্ম প্রকাশের জন্য স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী যে তিনটি প্রকাশ-পন্থা গ্রহণ করে থাকেন তন্মধ্যে একটি হলো مساواة

তুমি আগেই জেনে এসেছো যে-

إيجاز অর্থ হলো সহজবোধ্যতার সাথে অধিক ভাব ও মর্মকে অল্প শব্দে প্রকাশ করা

إطناب অর্থ হলো বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে ভাব ও মর্মের তুলনায় অধিক শব্দ ব্যবহার করা।

مساواة অর্থ ভাব ও মর্ম এবং কথা ও শব্দ সমপরিমাণ হওয়া। অর্থাৎ শব্দ যে পরিমাণ ভাব ও মর্মও সে পরিমাণ। তদ্রূপ ভাব ও মর্ম যে পরিমাণ কথা ও শব্দও সে পরিমাণ। কোনটি কোনটির চেয়ে কম বেশী নয়।

উদাহরণ রূপে নীচের আয়াতটি দেখো-

وَ من يُطِعِ اللّٰهَ و رسولَه يُدْخِلْه جَنّٰتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَنْهارُ خٰلدِينَ

فيها، و ذلك الفوزُ العظيمُ *

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে তিনি তাকে সেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ, তারা তাতে চিরকাল থাকবে আর সেটাই হলো সুমহান সফলতা।

একটু চিন্তা করলেই তুমি বুঝতে পারবে যে, আলোচ্য আয়াতের শব্দগুলো উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্মের সমপরিমাণে এসেছে। যদি এখানে অতিরিক্ত কোন শব্দ সংযোজনের চেষ্টা করা হয় তাহলে তা উদ্দেশ্যহীন ও অনর্থক হবে। পক্ষান্তরে যদি কোন একটি শব্দ কর্তন করা হয় তাহলে তাতে উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্মের সহজ প্রকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। সুতরাং বোঝা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের ভাব ও ভাষা এবং শব্দ ও মর্মের মাঝে مساواة (বা সুপরিমিতি) রয়েছে।

তবে مساواة প্রসংগে একটি বিষয় আমরা তোমাকে বলতে চাই। তা এই যে, কখনো কখনো একই ভাব ও মর্মকে একাধিক ইবারতে প্রকাশ করা হয় এবং প্রতিটি ইবারত সম্পর্কেই বলা যায় যে, তা ভাব ও মর্মের সমপরিমাণ হয়েছে। সুতরাং উভয় ইবারতই مساواة এর অন্তর্ভুক্ত। অথচ দেখা যায় যে, উভয় ইবরাতের শব্দ-সংখ্যায় তারতম্য রয়েছে।

দেখো, أريد أن أشرب ماء বাক্যটি উদ্দিষ্ট অর্থের পূর্ণ সমপরিমাণ হয়েছে। কোন শব্দ কমবেশী করার উপায় নেই।

পক্ষান্তরে যদি أريد شرب ماء বলি তাহলে সেটাও উদ্দিষ্ট অর্থের পূর্ণ সমপরিমাণ হবে। কোন শব্দ কমবেশী করার অবকাশ থাকবে না। সুতরাং উভয় বাক্যেই مساواة রয়েছে। অথচ প্রথম বাক্যটি শব্দ-সংখ্যায় দীর্ঘতর।

مساواة ও إطناب، إيجاز বা স্থান-কাল-পাত্রের দাবী অনুযায়ী مقتضى الحال প্রয়োগের একটি সুন্দর উদাহরণ তুমি পাবে হযরত মূসা ও খিযির (আঃ)-এর ঘটনাসম্বলিত কোরআনের আয়াতে।

দেখো, মুসা (আঃ) যখন হযরত খিযির (আঃ)-এর অনুগামী হতে চাইলেন এই শর্তে যে, খিযির (আঃ) আল্লাহর পক্ষ হতে যে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছেন তা তাঁকেও শিক্ষা দান করবেন তখন হযরত খিযির (আঃ) বললেন–

إنك لن تستطيعَ مَعِيَ صَبْرًا

তুমি তো আমার সাহচর্যে মোটেই ধৈর্যরক্ষা করতে পারবে না।

তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে, আলোচ্য বাক্যটি উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্মের পূর্ণ সমপরিমাণ। এখানে إيجاز যেমন নেই তেমনি إطناب ও নেই।

যাই হোক হযরত মুসা (আঃ) কোন বিষয়ে নিজে থেকে কোন প্রকার আপত্তি না করার শর্তে হযরত খিযির (আঃ)-এর অনুগামী হলেন। কিন্তু প্রথম বারেই তিনি জাহাজ ফুটো করার বিষয়ে আপত্তি করলেন। তখন হযরত খিযির (আঃ) যথাপূর্ব مساواة -এর পন্থা অনুসরণ করে বললেন–

أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

কিন্তু হযরত মুসা (আঃ) দ্বিতীয়বারও যখন আপত্তি করলেন তখন হযরত খিযির (আঃ) বললেন–

ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

এখানে উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্ম প্রকাশের জন্য لك অংশটি যোগ করার অনিবার্যতা বা প্রয়োজনীয়তা নেই। কেননা, إنك لن تستطيع معي صبرا বক্তব্যটি যে মুসা (আঃ)-এর উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছে তা أسلوب الخطاب থেকেই পরিষ্কার বোঝা গেছে। সুতরাং এই শব্দ সংযোজনে إطناب হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ও উপকারিতা হচ্ছে এই দিকে ইংগিত করা যে, মূসা (আঃ) এমন আচরণ করেছেন যেন তিনি বুঝতেই পারেননি যে, إنك لن تستطيع معي صبرا বলে তাকেই সম্বোধন করা হয়েছিলো। তাই অবস্থার দাবী হলো খিযির (আঃ)-এর পক্ষ হতে বিশেষভাবে এ কথা বলে দেয়া যে, 'আমার সাহচর্যে তুমি কিছুতে ধৈর্যরক্ষা করতে পারবে না' এ কথাটা তোমাকেই সম্বোধন করে বলেছিলাম।

পক্ষান্তরে তৃতীয় আপত্তির মুখে হযরত খিযির (আঃ) إيجاز -এর পন্থা অনুসরণ করে বললেন–

هذا فِراقُ بَيْنِيْ وَبَيْنِكَ

এখানে إيجاز সাব্যস্ত হওয়ার সূত্র এই যে, لانك لن تستطيع معي صبرا এই ভাব ও মর্ম আলোচ্য বক্তব্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অথচ সে জন্য কোন শব্দ প্রয়োগ করা হয়নি।

অতঃপর হযরত খিযির (আঃ) তাঁর প্রতিটি আচরণের হিকমত বর্ণনা করলেন যা তিনি আল্লাহর আদেশেই সম্পন্ন করেছিলেন। সর্বশেষে তিনি

বললেন, ذٰلك تأويلُ ما لم تَسْطِعْ عليه صَبْرًا

এখানে তিনি চূড়ান্ত إيجاز অনুসরণ করে تستطع -এর পরিবর্তে تسطع বলেছেন। কেননা শর্ত ভংগের কারণে সাহচর্যের অবকাশ ফুরিয়ে যাওয়ার পর অতিসংক্ষিপ্ত বচনই হলো অবস্থার দাবী। إطناب কিংবা مساواة -এর কোন داعي বা 'অনুঘটক' এখানে নেই। আর হযরত মুসা (আঃ)-এর মত ব্যক্তিকে هذا فراق بيني و بينك বলে দেয়াই যথেষ্ট। لأنك لم تستطع معي صبرا বলার প্রয়োজন নেই। কেননা সাহচর্যের সম্মত শর্ত ভংগ হওয়ার বিষয়টি তিনি সম্যক অবগত।

মোটকথা, উপরের বিশদ আলোচনা থেকে বোঝা গেলো যে, আলোচ্য আয়াতে مقتضى الحال অনুযায়ী স্ব স্ব স্থানে إيجاز، مساواة ও إطناب প্রতিটিরই সুন্দরতম প্রয়োগ হয়েছে।

خلاصة الكلام

يَختار البلِيغُ لِلتَّعْبيرِ عَمَّا في نَفْسِه مِنَ المَعانِي وَ الأَفْكارِ طريقًا مِنْ طُرُقٍ ثَلاثٍ، فَهُوَ تارةً يُسْلُك طريقَ الإيجازِ و تارةً طريقَ الإطنابِ و تارةً طريقًا وَسَطًا و هي طَرِيقُ المُساوَاةِ، كَما يَقْتِضيهِ حالُ المخاطَبِ ·

وَ الإيجازُ لُغَةً القصرُ و الاختِصارُ، وَ اصْطِلاحًا جمعُ المَعاني الكثيرةِ تحتَ الْأَلفاظِ القليلَةِ معَ الإبانَةِ وَ الإفْصاحِ، فَإِذَا لم يكُنْ واضحَ الدَّلالَةِ على المقصودِ سُمِّيَ اِخْلالاً ·

وَ الإطنَابُ لغةً الإطالَةُ و الزيادة، وَ اصْطِلاحًا زيادَةُ اللَّفظِ على المعنى لِفائدةٍ، فإذا لم يكن في الزيادةِ فائدةٌ سُمِّيَتْ تطويلاً إن كانَتِ الزيادةُ غيرَ متعَيِّنَةٍ، و حَشْوًا إن كانَتْ متعيِّنَةً ·

مثال التطويل : و أَلْفَى قولَها كَذِبًا و مَيْنَا

و مثال الحَشْوُ :

وَ أَعْلَمُ عِلْمَ اليَوْمِ و الأَمْسِ قَبْلَه + وَ لٰكِنِّيْ عن علِمِ مَا في غَدٍ عَمِي

و المساواةُ هي أن تكونَ المعاني بِقَدْرِ الألفاظِ وَ الألفاظُ بِقَدْرِ المعاني، فَكَأَنَّ الألفاظَ قَوالِبُ لِمَعانِيه لا يَزِيدُ بَعْضُها عَلَى بَعْضٍ ·

أقسام الإيجاز

উপরের আলোচনায় إيجاز -এর পরিচয় তুমি জেনেছো এবং উদাহরণের মাধ্যমে তার স্বরূপ আশা করি তোমার সামনে সুস্পষ্ট হয়েছে। এবার আমরা তোমার সামনে إيجاز -এর প্রকার তুলে ধরছি। নীচের উদাহরণগুলো দেখো–

وَجاءَ رَبُّكَ وَ المَلَكُ صَفًّا صَفًّا

(তোমার প্রতিপালকের ফায়সালা সমুপস্থিত হলো এবং ফিরিশতাগণ দলে দলে সমুপস্থিত হলেন।)

আলোচ্য আয়াতে উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্মের তুলনায় শব্দের পরিমাণ কম। কেননা এখানে مضاف কে হযফ করা হয়েছে। আয়াতের পূর্ণ রূপ হলো–

و جاءَ أمرُ ربِّكَ

তদ্রূপ لمن كان يرجو الله এবং يخافون رَبَّهم আয়াত দু'টির পূর্ণ রূপ হলো– لمن كان يرجو رحمةَ الله এবং يخافون عذابَ ربِّهم

সুতরাং বোঝা গেলো যে, এখানেও উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্মের তুলনায় শব্দ কম পরিমাণে রয়েছে।

ق و القرآنِ المجيد بل عَجِبوا أن جاءَهم مُنْذِرٌ منهم

এখানে جواب القسم হযফ করা হয়েছে। মূল রূপ ছিলো–

ق و القرآن المجيد لَتُبْعَثُنَّ

নীচের আয়াতটি দেখো–

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاك الحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ

এখানে একটি বাক্য উহ্য রয়েছে। মূল রূপ ছিলো এই–

فقلنا اضرِبْ بعصاكَ الحجرَ فَضَرَبه بِها فانفجَرَتْ

তদ্রূপ নীচের আয়াতটি দেখো। হযরত শো'আইব (আঃ)-এর কন্যাদ্বয়ের সংগে হযরত মুসা (আঃ)-এর ঘটনা প্রসংগে আল্লাহ বলেছেন,

فَسَقَى لهما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ ربِّ إني لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فقيرٌ، فَجَاءَته إحدَاهما تَمْشِيْ عَلَى اسْتِحَيَاءٍ قالَتْ إنَّ أَبِيْ يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَك أجرَ ما سَقَيْتَ لَنا .

আলোচ্য আয়াতে একাধিক বাক্য উহ্য রয়েছে। সকল উহ্য বাক্য উল্লেখ করলে মূল রূপ দাঁড়াবে এই–

فَقالَ ربِّ إنى لما أنزَلْتَ إلَيَّ من خيرٍ فقيرٌ فذهبَتا إلى أَبِيْهِمَا وَ قَصَّتَا عليهِ أَمْرَ موسى فأَرْسَلَ إليه إِحْدَاهما فجاءَتْه إِحْداهما تَمْشِيْ على اسْتِحْيَاءٍ قالَتْ إِنَّ أبي يدعوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا .

মোটকথা আলোচ্য উদাহরণ গুলোতে إيجاز রয়েছে। কেননা প্রতিটি উদাহরণে উদ্দিষ্টভাব ও মর্মের তুলনায় শব্দ সংখ্যা কম রয়েছে, অথচ তাতে সহজবোধ্যতা ও স্পষ্টতার কোন ব্যাঘাত হয়নি। বলাবাহুল্য যে, এই إيجاز এর উৎস হচ্ছে হযফ। কোথাও হযফের পরিমাণ একটি শব্দ কিংবা একটি বাক্য কিংবা একাধিক বাক্য। এ কারণেই উক্ত إيجاز কে إيجاز الحذف বলে।

এবার নীচের আয়াতটি দেখো,

خُذِ العَفْوَ وَ أْمُرْ بِالعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الجاهِلينَ

মাত্র সাত থেকে নয়টি শব্দ সম্বলিত সুসংক্ষিপ্ত একটি আয়াত, কিন্তু উত্তম চরিত্রের যাবতীয় দিক তাতে তুলে ধরা হয়েছে কেমন আবেদনপূর্ণভাবে! প্রতিটি শব্দ যেন তার ভাব ও মর্ম শ্রোতার অন্তরের অন্তস্থলে পৌছে দিচ্ছে এবং কর্মে ও আচরণে সেগুলোর বাস্তবায়ন ঘটানোর জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করছে।

العفو দ্বারা সম্পর্কচ্ছেদকারীর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা, জুলুমকারীর প্রতি ক্ষমাসুন্দর আচরণ করা, যে তোমাকে দান করে না তাকেও দান করা, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় বোঝানো হয়েছে।

তদ্রূপ الأمر بالعرف (কল্যাণের আদেশ) দ্বারা আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া অবলম্বন, আত্মীয়তা রক্ষা, মিথ্যাচার থেকে জিহ্বাকে সংযত রাখা এবং যাবতীয় মন্দ কর্ম হতে প্রতিটি অংগপ্রত্যংগকে হিফাযত করা, ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় বোঝানো হয়েছে। কেননা নিজে মন্দকর্মে লিপ্ত থেকে অন্যকে সৎকর্মের আদেশ করা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং অন্যকে সৎকর্মের পথে আহ্বান জানানোর আদেশ দানের অর্থ তাকেও তা পালনের আদেশ দান করা।

তদ্রূপ الإعراض عن الجاهلين দ্বারা ধৈর্য, সহনশীলতা এবং দ্বীন-ঈমান নষ্ট করতে পারে এমন যাবতীয় বিষয়ে জাহিল ও মূর্খদের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে পবিত্র রাখা বোঝানো হয়েছে।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতের ভাব ও মর্মকে যদি কোন بليغ তার নিজস্ব ভাষায় প্রকাশ করতে চান তাহলে আরো অধিক শব্দ প্রয়োগ ও বাক্যবিস্তার ছাড়া তার পক্ষে তা সম্ভব হবে না।

চিন্তা করে দেখো, এখানে إيجاز -এর উৎস কিন্তু حذف বা অনুক্তি নয়। বরং শব্দের নিজস্ব অর্থব্যাপকতা ও ভাবসমৃদ্ধি হচ্ছে এর উৎস। এজন্য এ ধরনের إيجاز কে إيجاز القصر বলে।

الضَّعِيفُ أَمِيرُ الرَّكْبِ হাদীছটি সম্পর্কেও একই কথা। মাত্র তিন শব্দের একটি বাক্যে সফরের আদব সর্বাংগ সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। সফরের সময় কাফেলার আমীরের কর্তব্য হলো যাবতীয় বিষয়ে দুর্বল লোকদের প্রতি লক্ষ্য রেখে চলা। সুতরাং দুর্বল লোকটিই যেন কার্যতঃ কাফেলার আমীর হয়ে গেলো। বলাবাহুল্য যে, বিশদ বাক্য বিস্তার ছাড়া সফরের এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি আদব তুলে ধরা সম্ভব নয়।

এবার একজন সাধারণ আরব বেদুঈনের ঈজায ও বালাগাত জ্ঞান দেখো; এক আরব বেদুঈনকে বিরাট উটপাল নিয়ে যেতে দেখে জিজ্ঞাসা করা হলো, এই মাল কার? আরব বেদুঈন স্বতঃস্ফূর্তভাবে জবাব দিলো– لِلّٰهِ فِي يَدِيْ

অর্থাৎ আসল মালিকানা তো আল্লাহর। কেননা তিনিই এগুলো সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁরই জমিনে তাঁর কুদরতে উৎপন্ন ঘাস খেয়ে এগুলো প্রতিপালিত হচ্ছে, তবে নেয়ামত হিসাবে ভোগ করার জন্য এগুলো কিছু দিনের জন্য আমার হাতে দেয়া হয়েছে মাত্র।

জীবন ও সম্পদ সম্পর্কে কী মহামূল্যবান দর্শন সাধারণ এক আরব বেদুঈন কত সহজ সংক্ষেপে তুলে ধরেছে!

আলোচ্য বাক্যের إيجاز গুণ যদি বুঝতে চাও তাহলে তুমি নিজের ভাষায় এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেখো, হয়ত দ্বিগুণ, চতুর্গুণ শব্দেও তুমি তা প্রকাশ করতে পারবে না। যেহেতু এখানেও إيجاز -এর উৎস حذف বা অনুক্তি নয় বরং শব্দের নিজস্ব অর্থবৈশিষ্ট্যই হলো এর উৎস সেহেতু এটা হলো– إيجاز القصر

কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ إيجاز -এর কয়েকটি উদাহরণ এখানে আমরা কোরআন থেকে তুলে ধরছি।

(ক) وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ

আর যে জলযান সমুদ্রে ভেসে চলে মানুষের উপকারী সম্পদ বহন করে।

দেখো, بما ينفع الناس এ ক'টি শব্দ কেমন আশ্চর্য সংক্ষিপ্ততার সাথে যাবতীয় বাণিজ্য পণ্য ও মুনাফা দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, যা সংখ্যায় গুণে শেষ করা সম্ভব নয়।

(খ) أَلاَ لَهُ الخَلْقُ وَ الأَمْرُ এখানে الخلق و الأمر এ দু'টি মাত্র শব্দ সৃষ্টি জগতের সকল বস্তু এবং যাবতীয় আহকাম ও বিধান বেষ্টন করে নিয়েছে। বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করে বলতেন–

مَنْ بَقِيَ له شَيْءٌ فَلْيَطْلُبْه

কারো জানা মতে এখানে আর কোন কিছু অবশিষ্ট থাকলে সে তা খুঁজে দেখুক।

(গ) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه و من يعمَلْ مثقالَ ذرةٍ شرًّا يَرَه

আলোচ্য আয়াত দুটিকে আল্লাহর রাসূল الآية الفاذة الجامعة বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিষয়গত দিক থেকে অবিচ্ছেদ্যতার কারণে এখানে আয়াত দু'টিকে একটি আয়াত বলা হয়েছে। الفاذة (বা অনন্য বলার কারণ এই যে, এমন إيجاز ও সুসংক্ষিপ্ততার সাথে এমন সারগর্ভ ভাব ও মর্ম ধারণের ক্ষেত্রে এই আয়াতের সমতুল্য কোন আয়াত নেই। পক্ষান্তরে جامعة (বা সামগ্রিক) বলার কারণ এই যে, তা সকল মানুষের ছোট বড় ও ভালো মন্দ সকল আমলকে বেষ্টন করেছে। কেননা من অব্যয়টি কোরআনের সম্বোধনযোগ্য প্রতিটি মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

তদ্রূপ يعمل ক্রিয়াটি মানুষের যাহেরী বাতেনী সকল ইচ্ছাকৃত আমলকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

তদ্রূপ مثقال ذرة অংশটি 'মানে ও পরিমাণে' ক্ষুদ্রতম আমল থেকে শুরু করে বিরাটতম আমলকেও বেষ্টন করেছে।

তদ্রূপ شرا ও خيرا শব্দটি نكرة হিসাবে নিঃশর্ত ব্যাপকতা নির্দেশ করে। ফলে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, উত্তম ও মন্দ এবং সুকৃতি ও দুষ্কৃতি সকল কর্ম এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পক্ষান্তরে يره দ্বারা বোঝা গেলো যে, মানুষ দুনিয়াতে কৃত তার প্রতিটি আমলকে দেখতে পাবে। কেননা তা আমলনামায় চিত্র, শব্দ ও কণ্ঠসহ রেকর্ড হয়ে থাকবে।

মোটকথা, এখানে ভাব ও মর্মের এক 'সমুদ্রকে' সামান্য ক'টি শব্দের 'কুজো'তে ধারণ করা হয়েছে। ফলে তা إيجاز -এর অত্যাশ্চর্য এক উদাহরণ রূপে সমুজ্জ্বল হয়েছে।

(ঘ) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ *

যে আদেশ আপনি প্রাপ্ত হন তা সজোরে ঘোষণা করুন এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করুন।

এখানে فاصدع بما تؤمر বাক্যটি যেমন সুসংক্ষিপ্ত তেমনি ভাব ও মর্মসমৃদ্ধ। আলোচ্য আয়াতের إيجاز বর্ণনা প্রসংগে আল্লামা ইবনু আবিল ইছবা فاصدع শব্দটির নিগূঢ় ইংগিত তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন–

"আয়াতের অর্থ হলো, আপনার উপর অবতীর্ণ বিষয় দ্বারা তাদের হৃদয় ফাটিয়ে দিন। অর্থাৎ আপনার নিকট অহী রূপে প্রেরিত সকল বিষয় আপনি সুস্পষ্ট রূপে প্রকাশ করুন। যদিও তার কিছু কিছু অংশ কোন কোন হৃদয়ের জন্য সুকঠিন হয়, ফলে সে সকল হৃদয় ফেটে যায়।"

তিনি আরো বলেন–

"দ্বীনী ও ঈমানী বয়ানকে অপছন্দকারী হৃদয়ে স্পষ্ট ভাষণের যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় সেটাকে কাঁচের উপর আঘাতের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে আঘাত কাঁচকে চূর্ণ করে না; ফাটল ধরায়। উভয়ের মাঝে সাধারণ যোগসূত্র হলো, হৃদয়ে স্পষ্ট ভাষণের প্রভাব এবং মুখমণ্ডলে তার সন্তোষ-অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ এবং ফাটলগ্রস্ত কাঁচের বহিরাংশে দেখা দেয়া অবস্থার অভিন্নতা।

দেখো, কী ভাবসমৃদ্ধ উপমা! কী অনবদ্য إيجاز ও সুসংক্ষিপ্ততা এবং অন্তর্নিহিত অর্থ ও মর্মের কী আশ্চর্য ব্যাপকতা!

কথিত আছে, জনৈক আরব বেদুঈন এই আয়াত শ্রবণ করামাত্র সিজদায় লুটিয়ে পড়ে বলেছিলেন, "আয়াতের অলৌকিক আলংকারিক সৌন্দর্য আমাকে সিজদাবনত করেছে।"

এই অলংকারজ্ঞান ও বালাগাতবোধ যেদিন তোমার মাঝে সৃষ্টি হবে সেদিন তুমিও কালামুল্লাহর সৌন্দর্যে এমনই অভিভূত হবে এবং এমনই ভাবে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। তবে তোমার সিজদা হবে কালামের উদ্দেশ্য নয়; রাব্বুল

কালামের উদ্দেশ্যে।

(৬) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *

و لكم في القصاص حياة অংশটিও إيجاز القصر এর অন্যতম সুন্দর উদাহরণ। শব্দচয়ন-সৌন্দর্যের সাথে বিন্যাস সৌন্দর্যের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এখানে। সর্বোপরি রয়েছে সুসংক্ষিপ্ততা সত্ত্বেও অর্থ-প্রাচুর্য ও ভাব-সমৃদ্ধি।

দেখো, القصاص حياة দু'টি শব্দের এই ক্ষুদ্রতম বাক্যের মর্মার্থ হলো, হত্যাকারীকে যখন হত্যার শাস্তি হিসাবে কিছাছ রূপে হত্যা করা হবে তখন কারো অন্তরে হত্যার প্রবণতা জাগ্রত হলেও শাস্তির কঠিন দৃষ্টান্ত দেখে 'হত্যাকর্ম' থেকে সে অবশ্যই বিরত হবে। এভাবে একটি কিছাছের প্রতিফল রূপে অসংখ্য প্রাণ রক্ষা পাবে।

এই ভাব ও মর্ম প্রকাশের জন্য বালাগাত ও অলংকার সম্পদের গর্বে গর্বিত আরবরাও একটি সুসংক্ষিপ্ত বাক্য সৃষ্টি করেছিলো এবং তাদের এক ধরনের অহংকার ছিলো যে, এখানে ভাব ও মর্মের অধিকতর আবেদন এবং শব্দ ও বাক্যের অধিকতর সুসংক্ষেপন সম্ভব নয়। তাদের বাক্যটি হলো, القتل أنفى للقتل – কিন্তু আরবদের সকল গর্ব খর্ব করে কোরআন মাত্র দু'টি শব্দে অধিকতর ভাব সমৃদ্ধ রূপে তা তুলে ধরেছে।

শব্দ সংখ্যার পার্থক্য ছাড়াও আরেকটি পার্থক্য এই যে, আয়াতে শব্দের পুনরুক্তিজনিত শ্রুতিকটুতা নেই, কিন্তু তাদের বাক্যে তা রয়েছে। তাছাড়া যে কোন হত্যা ভবিষ্যত-হত্যাকাণ্ড রোধ করে না, বরং একটি হত্যা অনেক সময় লক্ষ হত্যার কারণ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে কিছাছ রূপে যে হত্যা তা অবশ্যই প্রাণ রক্ষাকারী। সুতরাং তাদের বাক্যে অর্থগত বিরাট খুঁত রয়েছে। আরো কয়েকটি পার্থক্য দেখো–

(ক) কিছাছ শব্দ হত্যার বদলে হত্যা, অংগহানির বদলে অংগহানি এবং জখমের বদলে জখম সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। অর্থাৎ قصاص শব্দটি একটি পূর্ণাংগ বিধান সাব্যস্ত করে, কিন্তু القتل শব্দটি একটি মাত্র অবস্থাকে সাব্যস্ত করে।

(খ) حياة শব্দটি মানব প্রাণ যেমন বোঝায় তেমনি নিরাপদ জীবনও বোঝায়। অর্থাৎ قصاص যেমন মানব প্রাণ রক্ষা করে তেমনি সমাজে নিরাপদ জীবনও নিশ্চিত করে অথচ তাদের কালামে শান্তিপূর্ণ নিরাপদ জীবনের ইংগিত নেই।

আশা করি দু'টি বাক্যের তুলনামূলক আলোচনা থেকে তুমি কোরআনের إعجاز ও অলৌকিকত্ব কিছুটা হলেও অনুভব করতে পেরেছো এবং এ কথাও বুঝতে পেরেছো যে, ক্ষুদ্রতম একটি আয়াত পেশ করার যে চ্যালেঞ্জ আল কোরআন মানব জাতির সামনে ছুঁড়ে দিয়েছে মানব জাতি কেন আজো তা গ্রহণ করতে পারেনি এবং ভবিষ্যতেও পারবে না।

এবার হাদীছ শরীফ থেকে إيجاز -এর কয়েকটি নমুনা পেশ করছি। কেননা এ ক্ষেত্রে কালামুল্লাহর পরই হলো হাদীছের স্থান। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বলেছেন– أُوْتِيتُ جَوامِعِ الكَلِمِ وَ اخْتُصِرَ لِيَ الكلامُ اخْتِصارًا – আমি সুসমৃদ্ধ ও সুসংক্ষিপ্ত 'বচন' প্রাপ্ত হয়েছি।

নীচের হাদীছটি লক্ষ করো–

قال رسولُ اللّٰهِ صَلّٰى اللّٰهُ عليه وسلم : اَلْمَعِدَةُ بَيْتُ الدَّاءِ، وَ الْحِمْيَةُ رَأْسُ الدَّواءِ و عَوِّدُوا كلَّ جسمٍ مَا اعْتَادَ .

পাকস্থলী হলো রোগের বাসা এবং 'পথ্য-সংযম' হলো সেরা অষুধ। আর প্রতিটি শরীর যাতে অভ্যস্ত তাতেই তাকে অভ্যস্ত রাখো।

দেখো, এখানে অল্প ক'টি শব্দে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কত বড় বড় সত্য কেমন সুসংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। পৃথিবীর সেরা কোন চিকিৎসা-বিজ্ঞানীর পক্ষেও এর চেয়ে সুসংক্ষেপণ সম্ভব নয়। বরং এর চেয়ে দ্বিগুণ চতুর্গুণ শব্দযোগেও এমন সুন্দর ভাবে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

(খ) ليسَ الغِنَى غِنَى المالِ إنما الغِنَى غِنَى النَّفْسِ

সম্পদ সচ্ছলতা আসল সচ্ছলতা নয়। কেননা কারূনের মত সম্পদ লাভ করলেও অভাববোধ দূর হয় না। বরং মনের সচ্ছলতাই আসল সচ্ছলতা। কেননা সামান্য সম্পদেও তখন অভাববোধ বিলুপ্ত হয়।

তুমি নিজেই চিন্তা করো, এর চেয়ে সহজ সংক্ষেপে এতবড় একটি নীতিশিক্ষা প্রকাশ করা সম্ভব কি না। তা ছাড়া শব্দের বহুল পুনরুক্তিও যে এমন শ্রুতি মধুর হতে পারে তাকি কল্পনা করা যায়!

تَرْكُ الشَّرِّ صَدَقَةٌ হাদীছটি চিন্তা করে দেখো, صدقة শব্দটির প্রয়োগ এখানে কত অর্থবহ হয়েছে। অর্থাৎ অর্থ দান করা যেমন ছাদকা এবং তা দ্বারা যেমন মানুষের উপকার হয় তেমনি মন্দ থেকে বিরত থাকা দ্বারাও নিজের ও মানুষের

কল্যাণ সাধিত হয়। সুতরাং তাতেও ছাদকার ছাওয়াব হতে পারে, যদি তুমি সেই নিয়ত করো।

এবার আরবদের নিম্নোক্ত বাক্যগুলোর إيجاز সৌন্দর্য লক্ষ্য করো–

أُولَئِكَ قَوْمٌ جَعلوا أَمْوالَهم مَنادِيْلَ لِأَعْراضِهِمْ

অর্থাৎ মর্যাদা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে তারা অর্থ ব্যয়ে কার্পণ্য করে না। রুমাল দ্বারা যেমন শরীরের ও মুখের ঘাম ও ময়লা মুছে তারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তেমনি নিজেদের ইজ্জত আবরু ও মর্যাদাকে নিষ্কলংক রাখার জন্য অকাতরে সম্পদ ব্যয় করে। শরীর ও মুখের পরিচ্ছন্নতার তুলনায় রুমাল যেমন তুচ্ছ, ইজ্জত আবরুর মুকাবেলায় সম্পদ তাদের কাছে তেমনি তুচ্ছ। বলাবাহুল্য যে, مناديل শব্দটির প্রয়োগই এই অর্থব্যাপকতা ও ভাবসমৃদ্ধির উৎস।

عِظِ النَّاسَ بِفِعْلِكَ وَ لا تَعِظْهُمْ بِقَوْلِكَ

এ বাক্যটির ভাবদর্শন ও অর্থব্যাপকতা সম্পর্কে চিন্তা করার ভার আমরা তোমার উপর ছেড়ে দিলাম।

আশা করি উপরের এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে إيجاز القصر সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা তুমি পেয়েছো।

خلاصة الكلام

الإيجازُ قِسْمانِ :

إيجازُ حذفٍ و مَدارُ الإيجازِ هنا على حَذْفِ حَرْفٍ أَوْ كَلِمَةٍ أو جُمْلَةٍ أو أكثرَ من جُمْلَةٍ معَ قرينةٍ تُعَيِّنُ المحذوفَ .

وَ إيجازُ قَصْرٍ، و مَدارُ الإيجازِ هنا عَلَى أَنْ يَتَضَمَّنَ ألفاظٌ قليلَةٌ معانِيَ كثيرةً و أفكارًا سامِيَةً و أَغْراضًا مُتَنوِّعَةً .

و هذا النوعُ مِنَ الإيجازِ هو مَرْكَزُ عِنايَةِ البُلَغاءِ و به تَتَفاوَتُ أَقْدارُهم .

وَ لِلْقرآنِ الكريمِ فيه إِعجازٌ لا يُدْرِكُه بَشَرٌ .

و لِلسُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ حَظٌّ أَوْفَرُ يَقْرُبُ مِنْ حَدِّ الإيجَازِ .

الإطناب و دواعيه

ইতিপূর্বে তুমি জেনে এসেছো যে, মনের ভাব ও মর্ম প্রকাশের ক্ষেত্রে إطناب হচ্ছে إيجاز এর বিপরীত। অর্থাৎ ইজায হচ্ছে কম সংখ্যক শব্দে অধিক ভাব ও মর্ম প্রকাশ করা। পক্ষান্তরে إطناب হচ্ছে উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্মের জন্য অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করা। তবে বালাগাতের দৃষ্টিকোণ থেকে অতিরিক্ত শব্দটি ব্যবহারের কোন উদ্দেশ্য ও উপকারিতা অবশ্যই থাকবে।

মোটকথা, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ভাব ও মর্মের অতিরিক্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়। বালাগাতের পরিভাষায় এগুলোকে دواعي الإطناب বলে। তদ্রূপ বিভিন্ন পন্থায় إطناب বা অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ করা হয়। এগুলোকে طرق الإطناب বলে। এখানে আমরা دواعي الإطناب ও طرق الإطناب সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১. নীচের আয়াতটি দেখো–

تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ و الرُّوْحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

ফেরেশতাগণ এবং 'রূহ' ঐ রাত্রে (সারা বছরের প্রতি নির্ধারিত বিষয় নিয়ে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে অবতরণ করে।

এখানে الروح দ্বারা জিব্রীল (আঃ) উদ্দেশ্য। আর তিনি যেহেতু الملائكة -এর অর্থব্যাপকতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন সেহেতু আমরা বলতে পারি যে, এখানে الروح শব্দটিতে إطناب হয়েছে। طريق الإطناب (বা ইতনাবের পন্থা) হলো ذكر الخاص بعد العام অর্থাৎ ব্যাপকতর শব্দের পর বিশিষ্ট শব্দ উল্লেখ করা।

জিবরীল (আঃ)-এর প্রসংগ স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাঁর মর্যাদা প্রকাশ করা এবং এদিকে ইংগিত করা যে, বিশিষ্টতা ও মর্যাদাগত স্বাতন্ত্র্যের কারণে যেন তিনি ফিরিশতাকুল থেকে আলাদা কোন সৃষ্টি, অর্থাৎ এখানে মর্যাদাগত স্বাতন্ত্র্যকে সত্তাগত স্বাতন্ত্র্যের স্থলবর্তী ধরা হয়েছে এবং সে কারণেই الروح কে الملائكة এর উপর عطف করা হয়েছে, যা معطوف ও معطوف عليه এর ভিন্নতা দাবী করে। মোটকথা, এখানে إطناب -এর উদ্দেশ্য হলো تَعظِيمُ شَأْنِ الخَاصِّ এবং إطناب -এর পন্থা হলো ذِكْرُ الخَاصِّ بعدَ العامِّ

নীচের আয়াতটি সম্পর্কেও একই কথা।

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطَى

এখানে الصلاة الوسطى বা আছরের নামাযকে আলাদা ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, অথচ তা الصلوات এর অর্থ ব্যাপকতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে উক্ত নামাযের মর্যাদাগত বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব প্রকাশ করা।

নীচের আয়াতে বিদ্যমান إطناب -কেও একই ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে–

وَ لْتَكُنْ مِنْكُم أُمَّةٌ يَدعونَ إلى الخَيْرِ وَ يأمرون بِالمَعْروفِ و يَنْهَوْنَ عَنِ المُنْكَرِ

দেখো, الأمر بالمعروف ও النهي عن المنكر বিষয় দু’টি الدعوة إلى الخير -এর عموم বা অর্থ ব্যাপকতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ خَصَّهُما مَرَّةً ثانِيَةً بِالذِّكْرِ تَنْبِيْهًا عَلَى فَضْلِهِمَا الخَاصِّ

২. إطناب -এর আরেকটি পন্থা হলো ذكر العام بعد الخاص বা বিশিষ্ট শব্দের পর ব্যাপকতর শব্দ উল্লেখ করা। অর্থাৎ এটা প্রথমোক্ত পন্থার ঠিক বিপরীত। উদাহরণ হিসাবে নীচের আয়াতটি দেখো–

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَ لِوَالِدَيَّ وَ لمن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ

এখানে المؤمنين ও المؤمنات শব্দ দু’টির ব্যাপক পরিসরে হযরত নূহ (আঃ) নিজে, তাঁর পিতা-মাতা এবং ঈমান গ্রহণ করে যারা তাঁর পরিবারভুক্ত হয়েছে, সকলেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এই اسلوب বা শৈলী প্রয়োগে লাভ হয়েছে এই যে, উল্লেখিত খাছ ব্যক্তিগণ দুবার মাগফেরাতের দু‘আ লাভ করেছেন। প্রথমবার বিশেষভাবে, দ্বিতীয়বার অন্যান্য মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সাধারণভাবে। বলাবাহুল্য যে, দুইবার উল্লেখের মাধ্যমে خاص -এর প্রতি অধিক যত্ন ও সুদৃষ্টি প্রকাশ করাই হচ্ছে আলোচ্য إطناب -এর উদ্দেশ্য।

৩. এবার নীচের আয়াতটি দেখো–

وَ قَضَيْنا إليهِ ذلكَ الأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هٰؤلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ

আমি তার নিকট এই প্রত্যাদেশ রূপে ফায়সালা পাঠালাম যে, প্রত্যুষে এদের মূল উপড়ে ফেলা হবে।

এখানে الأمر দ্বারা যে ফায়সালার প্রতি অস্পষ্টভাবে ইংগিত করা হয়েছে

أن دابر هؤلاء দ্বারা দ্বিতীয় পর্বে সেটাকে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, ... أن دابر هـؤلاء অংশটি হচ্ছে অতিরিক্ত এবং এখানে طريق الإطناب হচ্ছে الإيضاح بعد الإبهام

আশা করি এ কথা তুমি বুঝেছো যে, কোন বিষয়কে প্রথমে অস্পষ্টভাবে প্রকাশ করলে শ্রোতার মনে বিষয়টি বিশদভাবে জানার একটা কৌতূহল সৃষ্টি হয়। পরে যখন বিষয়টি বিশদভাবে বলা হয় তখন শ্রোতার অন্তরে তা দৃঢ়মূল হয় এবং স্থিরভাবে বসে। পক্ষান্তরে শ্রোতার কৌতূহল ও মনোযোগ আকর্ষণ না করে প্রথমেই বিশদভাবে কোন বিষয় বলে দেয়া হলে তা শ্রোতার অন্তরে ততটা রেখাপাত করে না। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, এখানে الإيضاح بعد الإبهام -এর মাধ্যমে إطناب করার উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রোতার অন্তরে বক্তব্যকে দৃঢ়মূল করা।

উপরের আলোচনার আলোকে أَمَدَّكم بِمَا ما تَعْلَمُـون أَمَـدَّكم بِأَنْعَامٍ وَ بَنِيْنَ আয়াতটি সম্পর্কে তুমি নিজেই ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৪. মানুষের দু'টি স্বভাব-দুর্বলতা হাদীছ শরীফে এভাবে তুলে ধরা হয়েছে–

يَشِيْبُ ابْنُ آدمَ وَ تَشُبُّ فيه خَصْلَتَانِ، الحِرْصُ وَ طُوْلُ الأَمَلِ

আদমের বেটা বুড়ো হয় আর তার মাঝে দুটো স্বভাব জোয়ান হয়, লোভ ও দীর্ঘ আশা।

দেখো, এখানে কালামের শেষাংশে প্রথমে একটি দ্বিবচন উল্লেখ করা হয়েছে, তারপর দু'টি বিষয় বর্ণনা করে তার ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। এটাকে توشيع বলে। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, توشيع মূলতঃ الإيضاح بعد الإبهام -এরই একটি রূপ এবং এরও উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রোতার অন্তরে বিষয়টিকে দৃঢ়মূল করা।

মোটকথা, এখানে الحـرص و طول الأمل অংশটিতে إطناب রয়েছে এবং طـريق الإطناب হচ্ছে توشيع এবং فائدة الإطناب হচ্ছে تقرير المعنى في النفس

توشيع -এর আরেকটি উদাহরণ দেখো, বিখ্যাত কবি ইবনুরূমী আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহবের প্রশংসা করছেন এভাবে–

إذا أَبو القاسِمِ جادَتْ لَنا يَدُه + لَمْ يُحْمَدِ الأَجْوَدانِ البَحْرُ وَ المَطَرُ

আবুল কাসিমের হস্ত যখন আমাদের উদ্দেশ্যে দান বর্ষণ করে তখন দুই সেরা দানশীল, সমুদ্র ও বৃষ্টির দান তুচ্ছ হয়ে যায়।

وَ إِنْ أَضَاءَتْ لَنَا أَنْوَارُ غُرَّتِهِ + تَضَاءَلَ النَّيِّرَانِ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ

তার ললাটের আলোক উদ্ভাস যখন আমাদের সামনে প্রকাশ পায় তখন দুই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক চাঁদ ও সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যায়।

এখানে الأجودان ও النيران -এর ব্যাখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে البحر و المطر এবং الشمس و القمر

অবশ্য توشيع -এর ক্ষেত্রে দ্বিবচনের পরিবর্তে বহুবচনও হতে পারে। উদাহরণ হিসাবে পিছনের এই কবিতাটি স্মরণ করতে পারো–

ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها ....

এ থেকে আরেকটি বিষয় বোঝা গেলো যে, توشيع যেমন কালামের শেষাংশে হয় তেমনি শুরুতেও হয়, এমন কি মধ্যবর্তী অংশেও হতে দেখা যায়। তবে যেহেতু সাধারণভাবে এটা কালামের শেষাংশে হয় সেহেতু توشيع -এর পরিচয় প্রসংগে এ শর্তটা উল্লেখ করা হয়। আসলে কিন্তু তা অপরিহার্য শর্ত নয়।

৫. إطناب -এর আরেকটি পন্থা হচ্ছে تكرير বা পুনরুক্তি। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এটা করা হয়, যেমন تاكيد الإنذار বা হুঁশিয়ারিকে জোরদার করা। উদাহরণ রূপে নীচের আয়াতটি দেখো–

كَلَّا سَوْفَ تعلَمُوْنَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تعلَمُوْنَ

প্রথমটি দ্বারা ঐ সকল লোকদেরকে সতর্ক ও হুঁশিয়ার করা হয়েছে যাদেরকে দুনিয়ার প্রতিযোগিতা আখেরাতের ব্যাপারে গাফেল করে রেখেছে। পক্ষান্তরে আয়াতটির পুনরুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সতর্কীকরণ ও হুঁশিয়ারিকে জোরদার করা, যাতে শ্রোতার অন্তরে তা ভয় ও আলোড়ন সৃষ্টি করে। এটাই হচ্ছে অতিরিক্ত ভাব ও মর্ম যা পুনরুক্তিগত إطناب দ্বারা এখানে লব্ধ হয়েছে।

কখনো কখনো দীর্ঘ বক্তব্যের মাঝে কোন একটি বক্তব্য নির্ধারিত ব্যবধানে বারবার উচ্চারণ করা হয়, যেমন রাজপথে নির্ধারিত দূরত্বে বহু দূর পর্যন্ত জাতীয় পতাকা দ্বারা সজ্জা করা হয়। কিংবা একটি বাণী সম্বলিত ফলক পথের মোড়ে মোড়ে নির্ধারিত ব্যবধানে স্থাপন করা হয়। বলাবাহুল্য যে, নির্ধারিত দূরত্বে স্থাপিত পতাকার কিংবা বাণী-ফলকের সজ্জা যে 'আবহ' সৃষ্টি করে এবং দর্শক চিত্তে যে আবেদন ও প্রভাব বিস্তার করে তা একটি মাত্র প্রতাকা বা

একটিমাত্র ফলক দ্বারা হতো না। তদ্রূপ দীর্ঘ বক্তব্যের ফাঁকে ফাঁকে নির্ধারিত ব্যবধানে কোন একটি বাণী ও বক্তব্যের বারংবার উচ্চারণ যে ভাবগত আবহ সৃষ্টি করে এবং শ্রোতা চিত্তে যে অনুভব, অনুভূতি ও আবেদন জাগ্রত করে তা শুধু একবারের উচ্চারণে কখনোই হবে না।

এ কারণেই সুরা রহমানে আল্লাহর গুণ ও কুদরত, অনুগ্রহ ও নেয়ামত এবং তিরস্কার ও পুরস্কার সম্বলিত একেকটি খণ্ড বক্তব্যের পর বারংবার فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ আয়াতটি উচ্চারিত হয়েছে। মোটকথা, একত্রিশবারের এই পুনঃপুনঃ উচ্চারণ একদিকে যেমন শৈল্পিক ও আলংকারিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে তেমনি অন্যদিকে একটি ভাবগত 'আবহ' সৃষ্টি করেছে, যা শ্রোতাকে সমগ্র বক্তব্যের সাথে পূর্ণ একাত্ম হতে উদ্বুদ্ধ করে। তদুপরি فبأي آلاء ربكما تكذبان -এর পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ যেন জিন ও ইনসানকে এ বিষয়ে সতর্ক করছে যে, চলমান যাত্রা পথের বাঁকে বাঁকে এবং বহমান জীবন নদীর তরংগে তরংগে আল্লাহর অসংখ্য গুণ ও কুদরত এবং অনুগ্রহ ও নেয়ামত স্মরণ করা বান্দার অবশ্য কর্তব্য। যেন যাত্রা পথের কোন বাঁক এবং জীবন নদীর কোন তরংগ গাফলাত ও বিস্মৃতির অতলে তাকে তলিয়ে দিতে না পারে।

তদ্রূপ سورة المرسلات -এর فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِيْنَ আয়াতটি কেয়ামতপূর্ব বিভিন্ন আলামতের বিবরণ এবং হাশর নশরের বিভিন্ন দৃশ্য উপস্থাপনের ফাঁকে ফাঁকে হুঁশিয়ারবাণী রূপে মোট নয়বার উচ্চারিত হয়েছে। এতে একদিকে যেমন শৈল্পিক ও আলংকারিক সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে তেমনি ভয় ও ভীতির একটা আবহ সৃষ্টি হয়েছে, যা অতিবড় অবিশ্বাসীকেও কুফুরি ও হঠকারিতা পরিত্যাগ করে সত্যের কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য করবে। তাছাড়া যাদের উদ্দেশ্যে এই বক্তব্য, তাদের অবস্থাও আয়াতটির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ দাবী করছিলো। কেননা তাদের পক্ষ হতে ছিলো অব্যাহত হঠকারিতা; সুতরাং আল্লাহর পক্ষ হতেও উচ্চারিত হয়েছে অব্যাহত হুঁশিয়ারি।

একইভাবে سورة القمر এ–

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ

উপদেশ গ্রহণের জন্য কোরআনকে আমি সহজ করেছি, সুতরাং আছে কি কোন চিন্তাশীল।

আয়াতটি চারবার চারজন নবীর কাওমকে ধ্বংস করার সংক্ষিপ্ত বিবরণের পর উচ্চারিত হয়েছে। কেননা কোরআনে বর্ণিত বিগত জাতিবর্গের ঘটনার উদ্দেশ্যই হচ্ছে চিন্তার মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ। পক্ষান্তরে আয়াতের মর্মও হচ্ছে কোরআনকে চিন্তা ফিকির ও উপদেশ-এর মাধ্যম রূপে গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

সুতরাং নির্ধারিত ব্যবধানে আয়াতটির পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ আলংকারিক ও শৈল্পিক সৌন্দর্য যেমন সৃষ্টি করেছে তেমনি এমন একটা ভাবগত অবস্থা সৃষ্টি করেছে যা শ্রোতাকে কোরআন-চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে এবং এই অনুভূতি জাগ্রত করে যে, বিগত জাতিগুলো তাদের উপর অবতীর্ণ কিতাব থেকে চিন্তা ও উপদেশ গ্রহণ না করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে. সুতরাং উম্মতে মুহম্মদীর কর্তব্য হলো বিগত জাতির ভুলের পুনরাবৃত্তি না করা; বরং কোরআনকে চিন্তা ও উপদেশের মাধ্যম রূপে গ্রহণ করা।

মোটকথা, নির্ধারিত ব্যবধানে কোন বাক্যের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ দ্বারা সৃষ্ট إطناب -এর উদ্দেশ্য হলো শৈল্পিক ও আলংকারিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করা এবং সমগ্র বক্তব্য গ্রহণের অনুকূল 'আবহ' সৃষ্টি করা।

৬. নীচের আয়াতটি দেখো–

وَ إِنْ تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَغْفِرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غفورٌ رَحِيمٌ *

যদি তোমরা মার্জনা করো, ক্ষমা করো এবং মাফ করো তাহলে তা তোমাদের জন্য উত্তম হবে। কেননা আল্লাহ্ ক্ষমাকারী, দয়ালু।

এখানে تعفوا – تصفحوا ও تغفروا শব্দ তিনটি সমার্থক। সুতরাং শেষ দু'টি শব্দে পুনরুক্তি জাতীয় إطناب হয়েছে। বলাবাহুল্য যে, ক্ষমার প্রতি উদ্বুদ্ধ করাই হলো এই তাকরারের উদ্দেশ্য।

এখানে যেমন ترغيب -এর উদ্দেশ্যে تكرار হয়েছে তেমনী বিপরীত ক্ষেত্রে ترهيب -এর উদ্দেশ্যেও تكرار হতে পারে।

৭. এবার নীচের আয়াতটি দেখো–

لا تَحْسَبَنَّ الذين يَفرحُونَ بِما أُوتُوا وَ يُحِبُّوْنَ أن يُحْمَدُوا بِما لم يَفْعَلُوا فلا تَحْسَبَنَّهم بِمَفَازَةٍ مِنَ العَذابِ *

তাদেরকে তুমি মনে কর না যারা নিজেদের মন্দকর্মে উৎফুল্ল এবং

পুণ্যকর্মনা করেও প্রশংসা লাভের অভিলাষী। তাদেরকে তুমি আযাব থেকে বেঁচে গেছে মনে করো না।

এখানে بمفازة من العذاب -এর تعلق মূলতঃ বাক্য প্রারম্ভের لا تحسبن -এর সংগে। কিন্তু فعل ও তার متعلق -এর মাঝে ব্যবধান ও দূরত্ব দীর্ঘ হওয়ার কারণে متعلق এর সংলগ্ন পূর্বে فعل কে পুনরুক্ত করা হয়েছে। কেননা দীর্ঘ ব্যবধানের কারণে শ্রোতার চিন্তায় প্রথমোক্ত শব্দটি অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। ফলে بمفازة من العذاب -এর تعلق নির্ধারণ করা তার জন্য কষ্টসাপেক্ষ হতে পারে। কিন্তু متعلق -এর সংলগ্নপূর্বে فعل টির পুনরুক্তির ফলে এই অসুবিধা দূর হয়ে গেলো। মোটকথা, تكرار বা পুনরুক্তির মাধ্যমে إطناب -এর একটি কারণ হলো طول الفصل

নীচের আয়াতটি সম্পর্কেও একই কথা–

ثُمَّ إِنَّ رَبَّك لِلَّذين هاجَروا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثم جاهَدوا وَ صَبَروا، إِنَّ ربَّكَ من
بَعْدِها لَغَفُوْرٌ رحِيمٌ *

এখানে إن ও তার اسم কে পুনরুক্ত করার কারণ হচ্ছে إن এর اسم ও خبر -এর মাঝে طول الفصل বা দীর্ঘ ব্যবধান।

এ প্রসংগে নীচের কবিতাটিও দেখতে পারো।

لَقَدْ عَلِمَ الحَيُّ اليَمانُوْنَ اَنَّنِيْ + إِذَا قلتُ أَمَّا بَعْدُ أَنِّي خَطِيْبُها

ইয়ামানী গোত্রগুলো জানে যে, আমি যখন দাঁড়িয়ে أما بعد বলি, তখন আমি হই তাদের (শ্রেষ্ঠ) মুখপাত্র ও বক্তা।

طول الفصل -এর ক্ষেত্রে পুনরুক্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যদি বুঝতে চাও তাহলে مكرَّر বা পুনরুক্ত শব্দটি বাদ দিয়ে উদাহরণগুলো একবার পড়ো এবং উভয় অবস্থার মাঝে তুলনা করে দেখো।

مَعْنُ بْنُ زائدةَ -এর মৃত্যুতে حُسين بن مُطير যে শোকগাথা রচনা করেছেন তার অংশবিশেষ দেখো–

فَيَا قَبْرَ مَعْنٍ أَنْتَ أَوَّلُ حُفْرَةٍ + مِنَ الأَرْضِ خُطَّتْ لِلسَّمَاحَةِ مَوْضِعَا

মাআনের সমাধি হে! ভূগর্ভের তুমিই প্রথম স্থান যাকে মহানুভবতার ক্ষেত্র রূপে নির্ধারণ করা হয়েছে।

وَيَا قَبْرَ مَعْنٍ كيفَ وارَيْتَ جُوْدَه + وَقد كانَ منه البَرُّ و البَحْرُ مُتْرَعَا

মাআনের সমাধি হে! কিভাবে তুমি তার দানশীলতা মাটি চাপা দিলে, অথচ জল-স্থল তার দানশীলতায় ছিল পরিপূর্ণ।

يا قبر معن অংশটির পুনরুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে শোকসন্তপ্ততা প্রকাশ করা।

নীচের আয়াতটি দেখো–

وَ قالَ الذي آمَنَ يا قومِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشادِ، يا قومِ إِنَّما هذه الحياةُ الدنيا مَتَاعٌ*

যিনি ঈমান এনেছেন তিনি বললেন, হে আমার কাওম! তোমরা আমার অনুসরণ করো; তোমাদেরকে আমি সরল পথ প্রদর্শন করবো। হে আমার কাওম! এই পার্থিব জীবন হচ্ছে ক্ষণিক ভোগের বিষয়।

এখানে সম্বোধন অংশের পুনরুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে কাওমের প্রতি তার হৃদ্যতা প্রকাশ করা এবং তাদের অন্তরে তার প্রতি কোমল অনুভূতি সৃষ্টি করা, যাতে তারা তার দাওয়াত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়।

এ ছাড়া আরো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে تكرار -এর মাধ্যমে إطناب করা হয়ে থাকে। যেমন গর্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে, প্রশংসা বা নিন্দা করার উদ্দেশ্যে।

৮. নীচের আয়াতটি দেখো,

وَ يَجْعَلُونَ لِلّٰهِ البَنَاتِ، سُبْحٰنه وَ لهم ما يَشْتَهُون

তারা আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান সাব্যস্ত করে– তিনি চির পবিত্র– অথচ তাদের জন্য হলো তাদের পছন্দনীয় জিনিস।

দেখো, يجعلون لله البنات এবং و لهم ما يشتهون বাক্য দু'টির মাঝে অর্থগত নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কেননা প্রথম বাক্যে মুশরিকদের পক্ষ হতে আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান এবং দ্বিতীয় বাক্যে নিজেদের জন্য তাদের পছন্দনীয় পুত্রসন্তান সাব্যস্ত করার কথা রয়েছে। সুতরাং উভয় বাক্যের সংলগ্ন উচ্চারণই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু বাক্যদু'টির মাঝে سبحانه বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে, যার সাথে পূর্বাপর বাক্যদু'টির ব্যাকরণগত কোন সম্পর্ক নেই। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে অবিলম্বে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করা। কেননা আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান সাব্যস্ত করা এমনই জঘন্য বিষয় যে, অবিলম্বে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করা

এমনই জরুরী হয়ে পড়েছে যে, ولهم ما يشتهون বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করারও অবকাশ নেই।

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رسولَه الرُّؤْيَا بِالحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ المسجِدَ الحرامَ إن شَاءَ اللّٰهُ آمنين
مُحَلِّقِيْنَ رُؤُوْسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ لا تَخَافُوْنَ *

আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চাহে তো অবশ্যই তোমরা নিরাপদে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে। মাথা মুড়ানো ও মাথা ছাঁটা অবস্থায়। তোমাদের কোন ভয় হবে না।

দেখো, এখানে একটি বাক্যের দু'টি অংশ مفعول فيه ও حال এর মাঝে ভিন্ন একটি বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে মুমিনদেরকে ভাবিষ্যত সম্পর্কিত যে কোন বক্তব্য إن شاء الله যুক্ত করে বলার শিক্ষা দান করা। যেহেতু এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সেহেতু বাক্য সমাপ্তির অপেক্ষা না করে যথাসম্ভব দ্রুত তা তুলে ধরা হয়েছে, যাতে বিষয়টির গুরুত্ব প্রকাশ পায়।

তদ্রূপ নীচের আয়াতটি দেখো–

فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجومِ * وَ إِنَّه لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلمون عَظِيمٌ * إِنَّه لَقُرْآنٌ كريمٌ *

সুতরাং আমি শপথ করছি তারকারাজির অস্তাচলের। নিঃসন্দেহে এটা – যদি তোমরা জানতে – এক মহা শপথ। নিঃসন্দেহে এটা মহিমান্বিত কোরআন, যা এক গুপ্ত গ্রন্থে সংরক্ষিত।

এখানে قسم ও جواب القسم এর মাঝে ... إنه لقسم বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রথম সুযোগেই আলোচ্য কসমের অসাধারণত্ব সম্পর্কে مخاطب দের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, যাতে কসমের অসাধারণত্ব অনুধাবনপূর্বক جواب القسم -এর প্রতি তারা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে মনোযোগ প্রদান করে।

এখানে لو تعلمون অংশটি সম্পর্কেও একই কথা। একটি বাক্যের صفة ও موصوف -এর মাঝে তা এসেছে। উদ্দেশ্য হচ্ছে مواقع النجوم -এর গুরুত্ব ও বিশেষত্ব সম্পর্কে مخاطب দের অজ্ঞতার প্রতি ইংগিত করা।

আবার দেখো, কবি عوف بن ملحم شيباني তার আপন প্রিয়জনকে সম্বোধন করে নিজের বার্ধক্য-দুর্বলতার বিলাপ করেছেন–

اِنَّ الثَّمانِيْنَ وَ بُلِّغْتَها قَدْ اَحْوَجَتْ سَمْعِيْ إِلَى تُرْجُمانِ

অর্থাৎ আশি বছরের বার্ধক্য আমার শ্রবণশক্তিকে পরনির্ভর করে দিয়েছে। কমনা করি, আপনিও এরূপ দীর্ঘায়ু লাভ করুন।

দেখো, الثمانين শব্দটির সুযোগটুকু লুফে নিয়ে কবি তার প্রিয়জনের জন্য দীর্ঘায়ুর দু'আ করে দিয়েছেন এবং সেটাকে إن -এর اسم ও خبر -এর মাঝে নিয়ে এসেছেন। (বাংলা অনুবাদে কিন্তু এ অলঙ্কার বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়নি।)

মোটকথা, পিছনের উদাহরণগুলোতে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে একটি বাক্যের দু'টি অংশের মাঝে কিংবা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দু'টি বাক্যের মাঝে ভিন্ন একটি বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য পূর্বাপরের সাথে বাক্যটির ব্যাকরণগত কোন সম্পর্ক নেই। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় الاعتراض – আর এটা হচ্ছে إطناب -এর একটি উল্লেখযোগ্য পন্থা।

তৃতীয় উদাহরণটি দেখো, এখানে মধ্যস্থ বাক্যটির মাঝে আবার অন্য একটি মধ্যস্থ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে। এটাকে اعتراض في داخل الاعتراض বলে।

اعتراض একটি বাক্য দ্বারা যেমন হয় তেমনি একাধিক বাক্য দ্বারাও হয়ে থাকে। উদাহরণ দেখো–

رَبِّ إِنِّيْ وَضَعْتُهَا أُنْثٰى وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثٰى، وَ إِنِّيْ
سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ*

ইয়া রাব, আমি দেখি তাকে কন্যা রূপে প্রসব করলাম! বস্তুতঃ সে যা প্রসব করেছে সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালই জানেন। (তার কাঙ্ক্ষিত) পুত্র সন্তান তো (প্রসূত) কন্যা সন্তানের সমতুল্য নয়। আমি তার নাম মারয়াম রাখলাম।

৯. নীচের আয়াতটি লক্ষ্য করো। হযরত মুসা (আঃ)-কে একটি معجزة দান করা উপলক্ষে আল্লাহ আদেশ করলেন–

وَ أَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوْءٍ

দেখো, আলোচ্য আয়াতের উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্ম এইটুকু যে, তুমি তোমার হাত তোমার বগলদেশে প্রবেশ করাও, তা শুভ্র অবস্থায় ফিরে আসবে। সুতরাং من غير سوء অংশটুকু অতিরিক্ত। কিন্তু তা উদ্দেশ্যহীন নয়। কেননা تخرج بيضاء থেকে এমন একটা ভুল ধারণা হতে পারে যে, হাতের শুভ্রতা শ্বেতরোগ বা অন্য কোন অসুস্থতার কারণে হবে হয়ত। এই ভুল ধারণার সম্ভাবনা দূর করার জন্য উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্মের অতিরিক্ত রূপে من غير سوء কথাটি যোগ করা হয়েছে।

অর্থাৎ কোন প্রকার ব্যাধি ছাড়াই তা শুভ্র অবস্থায় বেরিয়ে আসবে। মূল বক্তব্য থেকে সম্ভাব্য ভুল ধারণা দূর করার জন্য যে إطناب করা হয় বালাগাতের পরিভাষায় তাকে احتراس বলে।

احتراس -এর কাব্য-উদাহরণ হিসাবে নীচের কবিতা পংক্তিটি দেখো। বিখ্যাত দানবীর কাতাদাহ বিন মাসলামাহ আলহানাফী কবি তরফাতুবনুল আবদ -এর গোত্রকে দুর্ভিক্ষের বছর অকাতরে দান করেছিলেন। এ উপলক্ষে কৃতজ্ঞ কবি মহানুভব কাতাদাহর উদ্দেশ্যে যে 'প্রশস্তিকা' রচনা করেছিলেন, পংক্তিটি সেখান থেকে নেয়া।

فَسَقَى دِيارَكَ - غَيْرَ مُفْسِدِها - صَوْبُ الرَّبيعِ وَ دِيْمَةٌ تَهْمِيْ

বসন্তকালীন বারিধারা ও অঝোর বর্ষণ – কোন ক্ষতি না করে – আপনার স্বদেশভূমিকে যেন সিঞ্চিত করে।

দেখো, ক্ষতিকর অতিবর্ষণ এখানে কবির উদ্দেশ্য বলে দুষ্ট লোকেরা ধারণা করতে পারতো। কিন্তু কবি غير مفسدها উল্লেখ করে ভুল ধারণার সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন। সুতরাং غير مفسدها অংশটুকু হচ্ছে احتراس পর্যায়ের إطناب

একই ভাবে নীচের কবিতা পংক্তিটি দেখো–

حَلِيمٌ إذا مَا الحِلْمُ زَيَّنَ أَهْلَه + مَعَ الحِلْمِ في عَيْنِ العَدُوِّ مَهِيْبُ

কবি শুধু বলতে চান যে, তার প্রিয়জন সহনশীল। এতটুকুর জন্য প্রয়োজনীয় বাক্য হলো هو حليم – (এখানে مسند إليه কে উহ্য করার দ্বারা إيجاز الحذف হয়েছে।) এখন যদি কেউ ভুল ধারণা করে যে, এ সহনশীলতা হয়ত দুর্বলতাজনিত। এই ভুল ধারণার সম্ভাবনা দূর করার জন্য احتراس রূপে কবি إذا ما الحلم زين অংশটুকু বর্ধিত করেছেন। তদ্রূপ এমন ভুল ধারণা হতে পারে যে, সহনশীলতার আতিশয্যের কারণে শত্রুর মোকাবালায় তিনি বুঝি নমনীয়; সেটা দূর করার জন্য দ্বিতীয়বার احتراس রূপে مع الحلم في عين العدو مهيب অংশটুকু বর্ধিত করা হয়েছে। মোটকথা, এখানে পর পর দু'টি احتراس হয়েছে। তরজমা দেখো–

সহনশীলতা মানুষের জন্য যখন শোভন তখন তিনি সহনশীল। কিন্তু সহনশীলতা সত্ত্বেও শত্রুর চোখে তিনি ভয়ংকর।

এক 'অসংযত' কবি দেখো কি বলছেন–

وَ مَا بِيْ إِلَى مَاءٍ سِوَى النِّيْلِ غُلَّةٌ + وَ لَوْ أَنَّهُ - أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ - زَمْزَمُ

নীলনদের পানি ছাড়া আর কিছুতে আমার পিপাসা নেই, হোক না তা – আল্লাহ মাফ করুন – জমজমের পবিত্র পানি।

মিশরীয়দের জীবনে নীলনদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই নীলনদের প্রতি তাদের ভালোবাসা সুগভীর। সেই ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে অসংযত কবি নীলনদকে জমজমের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে বসেছেন। আবার استغفر الله বলে احتراس এর আশ্রয় নিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, জমজমের অবমাননা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু কবি যাই বলুন, এ অপরাধ তার অমার্জনীয়। এ ধরনের কবিতাই হচ্ছে إِلهامٌ مِنَ الشيطانِ বা শয়তানের উপহার।

১০. এবার নীচের আয়াতটি দেখো–

وَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

আপনি বলুন, সত্যের আগমন হয়েছে এবং মিথ্যা অপসৃত হয়েছে। মিথ্যার অপসৃতি অবশ্যম্ভাবী।

দেখো, إن الباطل كان زهوقا বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের ভাব ও মর্মকেই ধারণ করেছে এবং তাকে জোরদার করেছে। সুতরাং তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, এখানে إطناب হয়েছে। এ ধরনের إطناب কে বালাগাতের পরিভাষায় تذييل বলে।

নীচে تذييل -এর আরো দু'টি উদাহরণ দেখো–

مَا كُلُّ مَا يَتَمَنَّى الْمَرْءُ يُدْرِكُهُ + تَأْتِي الرِّيَاحُ بِمَا لَا تَشْتَهِي السُّفُنُ

কবি মুতানাব্বীর এ কবিতাপংক্তি পিছনে কোন্ প্রসংগে গিয়েছে, দেখো স্মরণ করতে পারো কি না।

এখানে ... تأتي الرياح অংশটি পূর্ববর্তী বাক্যের ভাব ও মর্মকেই ধারণ করেছে এবং সমর্থন যুগিয়েছে। সুতরাং এটা হলো تذييل

কবি ইবনে নোবাতাহ সাআদী তার প্রশংসাম্পদের পক্ষ হতে এত অসংখ্য দান ও অনুগ্রহ লাভ করেছেন যে, এখন তার চাওয়া পাওয়ার আর কিছুই নেই। সে কথাটাই তিনি প্রকাশ করেছেন এভাবে–

لَمْ يُبْقِ جُودُكَ لِيْ شَيْئًا آمُلُهُ + تَرَكْتَنِيْ أَصْحَبُ الدنيا بِلَا أَمَلٍ

আপনার দানশীলতা আমার কোন আকাঙ্ক্ষাই অপূর্ণ রাখেনি। আমাকে আপনি এমন করেছেন যে, এখন দুনিয়ার জীবন আমার আকাঙ্ক্ষামুক্ত।

দেখো, এখানে تركْتَنِي أَصْحَبُ الدنيا بِلا أَمَلِ অংশটি تذييل হয়েছে। এখানে তোমাকে আমরা উভয় تذييل এর পার্থক্যটুকু বোঝাতে চাই।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই তুমি বুঝতে পারবে যে, تأتي الرياحُ بما لا تشتهي السفن বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের ভাব ও মর্ম ধারণ করলেও অর্থগতভাবে তা পূরবর্তী বাক্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং পুরো বাক্য-অবয়বের মাঝে একটা প্রবাদবাক্যগত ছাপ রয়েছে। তাই এটাকে আলাদাভাবে একটি প্রবাদবাক্য বা নীতিকথা রূপে ব্যবহার করা যায়। যেমন ধরো, তাকদীরের ফায়সালাকে মেনে নেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে এটাকে তুমি প্রবাদবাক্য হিসাবে ব্যবহার করতে পারো।

কিন্তু تركْتَنِيْ أصحَبُ الدنيا بِلا أَمَلِ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে অর্থগতভাবে জড়িত। এখানে পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য নেই। সুতরাং এটাকে আলাদা করে প্রবাদবাক্য বা নীতিকথা রূপে ব্যবহার করার অবকাশ নেই।

তাহলে বোঝা গেলো, কোন কোন تذييل পূর্ণ স্বতন্ত্র বাক্য হিসাবে প্রবাদবাক্য ও নীতিকথা রূপে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। পক্ষান্তরে কোন কোন تذييل অর্থগতভাবে পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে জাড়িত থাকার কারণে স্বতন্ত্র প্রবাদবাক্য রূপে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

এবার তুমি চিন্তা করে বলো, إن الباطلَ كان زهوقًا বাক্যটি কোন শ্রেণীর تذييل ?

নীচে تذييل -এর আরো দু' একটি উদাহরণ দেখো–

وَ ما جَعلْنا لِبَشَرٍ من قَبْلِكَ الخُلْدَ، أَفَإِينْ مِتَّ فهم الخٰلدون، كلُّ نفسٍ ذائِقَةُ الموتِ

আপনার পূর্ববর্তী কোন মানবের জন্য অমরত্ব সাব্যস্ত করিনি। সুতরাং আপনি যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহলে তারা কি অমর হবে! প্রতিটি প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।

এখানে أفإين مت فهم الخلدون বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের ভাব ও মর্মকে ধারণ করছে এবং তাকে জোরদার করেছে। কিন্তু পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে তা পূর্ণভাবে জড়িত। কেননা অর্থ হলো, যেহেতু আপনি সহ দুনিয়ার কোন মানুষের জন্যই

আমি অমরত্বের ফায়সালা করিনি; সুতরাং আপনি যেমন মৃত্যুবরণ করবেন তেমনি এই মুশরিকরাও মৃত্যুবরণ করবে।

সুতরাং স্বতন্ত্র প্রবাদবাক্য রূপে ব্যবহৃত হওয়ার কাঠামোগত গুণ ও যোগ্যতা বাক্যটির নেই। পক্ষান্তরে তৃতীয় বাক্যটিও একই উদ্দেশ্যে যুক্ত হলেও তাতে অর্থগত পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে এবং নীতিকথা ও প্রবাদবাক্যের গুণ ও চরিত্র তার বাক্যকাঠামোতে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে কিংবা প্রিয়জনের মৃত্যুতে কাওকে সান্ত্বনা দিতে এটাকে তুমি উপদেশ ও নীতিবাক্য রূপে ব্যবহার করতে পারো।

নীচের আয়াতটি সম্পর্কেও একই কথা।

ذٰلك جَزَيْنٰهم بما كَفَروا و هل نُجٰازِيْ إلاَّ الكَفُور

তাদেরকে ঐ প্রতিফল তাদের কুফুরির কারণে দিয়েছি। আর পূর্বোক্ত এই প্রতিফল কাফিরদেরকেই দিয়ে থাকি।

তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছো যে, পরবর্তী বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে অর্থগতভাবে অঙ্গাঙ্গি জড়িত। সতরাং তাতে স্বতন্ত্র প্রবাদবাক্যের চরিত্র নেই।

কিন্তু নীচের কবিতাটি দেখো–

وَ لَقَدْ عَلِمْتُ لَتأتِيَنَّ مَنِيَّتِيْ + إِنَّ المَنايَا لا تَطِيْشُ سِهامُها

আমি জানি মৃত্যু আমার (কখনো না কখনো) আসবে। মৃত্যুর তীরগুচ্ছ কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।

এখানে যদিও দ্বিতীয় বাক্যটি প্রথমোক্ত বাক্যের ভাব ও মর্মকে ধারণ করছে এবং তাকে জোরদার করছে কিন্তু অর্থগতভাবে তা পূর্ববর্তী বাক্য থেকে এমনই স্বতন্ত্র যে, মৃত্যুর আলোচনা প্রসংগে একটি সুন্দর নীতিকথা রূপে এটাকে তুমি ব্যবহার করতে পারো।

১১. মহিলা কবি খানসা – এর পরিচয় তুমি আগেই পেয়েছো – তার ভাই ছাখর-এর মৃত্যুতে যে বিখ্যাত শোক-কবিতা তিনি রচনা করেছিলেন তার নমুনাও দেখেছো। সেই শোক-কবিতার আরেকটি পংক্তি এখানে দেখো–

وَ إِنَّ صَخْراً لَتَأْتَمُّ الهُدَاةُ بِه + كَأَنَّه عَلَمٌ في رَأْسِه نارٌ

এখানে কবির উদ্দেশ্য হলো ছাখরকে এদিক থেকে পাহাড়ের সাথে তুলনা

করা যে, কাফেলার পথ প্রদর্শকরা যেমন সুউচ্চ পাহাড় দেখে দিক নির্ণয় করে এবং পথের দিশা লাভ করে, অতঃপর কাফেলাকে সঠিক গন্তব্যে পরিচালিত করে, তেমনি গোত্রের পথ প্রদর্শক নেতাগণ ছাখরকে দেখে সঠিক পথের দিশা লাভ করতো এবং গোত্রকে মর্যাদার পথে পরিচালিত করতো।

আশা করি বুঝতে পারছো যে, কবির উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্ম তথা সুউচ্চ পর্বতের সংগে ছাখারের উপমা كأنه علم পর্যন্তই সম্পন্ন হয়ে গেছে। কিন্তু পূর্ববর্তী পংক্তির সংগে তার অন্ত্যমিল বা قافية এখনো সম্পন্ন হয়নি। সে জন্য في راسه نار অংশটি অতিরিক্ত রূপে যুক্ত হয়েছে। এতে একদিকে قافية বা অন্ত্যমিলের সমাধান যেমন হয়েছে তেমনি অন্যদিকে পূর্ণাংগ অর্থের সাথে একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। কেননা এতে مشبه به টি আরো জোরদার ও জোরালো হয়েছে। অর্থাৎ ছাখর শুধু সুউচ্চ পাহাড়ের সদৃশ নয় বরং এমন সুউচ্চ পাহাড়ের সদৃশ যার চূড়ায় প্রজ্জ্বলিত অগ্নি রয়েছে। ফলে তা দ্বারা দিনের আলোতে যেমন তেমনি রাতের আধারেও পথের দিশা লাভ করা সম্ভব।

মোটকথা في رأسه نار অংশটুকুর সংযোজন ছাড়াই পংক্তিটির মূল বক্তব্য তথা تشبيه সম্পন্ন হয়েছে। তবে এ অংশটুকু দ্বারা قافية সম্পন্ন হয়েছে এবং পূর্বোক্ত পূর্ণাংগ অর্থের সাথে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে الإيغال বলে।

إيغال. -এর উদাহরণ হিসাবে নিম্নোক্ত কবিতাপংক্তিটি দেখতে পারো–

هُمُ القَوْمُ إن قالُوا أَصَابُوا وَ إِن دُعُوا + أَجابُوا وَ إِنْ أُعْطُوا أَطابُوا وَ أَجْزَلُوا

তারা এমন কাওম যে, যখন কথা বলে, নির্ভুল কথা বলে এবং যখন তাদের ডাক পড়ে তখন সাড়া দেয় এবং যখন দান করে খুশিমনে পর্যাপ্ত দান করে।

পদ্যের ন্যায় গদ্যেও إيغال হতে পারে। অবশ্য তখন قافية বা অন্ত্যমিলের প্রশ্ন থাকবে না। শুধু মূল অর্থের সাথে নতুন মাত্রা যোগের প্রশ্ন থাকবে। নীচের আয়াতটি দেখো–

وَ جاءَ رجلٌ من أَقْصَى المدينَةِ يَسْعَى، قالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا المرسلِينَ * اتَّبِعُوا
مَنْ لا يَسْئَلُكُم أَجْراً و هم مُهْتَدون *

শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দ্রুত এসে বললো, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ করো। অনুসরণ করো তাদের যারা তোমাদের

কাছে কোন বিনিময় দাবী করেন না। অথচ তারা হেদায়তপ্রাপ্ত।

দেখো, রাসূলগণের হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া তো অপরিহার্য। সুতরাং সেটার প্রত্যক্ষ উল্লেখ ছাড়াই উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্ম পূর্ণাঙ্গ হয়েছে। তবে এই অতিরিক্ত অংশটুকু যোগ করার কারণে অর্থের সাথে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে এবং রাসূলগণের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান না করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা গ্রহণ করার আবেদন সৃষ্টি হয়েছে। কেননা এতে তাদের আর্থিক ক্ষতি নেই, অথচ হেদায়াত লাভের মাধ্যমে আখেরাতের ফায়দা রয়েছে।

তদ্রূপ নীচের আয়াতটি দেখো–

إِنَّكَ لا تُسْمِعُ المَوْتى وَ لا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدعاءَ إذا وَلَّوْا مُدبِرين *

সত্যের আহ্বান তুমি মৃতদেরকে শোনাতে পারবে না এবং শোনাতে পারবে না বধিরদেরকে যখন তারা পিছন ফিরে চলে যায়।

দেখো, 'বধিরদেরকে সত্যের আহ্বান শোনানো সম্ভব নয়।' এই বক্তব্য لاتسمع الصم الدعاء দ্বারাই পূর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু إذا و لوا مدبرين -এর সংযোজনের মাধ্যমে তাতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ বক্তব্যটি আরো জোরালো হয়েছে। কেননা বধির যদি মুখোমুখি অবস্থায় থাকে তাহলে অন্তত কথা বলার সময়ের মুখ ও হস্ত সঞ্চালন দ্বারাও আহ্বান বুঝতে পারত। কিন্তু পিছন ফেরার পর সে সম্ভাবনাও আর থাকলো না।

১২. إطناب -এর আরেকটি পন্থা হলো تتميم – অর্থাৎ কালামে এমন কোন فضلة (مسند ও مسند إليه বহির্ভূত অপ্রধান অংশ) যোগ করা যা মূল অর্থটিকে অধিকতর সৌন্দর্য ও গভীরতা দান করে। উদাহরণ দেখো, নেক লোকদের গুণ বর্ণনা প্রসংগে আল্লাহ্ বলেছেন–

و يُطعِمُونَ الطَّعامَ على حُبِّه مِسْكِينًا وَ يَتِيمًا وَ أَسِيرًا * إنما نُطْعِمُكم لِوَجْهِ
اللهِ لا نُرِيد مِنكُمْ جزاءً وَلا شُكورًا *

খাবারের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও তারা দরিদ্রকে, এতীমকে ও বন্দীকে আহার দান করে (আর বলে) আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য তোমাদেরকে আহার দান করি। তোমাদের পক্ষ হতে কোন রূপ প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাই না।

দেখো, على حبه হচ্ছে আলোচ্য কালামের একটি فضلة বা অপ্রধান অংশ। এটা দ্বারা মূল বক্তব্যে গভীরতা এসেছে। কেননা খাবারের প্রতি প্রচণ্ড ইচ্ছা ও চাহিদা সত্ত্বেও আহার দান করা তাদের অতি উচ্চ দানশীলতা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার প্রদানের মানাসিকতা প্রমাণ করে।

নীচের কবিতাটিতেও تتميم -এর মাধ্যমে إطناب হয়েছে।

وَ إِنّي وَ إِنْ كنتُ الأخيرَ زَمانُه + لَآتٍ بِمَا لم يَسْتَطِعْهُ الأَوائِلُ

সময়ের বিচারে যদিও আমি পরবর্তী কিন্তু এমন এমন কীর্তি সম্পন্ন করি যা পূর্ববর্তীরা পারেনি।

এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে পূর্ববর্তীদের উপর আপন কীর্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করা। সুতরাং و إن كنت الأخير زمانه হচ্ছে মূলবক্তব্যের অতিরিক্ত। কিন্তু এতে মূলবক্তব্যটি সৌন্দর্য ও গভীরতা লাভ করেছে। কেননা এতে এদিকে ইংগিত রয়েছে যে, ما تَرَكَ الأَوَّلون لِلآخِرِين شَيْئًا – এই বহুল উচ্চারিত মন্তব্যটি ব্যতিক্রমহীন নয়।

তদ্রূপ নীচের কবিতাটি দেখো–

فَلسنا عَلَى الأَعْقابِ تَدْمىٰ كُلُومُنا + وَ لٰكِنْ عَلَى أَقْدامِنَا تَقْطُرُ الدَّمَا

আমাদের জখমের রক্ত পায়ের গোড়ালিতে পড়ে না; বরং রক্তের ফোঁটা আমাদের পায়ের পাতার উপর পড়ে।

দেখো, এখানে মূল বক্তব্য হচ্ছে কবির নিজের ও গোত্রের বীরত্ব প্রকাশ করা। এটা পংক্তির প্রথম পর্ব দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে। সুতরাং দ্বিতীয় পংক্তিটি এখানে অতিরিক্ত হয়েছে। কিন্তু তা দ্বারা মূল বক্তব্যটি অধিকতর সৌন্দর্য ও ভাব গভীরতা লাভ করেছে।

১৩. নীচের খণ্ড আয়াতটি দেখো, (জাহান্নামের দায়িত্বে নিযুক্ত) ফিরিশতাদের গুণ বর্ণনা প্রসংগে আল্লাহ তাআলা বলেন–

لا يعصون الله ما أمرهم، و يفعلون ما يؤمرون *

প্রথম বাক্যটি শব্দগত ও প্রত্যক্ষ অর্থে ফিরিশতাদের স্বভাব হতে معصية -এর نفي করছে এবং ভাবগত ও পরোক্ষ অর্থে তাদের জন্য আনুগত্যগুণ-এর

إثبات করছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় বাক্যটি শব্দগত ও প্রত্যক্ষ অর্থে আনুগত্যগুণের إثبات করছে এবং ভাবগত ও পরোক্ষ অর্থে অবাধ্যতাগুণের نفي করছে। অর্থাৎ প্রতিটি বাক্য শব্দগতভাবে দ্বিতীয় বাক্যের ভাবগত অর্থ সাব্যস্ত করছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে الطرد و العكس বলে। এটা إطناب -এর অত্যন্ত সুন্দর একটি পন্থা।

১৪. إطناب -এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য পন্থা হচ্ছে استقصاء অর্থাৎ কোন একটি বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে তার সর্বদিক তুলে ধরা, যাতে শ্রোতার সামনে বিষয়টি চূড়ান্ত ও সর্বাংগীন রূপে ফুটে উঠে।

استقصاء এর উদাহরণ হিসাবে নীচের আয়াতটি পেশ করা যায়। অনুগ্রহ ফলানোর মাধ্যমে দান-ছাদকার ছাওয়াব ও কার্যকারিতা বিনষ্ট করার বিষয়টি উপমা যোগে বোঝাতে গিয়ে আমাদের রব দেখো কেমন সুন্দর সর্বাঙ্গীনতা রক্ষা করেছেন–

أَ يَوَدُّ أحدُكم أن تكونَ له جَنةٌ مِن نخيلٍ و أَعنابٍ تَجْرِي من تحتها الأَنْهٰرُ له فيها مِن كلِّ الثَّمَرٰتِ و أَصابَه الكِبَرُ و له ذُرِّيَّةٌ ضُعَفاءُ، فَأَصابَها إعصارٌ فيه نارٌ فَاحْتَرقَتْ، كذٰلك يُبَيِّنُ اللّٰه لكمُ الآيٰتِ لعلكم تَتَفكرون *

দেখো, উপমা হিসাবে শুধু جنة বলাই যথেষ্ট ছিলো। কিন্তু জান্নাতের বিবরণ প্রসংগে প্রথমে বলা হয়েছে যে, বাগানটি হলো খেজুর ও আংগুর বৃক্ষের বাগান, যা আরবদের নিকট সর্বোৎকৃষ্ট। এ বিবরণ দ্বারা আল্লাহ এদিকে ইংগিত করেছেন যে, সাধারণ বাগান নষ্ট হওয়ার তুলনায় খেজুর ও আংগুর বাগান নষ্ট হওয়ার বিপদ বাগানওয়ালার জন্য অধিকতর গুরুতর।

এরপর تجري من تحتها الأنهار অংশটি যোগ করে বাগানের পরিচর্যার প্রতি বাগানওয়ালার সযত্ন প্রচেষ্টার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং এত যত্নের বাগান নষ্ট হলে কি পরিমাণ কষ্ট হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আর সেই যত্নের বাগানে যদি সর্বপ্রকার ফলফলাদির প্রাচুর্য থাকে তাহলে তো কষ্টের পরিমাণ হবে বহুগুণ, সেদিকেই ইংগিত করা হয়েছে له فيها من كل الثمرت অংশটি যোগ করে।

এরপর و أصابه الكبر বলে তুলে ধরা হয়েছে বাগানওয়ালার অবস্থা। বার্ধক্যকালে মানুষ তার তৈয়ার করা বাগানের প্রতি আরো বেশী দুর্বল হয়ে

পড়ে। কেননা এটা নষ্ট হলে নতুন উদ্যমে, নতুন পরিশ্রমে নতুন বাগান তৈরী করার সুযোগ থাকে না।

এরপর و له ذرية ضعفاء বলে বাগানের সাথে তার নিবিড়তম সম্পর্কের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। কেননা এই বাগানের উপর তার ছোট ছোট মাসুম শিশুদের জীবন ধারণ নির্ভরশীল।

এভাবে বাগান ও বাগানওয়ালার সার্বিক অবস্থা তুলে ধরার পর আল্লাহ পাক বলেছেন, فأصابها إعصار – বলাবাহুল্য যে, উদ্যান ও বৃক্ষরাজি ধ্বংস করার ক্ষেত্রে 'ঝড়' হলো সবচে' ভয়াবহ প্রাকৃতিক আঘাত।

কিন্তু إعصار বা ঝড় বলেই ক্ষান্ত করা হয়নি বরং فيه نار যোগ করে বোঝানো হয়েছে যে, সে ঝড় ছিলো 'অগ্নি-বায়ুর' ঝড়, ভয়ংকরতম।

অতঃপর সর্বশেষ বাক্য احترقت যোগ করে বিপদ-চিত্রের সমাপ্তি টানা হয়েছে, যার মর্মার্থ হলো একজন প্রয়োজনগ্রস্ত মানুষের সপরিবার জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন ফলে ফুলে পরিপূর্ণ একটি মনোরম উদ্যান ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া।

যে ব্যক্তি দান ছাদকা করে অনুগ্রহ ফলায় তার পরিণামও হবে এমন মর্মান্তিক।

দেখো, কেমন সর্বাঙ্গীন বর্ণনা চিত্র সম্বলিত মর্মস্পর্শী উদাহরণ! পৃথিবীর সেরা সাহিত্যিকের পক্ষেও সম্ভব নয় এখানে তিল পরিমাণ কম বেশী করা। কিংবা এমন সার্বিকতা পূর্ণ إطناب -এর একটি উদাহরণ পেশ করা।

১৫. إطناب -এর আরেকটি পন্থা হলো التفسير – অর্থাৎ পূর্ববর্তী কালামের অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা বা সংক্ষিপ্ততা নিরসনের জন্য ব্যাখ্যা রূপে কোন কালাম যোগ করা। উদাহরণ দেখো–

إِنَّ الإنسانَ خُلِقَ هلوعًا * إذا مَسَّه الشَّرُّ جَزوعًا * و إذا مَسَّه الخَيْرُ منوعا*

মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ভীরুরূপে। যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে হায়-হুতাশ করে আর যখন কল্যাণ প্রাপ্ত হয় তখন কৃপণতা করে।

দেখো, এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াত দু'টি মূলতঃ পূর্ববর্তী هلوعا শব্দের

ব্যাখ্যা রূপে এসেছে। কেননা পুরোধা তাফসীরকারদের মতে هلوع তাকেই বলা হয় যে মন্দ অবস্থার সম্মুখীন হলে অস্থিরতা প্রকাশ করে আবার কল্যাণপ্রাপ্ত হলে কৃপণতা করে। সুতরাং আয়াত দু'টি هلوع শব্দের যে অর্থ তার অতিরিক্ত কোন ভাব ও মর্ম যোগ করেনি। তবে তা উদ্দেশ্যহীন নয়, কেননা তা هلوع শব্দের অর্থকে বিশদ রূপে তুলে ধরেছে, যাতে শ্রোতাচিত্তে তা সুস্থিত হয়। সুতরাং এটা উত্তম إطناب।

নীচের আয়াতটি সম্পর্কেও একই কথা।

يَاَيُّـهَا الذين اٰمَنوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّيْ وَ عَدُوَّكم أَوْلِياءَ تُلْقُون إليهم بِالْمَوَدَّةِ و قد كَفَروا بِما جاءَكم مِنَ الحَقِّ *

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না (এবং) তাদের প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশ করো না, অথচ তোমাদের নিকট আগত সত্যকে তারা অস্বীকার করেছে।

দেখো, এখানে আল্লাহ ও মুমিনদের শত্রুদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণের বিভিন্ন দিক হতে একটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ এটা হলো مُوالاةُ أَعْداءِ اللهِ وَ أعداءِ المؤمنين -এর একটি খণ্ড ব্যাখ্যা। এর সমতুল্য কিংবা এর চেয়ে গুরুতর অন্যান্য দিকগুলো কিয়াসের ভিত্তিতে নিষিদ্ধ হবে। যেহেতু এই ব্যাখ্যাটি موالاة -এর অন্তর্নিহিত অর্থ সেহেতু এটি অর্থবহ ও উত্তম একটি إطناب হয়েছে।

خلاصة الكلام

يكونُ الإطنابُ بِأمورٍ عِدَّةٍ وَ لِأَغراضٍ بَلاغِيَّةٍ، منها :

(١) ذكرُ الخاصِّ بعدَ العامِّ، للتنبيهِ على فَضْلِ الخاصِّ .

(٢) ذكرُ العامِّ بعدَ الخاصِّ، لِإفادَةِ العُمومِ معَ العِنايَةِ بشَأْنِ الخاصِّ .

(٣) الإيضاحُ بعدَ الإبهامِ لِتقْريرِ المعنى في ذِهْنِ السامِعِ .

(٤) و منَ الإيضاحِ بعدَ الإبهامِ التوشيعُ و هو ذِكْرُ مُثَنًّى مفسَّرٍ بِاسْمَيْنِ، أَحَدُهما معطوفٌ على الآخَرِ، و يكونُ غالبًا في آخرِ الكلام، و قد تأتي في وَسَطِ الكلام و في الابتداءِ أيضًا. كما أنه يكونُ جَمْعًا لا مُثَنًّى .

(٥) التكرار، لِتَمْكينِ المعنى في النفسِ، و للتاكيد و التحسُّرِ وَ لِطُولِ الفَصْلِ وَ للترغيبِ أو الترهيبِ أو المدحِ أو الذمِّ و غَيْرِها .

و قد يُجْعَلُ العبارَةُ المكرَّرَةُ فاصلَةً في الكلامِ كَأَنَّه أَعْلامٌ تُرَفْرِفُ أو لَوَحاتٌ تُنْصَبُ على مَقاطِعِ الطريقِ، فيكون لها جمالٌ فَنِّيٌّ و أَثَرٌ ظاهِرٌ في تَوجيهِ النفسِ إلى مُتَطَلَّباتِ الكلام .

(٦) الاعتراضُ و هو أن يُؤْتَى في أَثْناءِ الكلام أَوْ بينَ كلامينِ مُتَّصِلَيْنِ في المعنى بجملةٍ أو أكثرَ لا مَحَلَّ لها من الإعرابِ . و يكونُ الاعتراض لِأَغْراضٍ بَلاغِيَّةٍ سِوَى دفعِ الإيهام، منها :

الإسراع إلى التنزيهِ أو إلى التعليمِ أو إلى الدعاءِ أو للإشارة إلى معنًى من المعاني .

(٧) الاحتراس : و هو زيادةٌ إِطْنابِيَّةٌ يَدْفَعُ بها المتكلمُ إيهامًا يُسَبِّبُه الكلامُ السابِقُ .

(٨) التـذيـيـل : و هو تعقـيـبُ الجملةِ بجمـلةٍ أُخْرٰى تَشْـتَمِلُ على مَعْناها توكيـدًا لها ٠

و هو يَجْرِي مَـجْرٰى المَثَـلِ إذا كان مُسْـتَقِلًّا بِإفادَةِ المعنٰى، مُسْـتَغْنِـيًا عَـمَّا قَـبْلَه، دالًّا على حكِمٍ كُلِّيٍّ ٠

و لا يَجرِي مَجْرَى المثَـلِ إنْ لم يَسْـتَقِـلَّ معناه عَـمَّا قَبْلَه و لم يَكُنْ دالًّا على حكِمٍ كُلِّيٍّ

(٩) الإيغال : و هم خـتمُ البيتِ بِلَفْظٍ يَتِمُّ المعنى بِدُونِه وَ لكنْ يُعْطِي البيـتَ قافِيـتَه و يُضيـف إلى المعنى التامِّ معنًى زائدًا ٠

و لا يَخْتَصُّ الإيغال بالـشـعرِ بل يكون في النثرِ أيضًا ٠

(١٠) التتميم : و هو أن يُؤْتٰى بِفَضْلَةٍ تَزيـد المعنى حُسْـنًا ٠

(١١) الطرد و العكس : و هو ذكر كلامين كلٌّ منهما يُقَرِّر بِـمَنْطُوقِه مفهومَ الثاني ٠

(١٢) الاستقصاء : و هو أن يُبَيِّنَ المتكلمُ معنًى فـيجمع كلَّ جوانِبه و يذكر جميعَ أوصافِه ٠

(١٣) التفسير : و هو ان يُؤْتٰى بكلامٍ يُفَسَّرُ به كلامٌ سابق ٠

الخاتمة

পিছনে মোট আটটি অধ্যায়ে علم المعاني সম্পর্কিত বিভিন্ন নিয়ম কানুন বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে خبر ও انشاء সম্পর্কে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ذكر ও حذف সম্পর্কে, তৃতীয় অধ্যায়ে تقديم ও تاخير সম্পর্কে, চতুর্থ অধ্যায়ে تعريف ও تنكير সম্পর্কে, চতুর্থ অধ্যায়ে تعريف ও تنكير সম্পর্কে এবং পঞ্চম অধ্যায়ে إطلاق ও تقييد সম্পর্কে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে قصر সম্পর্কে, সপ্তম অধ্যায়ে وصل ও فصل সম্পর্কে, অষ্টম অধ্যায়ে إطناب، إيجاز ও مساوات সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

আশা করি আল্লাহর রহমতে প্রতিটি বিষয় তুমি মোটামুটি আত্মস্থ করতে পেরেছো।

তুমি যদি علم المعاني এর বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত যাবতীয় নিয়ম নীতি অনুসরণ করে কোন কথা বলো তাহলে বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলা হবে– إخراجُ الكلامِ على مقتضَى الظاهِرِ – অর্থাৎ কালাম বা বক্তব্যকে বাহ্যিক অবস্থার দাবী অনুযায়ী উপস্থাপন করা। কিন্তু কখনো কখনো এমন কিছু সূক্ষ্ম বালাগাতী কারণ দেখা দিয়ে থাকে যা একজন بليغ কে বাহ্যিক অবস্থার বিপরীত কথা বলতে বাধ্য করে। بليغ যখন বাহ্যিক অবস্থার দাবী উপক্ষো করে অন্তর্গত অবস্থার দাবী অনুযায়ী কথা বলেন তখন বালাগাতের পরিভাষায় সেটাকে বলা হয় إخراجُ الكلامِ على خلافِ مقتضَى الظاهِرِ অথবা إخراجُ الكلامِ على مقتضَى باطِنِ الأَحْوالِ

অর্থাৎ বাহ্যিক অবস্থার দাবীর বিপরীত কথা বলা। কিংবা অন্তর্গত অবস্থার দাবী মুতাবেক কথা বলা।

যেমন ধরো, ইলমের উপকারী হওয়া সম্পর্কে একজন সন্দেহ পোষণ করছে। এক্ষেত্রে তাকীদ সহকারে إنَّ العلمَ نافِعٌ বলাই হলো বাহ্যিক অবস্থার

দাবী। কিন্তু অন্তর্গত অবস্থা এই যে, ইলমের উপকারী হওয়ার বিষয়টি এতই সুস্পষ্ট যে, সে সম্পর্কে সন্দেহ পোষণের কোন অবকাশ নেই। সুতরাং অন্তর্গত অবস্থার দাবী হচ্ছে তাকীদমুক্ত অবস্থায় العلم نافع বলা। সুতরাং এরূপ অবস্থায় তুমি যদি সন্দেহগ্রস্ত مخاطب কে লক্ষ্য করে إن العلم نافع বলো তাহলে সেটা হবে إخراج الكلام على مقتضى الظاهر – পক্ষান্তরে যদি العلم نافع বলো তাহলে সেটা হবে إخراج الكلام على مقتضى الباطن

যখন مقتضى الظاهر ও مقتضى الباطن বিপরীতমুখী হয় তখন একজন بليغ কিন্তু ظاهر الحال -এর দাবী উপেক্ষা করে باطن الحال -এর দাবী অনুযায়ী কথা বলে থাকেন। এটাই হলো বালাগাতের দাবী।

সুতরাং কি কি অন্তর্গত অবস্থার কারণে বাহ্যিক অবস্থার দাবীর বিপরীত কথা বলা জরুরী হয়ে পড়ে এখানে আমরা সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

১. তুমি জানো যে, কোন مخاطب কে লক্ষ্য করে একটি জুমলা বা কালাম বলার মূল উদ্দেশ্য হলো তাকে উক্ত জুমলার فائدة বা لازم الفائدة সম্পর্কে অবহিত করা। সুতরাং مخاطب যদি আগে থেকেই উক্ত জুমলার فائدة ও لازم الفائدة সম্পর্কে অবহিত থাকে তাহলে এ উদ্দেশ্যে উক্ত জুমলা উচ্চারণ করা নিরর্থক হবে। বরং ظاهر الحال বা বাহ্যিক অবস্থার দাবী ও مقتضى হলো উক্ত জুমলা উচ্চারণ না করা।

কিন্তু مخاطب যদি জানা মুতাবেক আমল না করে তখন অন্তর্গত অবস্থা বা باطن الحال -এর দাবী হবে তাকে অজ্ঞ ধরে নিয়ে জ্ঞান দান করা। যেমন ধরো, পিতার অবাধ্য সন্তানকে লক্ষ্য করে বলা হলো هذا أبوك

বলাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলা হয়–

تَنزِيلُ العالِمِ بفائِدَةِ الخَبَرِ أَوْ لازِمِها مَنْزِلَةَ الجاهِلِ بِهما لِعَدَمِ جَرْيِه على مُوْجِبِ عِلْمِه

২. مخاطب যদি আলোচ্য বিষয়টি অস্বীকার না করে তাহলে বাহ্যিক অবস্থার দাবী হলো তাকীদমুক্ত অবস্থায় বিষয়টি পেশ করা। কিন্তু যদি তার আচরণে বিষয়টির প্রতি অস্বীকৃতি প্রকাশ পায় তাহলে অন্তর্গত অবস্থার দাবী হবে বিষয়টিকে তাকীদযুক্ত রূপে পেশ করা। এ প্রসংগে তুমি

جاءَ شَقيقٌ عارِضًا رُمْحَه + إِنَّ بَنِيْ عَمِّك فيهم رِماحٌ

এই কবিতা পংক্তিটি স্মরণ করতে পারো। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলা হয়– تنزيلُ غيرِ المُنْكِرِ منزِلَةَ المنكرِ لِظُهورِ علاماتِ الإنكار.

৩. مخاطَب যদি আলোচ্য বিষয়টি অস্বীকার করে কিংবা সে সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে তখন বাহ্যিক অবস্থা বা ظاهر الحال -এর দাবী হলো কালামকে তাকীদযুক্ত রূপে পেশ করা। কিন্তু যদি বিষয়টির অনুকূলে এমন সব সুস্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান থাকে যাতে অস্বীকারের বা সন্দেহ পোষণের কোন অবকাশ থাকে না তখন অন্তর্গত অবস্থা বা باطن الحال -এর দাবী হলো مخاطَب -এর অস্বীকার বা সন্দেহের বিষয়টি উপেক্ষা করা এবং তাকীদমুক্ত অবস্থায় কালাম পেশ করা। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলে– تَنزِيلُ المُنْكِرِ أو الشاكِّ منزِلَةَ خَالِي الذِّهْنِ لِوُجودِ دلائلَ تَمْنَعُ إنكارَه أوْ شَكَّه

এ তিনটি বিষয় ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, তাই এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

৪. এবার নীচের আয়াতটি দেখো–

إِنا فَتَحْنا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا * لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ ماتَأَخَّر و
يُتِمَّ نِعْمَتَه عليك و يَهْدِيَك صراطًا مُسْتَقِيمًا

নিঃসন্দেহে আমরা আপনার জন্য সুস্পষ্ট বিজয় সাবস্ত করেছি, যাতে আল্লাহ আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ত্রুটি মর্জনা করেন এবং আপনার প্রতি তার নেয়ামত পূর্ণ করেন এবং আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন।

দেখো, এখানে বক্তব্যের সূচনা করা হয়েছে صيغة التكلم বা উত্তম পুরুষ দ্বারা। সুতরাং বক্তব্যের শেষ পর্যন্ত অভিন্ন ধারা বজায় রেখে صيغة التكلم বা উত্তম পুরুষ ব্যবহার করাই ছিলো ظاهر الحال বা বাহ্যিক অবস্থার দাবী। তখন বাক্যের স্বাভাবিক রূপ হতো এই–

لِنَغْفِرَ لك ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِك و مَا تَأَخَّرَ و نُتِمَّ نعمتنا عليك و نهديك صراطا
مستقيما

কিন্তু مقتضى الظاهر -এর বিপরীত এখানে صيغة التكلم -এর পরিবর্তে صيغة الغائب বা তৃতীয় পুরুষ ব্যবহার করা হয়েছে।

কেননা এখানে এটা বোঝানোর প্রয়োজন ছিলো যে, স্বয়ং আল্লাহ হচ্ছেন

إنا فتحنا এই বক্তব্যের বক্তা। তা ছাড়া এখানে الله লফয উচ্চারণের মাধ্যমে আসমানী جلال ও মহিমা প্রকাশ করাও অপরিহার্য ছিলো, যাতে مغفرة اتمام نعمة ও هداية ইত্যাদির প্রতি সমীহবোধ জাগ্রত হয়। এটাই হলো এখানে অন্তর্গত অবস্থা, যার জন্য বাহ্যিক অবস্থার দাবী উপেক্ষা করে تكلم থেকে غيبة এর দিকে বক্তব্য-ধারা পরিবর্তন করা হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলা হয় إلتفات অর্থাৎ বিশেষ কোন সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যে বক্তব্যের যমীর বা সর্বনামগত ধারা পরিবর্তন করা।

التفات মোট ছয় প্রকার। যথা–

১. উত্তম পুরুষ থেকে মধ্যম পুরুষ
২. উত্তম পুরুষ থেকে তৃতীয় পুরুষ
৩. মধ্যম পুরুষ থেকে উত্তম পুরুষ
৪. মধ্যম পুরুষ থেকে তৃতীয় পুরুষ
৫. তৃতীয় পুরুষ থেকে উত্তম পুরুষ
৬. তৃতীয় পুরুষ থেকে মধ্যম পুরুষ

التفات -এর ছয়টি উদাহরণ যথাক্রমে

(ক) وجاءَ مِنْ أَقْصَى المدينَةِ رَجلٌ يَسْعَى · قالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعوا المرسلِينَ * اتَّبِعوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أجراً وَ هم مُهْتَدون * و ما لِيَ لا أَعبُدُ الذي فَطَرَنِيْ وَ إليه تُرْجَعون *

হযরত ঈসা (আঃ) যখন আনতাকিয়া শহরের অধিবাসীদের হেদায়াতের উদ্দেশ্যে তিনজন বার্তাবাহক ও ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করলেন আর শহরের অধিবাসীরা প্রেরিত পুরুষদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো তখন শহর প্রান্ত থেকে আল্লাহর এক বান্দা এসে উপস্থিত হলেন, যিনি ইতিপূর্বে ঈমান আনয়ন করেছিলেন। তিনি প্রেরিত পুরুষদের দাওয়াত গ্রহণের জন্য অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় তাদের প্রতি আবেদন জানালেন। (তখন সম্ভবত লোকেরা অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, তুমি কি আপন উপাস্যদের পুজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত শুরু করেছো? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন কেন আমি তার ইবাদত করবো না। অথচ তোমরা তার কাছেই ফিরে যাবে।

এখানে وإليه أرجع -এর পরিবর্তে ترجعون ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা আসল উদ্দেশ্য তো হচ্ছে তাদেরকে ঈমান আনার আহ্বান জানানো, কিন্তু সরাসরি و ما لكم لا تعبدون বলে সম্বোধন করা হলে তাদের অন্তরে বিরূপ

প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো তাই এখানে আত্ম-সম্বোধন করা হয়েছে। অতঃপর و إليه ترجعون বলে পরোক্ষভাবে তাদেরকেও ঈমান আনয়নের আহ্বান করা হয়েছে।

মূল عبارة এরূপ হতে পারতো।

وَ ما لِيَ لا أعبُد الذي فَطَرني وَ إِلَيهِ أُرْجَعُ وَ أنتم كذٰلِكَ تُرْجَعُون إليه فَلِمَ لاتَعْبُدُون الذي فَطَرَكُمْ ·

এখানে যেহেতু فلم لا تعبدون অংশটি প্রকারান্তরে و ما لي لا أعبد الذي অংশটিকে ধারণ করছে তাই সেটাকে অনুক্ত করা হয়েছে। তদ্রূপ و إليه ترجعون অংশটি প্রথমোক্ত কালামের দ্বিতীয় অংশ তথা و إليه أرجع কে ধারণ করছে তাই সেটাকে অনুক্ত রাখা হয়েছে।

মোটকথা, এখানে تكلم থেকে غيبة এর দিকে إلتفات -এর মাধ্যমে দুটি সৌন্দর্য এসেছে। প্রথমতঃ বক্তব্য সুসংক্ষিপ্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে দ্বিতীয়তঃ শ্রোতা অন্তরের সংবেদনশীলতার প্রতি 'যত্ন' প্রদর্শন করা হয়েছে।

(খ) إِنَّا أَعْطَيْنٰكَ الكَوْثَرَ * فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَر

এখানে যেহেতু صيغة التكلم দ্বারা বক্তব্য শুরু করা হয়েছে সেহেতু فصل لنا বলাই ছিলো বাহ্যিক অবস্থার দাবী। কিন্তু تكلم থেকে غيبة এর দিকে التفات করে فصل لربك বলা হয়েছে।

এর হিকমত বা অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে এ দিকে ঈংগিত করা যে, বান্দার উপর আল্লাহর ربوبية -এর দাবী হচ্ছে তাঁর ইবাদাত করা, তাঁর উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করা এবং নহর বা কোরবানী করা।

(গ) أَ تَطْلُبُ وَصْلَ رَبَّاتِ الجَمالِ + وَ قَدْ سَقَطَ المَشِيْبُ عَلَى قَذالِيْ

এখনো তুমি সৌন্দর্য-দেবীদের সংগ-সুখ কামনা করো, অথচ বার্ধক্য-শুভ্রতা আমার জুলফিতে প্রকাশ পেয়ে গেছে!

এখানে বাহ্যিক অবস্থার দাবী ছিলো على قذالك বলা। কেননা صيغة الخطاب দ্বারা বক্তব্যের সূচনা করা হয়েছে। কিন্তু এখানে কবির উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্ম-তিরস্কার, সুতরাং সেদিকে ইংগিত করাও অপরিহার্য ছিলো। صيغة الخطاب থেকে تكلم -এর দিকে إلتفات -এর মাধ্যমে সে উদ্দেশ্যই সাধান করা হয়েছে। প্রশ্ন

হতে পারে যে, اتطلب -এর পরিবর্তে أطلب ا বলতে কি অসুবিধা ছিলো, তাতে শুরু থেকেই আত্মতিরস্কার বোঝা যেতো এবং إلتفات -এর অস্বাভাবিকতার প্রয়োজন হতো না? উত্তর এই যে, তিরস্কারের জন্য সম্বোধনই হলো সর্বোত্তম বাচনভংগি, উত্তম পুরুষের বাচন ভংগিতে তিরস্কারের সেই আবেদন সৃষ্টি হতো না।

(ঘ) هُوَ الذي يُسَيِّركم في البَرِّ وَ البحرِ حَتَّى إذا كُنْتم في الفُلْكِ و جَرَيْنَ بهم بِريحٍ طَيِّبَةٍ و فَرِحوا بها جاءَتْها رِيحٌ عاصِفٌ و جاءَهُمُ المَوْجُ من كلِّ مكانٍ و ظَنُّوا أَنَّهم أُحِيْطَ بهم دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصينَ له الدينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنا مِنْ هذه لَنكونَنَّ مِنَ الشّٰكِرِيْن، فَلَمَّا أَنْجٰهم إذاهم يَبْغونَ في الأَرْضِ بِغَيْرِ الحَقِّ .

তিনি ঐ সত্তা যিনি তোমাদেরকে স্থলে ও জলে পরিভ্রমণ করান। এমনকি যখন তোমরা জলযানে অবস্থান করো আর জলযান উত্তম বায়ু প্রবাহে তাদেরকে নিয়ে ভেসে চলে এবং তারা ঐ বায়ু প্রবাহের কারণে আনন্দিত হয় তখন এক ঝড়ো বায়ু উপস্থিত হয় এবং চারদিক হতে তাদের উপর আছড়ে পড়ে এবং তারা ধারণা করে যে, তাদেরকে (বিপদে) ঘেরাও করা হয়েছে, তখন তারা আল্লাহকে ডাকে দ্বীনকে তাঁর জন্য খালিছ করে। (আর বলে, হে আল্লাহ) যদি আপনি আমাদেরকে এ বিপদ হতে উদ্ধার করেন তাহলে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবো। অনন্তর যখন তাদেরকে তিনি উদ্ধার করেন তখন অকস্মাৎ তারা অন্যায়ভাবে যমীনে বিদ্রোহ প্রকাশ করে।

দেখো, এখানে বক্তব্যের সূচনা ছিলো সম্বোধনবাচক। সুতরাং مقتضى ظاهر الحال ছিলো শেষ পর্যন্ত অভিন্ন ধারা বজায় রাখা। কিন্তু এখানে خطاب থেকে غيبة -এর দিকে إلتفات করে وجرين بهم বলা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সেটাই বজায় রাখা হয়েছে।

এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে এদিকে ইংগিত করা যে, আলোচ্য অন্যায় আচরণ সকল مخاطب থেকে প্রকাশ পায়নি, বরং তাদের একাংশ থেকে প্রকাশ পেয়েছে। বলাবাহুল্য যে, পরবর্তী পর্যায়ে خطاب -এর ধারা অব্যাহত রাখলে এ অমূলক ধারণা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিলো যে, উপরোক্ত অন্যায় আচরণ সকল مخاطب এর পক্ষ হতেই প্রকাশ পেয়েছিলো। তা ছাড়া غيبة -এর صيغة ব্যবহার করা দ্বারা অসন্তুষ্টির সাথে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার ভাব প্রকাশ

পেয়েছে, যা নাফরমানির ক্ষেত্রে খুবই যথোপযুক্ত। পরবর্তীতে এই অসন্তোষ সরাসরি প্রকাশ করে বলা হয়েছে–

يَا يُّها النَّاسُ، إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ

হে লোক সকল! তোমাদের বিদ্রোহের ফল তোমাদেরই উপর বর্তাবে।

বলাবাহুল্য যে, সম্বোধন ধারা অব্যাহত থাকলে এই তিরস্কার ও হুঁশিয়ারি সকলের প্রতি আরোপিত হতো। অথচ সম্বোধিতগণের মাঝে অনেকেই নেক্কার ছিলেন, যাদের পক্ষ হতে বিদ্রোহের আচরণ প্রকাশ পায়নি। মোটকথা, إلتفات -এর বাচন ভংগি এখানে অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের বালাগাতমণ্ডিত হয়েছে।

(ঙ) وَ اللّٰهُ الذي أَرْسَلَ الرِّيْحَ فَتُثِير سَحابًا فَسُقْنٰه إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنا بِه الأَرْضَ بعدَ مَوْتِها كذٰلك النُّشورُ *

আল্লাহ সেই মহান সত্তা যিনি 'বায়ু' প্রেরণ করেছেন। অতঃপর তা মেঘ ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অনন্তর আমরা তাকে এক মৃত নগরে উপনীত করলাম এবং ভূমি মৃতবৎ হওয়ার পর তা দ্বারা তাকে জীবন্ত করলাম। পুনরুত্থান এরূপই হবে।

এখানে و الله الذي أرسل এই সূচনা অংশে غيبة -এর صيغة ব্যবহৃত হয়েছে। অতঃপর তা থেকে تكلم -এর দিকে إلتفات হয়েছে। এভাবে এখানে এমন একটা আবহ তৈরী হয়েছে যেন মহামাহিম আল্লাহ غيبة ও অদৃশ্যময়তা থেকে تكلم -এর মধ্যমে আপন মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। ফলে শ্রোতাগণের উপর এমন এক নূরানী তাজাল্লীর বিচ্ছুরণ হয় যা আয়াতের ভাব ও মর্মবাণীকে তাদের অন্তরের গভীর অনুভূতির সাথে পূর্ণ একাত্ম করে দেয়। বলাবাহুল্য যে, এই অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতেই বাহ্যিক অবস্থার দাবীর বিপরীত এখানে إلتفات করা হয়েছে।

(চ) وَ قالوا اتَّخَذَ الرحمٰنُ وَلَدًا * لقد جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا

এখানে প্রথম অংশে আল্লাহর নামে সন্তান গ্রহণের অপবাদ আরোপের কথা বলা হয়েছে। যেহেতু অপরাধ অতি জঘন্য সেহেতু তৎক্ষণাৎ আপরাধীদের সম্বোধন করে চরম ক্রোধ ও রোষ প্রকাশ করাই হলো স্বাভাবিক। তাই غيبة থেকে خطاب -এর দিকে إلتفات করা হয়েছে। পক্ষান্তরে প্রথম অংশে উদ্দেশ্য ছিলো মুমিনদেরকে মুশরিকদের এই অপরাধ সম্পর্কে অবহিত করা, সেহেতু সেখানে صيغة الغائب ই ছিলো উপযুক্ত।

কতিপয় উদাহরণ

সূরাতুল ফাতেহায় غيبة থেকে خطاب এর একটি إلتفات রয়েছে। গবেষক মুফাসসিরগণ এই إلتفات -এর সৌন্দর্য সম্পর্কে বলেছেন, বান্দা যখন আল্লাহর যাবতীয় গুণ ও ছিফাতের কথা অন্তরে স্মরণপূর্বক প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করে এবং الحمد বলে, যা এ কথা প্রমাণ করে যে, যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর মহান সত্তার সংগে বিশিষ্ট এবং যাবতীয় প্রশংসার তিনিই একমাত্র উপযুক্ত, অন্য কেউ নয় তখন বান্দা তার অন্তরে সেই পরম সত্তার অভিমুখী হওয়ার একটা অনুপ্রেরণা বোধ করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে যখন সে رب العالمين উচ্চারণের মাধ্যমে ঘোষণা করে যে, আল্লাহ গোটা বিশ্ব জগতের রব ও প্রতিপালক, সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণুপ্রমাণু রাবুবিয়াতের এই নিবিড় বন্ধনে আল্লাহর সংগে আবদ্ধ তখন তার অন্তরের সেই অনুপ্রেরণা আরো জোরদার হয়। এভাবে সে আল্লাহর একেকটি মহান গুণ উচ্চারণ করতে থাকে আর খালিক ও মাবুদের সাথে নৈকট্যের আশ্চর্য মধুর অনুভূতি ক্রমশঃ তাকে অভিভূত করতে থাকে এবং আল্লাহর অভিমুখী হওয়ার সেই অনুপ্রেরণা ক্রমশঃ শক্তি লাভ করতে থাকে। অবশেষে যখন সে مالك يوم الدين দ্বারা ঘোষণা করে যে, জীবন-মৃত্যুর এই খেলা শেষে যখন বান্দা হাশরের মাঠে উপস্থিত হবে সেই বিচার দিবসেরও তিনি হবেন একমাত্র অধিপতি, তখন অনুভূতি ও অনুপ্রেরণা এমনই পরম পরিণতি লাভ করে যে, বান্দা যেন মহান প্রতিপালকের সান্নিধ্যে উপস্থিত। তাই কৃতার্থ বান্দা প্রিয়তমকে সম্বোধন করে বন্দেগি নিবেদন করে এবং জীবন মৃত্যু ও হাশর নশরসহ সকল কঠিন মুহূর্তের জন্য তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করে এবং বলে–

إياك نعبد و إياك نستعين *

বলাবাহুল্য যে, غيبة -এর ধারা অব্যাহত রেখে যদি إياه نعبد বলা হতো তাহলে আবদিয়াতের এমন অনুপম ভাব ও মর্ম কিছুতেই প্রকাশ পেতো না।

তা ছাড়া যেহেতু প্রশংসা ও গুণকীর্তনের বিষয়টি প্রশংসাকারী ও প্রশংসিত সত্তার মাঝে সীমাবদ্ধ বিষয় নয়, বরং সর্বব্যাপী বিষয় সেহেতু এ ক্ষেত্রে صيغة الغيبة ব্যবহার করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইবাদত ও সাহায্য প্রার্থনা যেহেতু আবিদ ও মাবুদের মাঝে সীমাবদ্ধ একান্ত বিষয় সেহেতু এ ক্ষেত্রে صيغة الخطاب ব্যবহার করা হয়েছে, যা দুইয়ের মাঝে একান্ততা বোঝায়।

إلتفات -এর একটি কাব্য উদাহরণ দেখো–

أ أذكُرُ حاجَتي أمْ قد كفانِيْ + حيَاؤُكَ إنَّ شِيْمَتَكَ الحيَاءُ
كريمٌ لا يُغَيِّرُهُ صَبَاحٌ + عَنِ الخُلُقِ الجَميلِ وَلا مَسَاءُ

আমি কি আমার প্রয়োজনের কথা মুখ ফুটে বলবো, না আপনার লাজুকতাই আমার জন্য যথেষ্ট। লাজুকতাই তো আপনার স্বভাব বৈশিষ্ট্য।

মহত্ত্ব তাঁর এমনই স্বভাবজাত যে, সকাল-সন্ধ্যার পরিবর্তন তাঁর মহৎ চরিত্রের কোন পরিবর্তন ঘটায় না।

দেখো, কবি তার প্রয়োজন প্রার্থনার বিষয়টি صيغة الخطاب -এর মাধ্যমে উভয়ের মাঝে একান্ত রেখেছেন। পক্ষান্তরে মামদূহের প্রশংসা ও গুণকীর্তনের বিষয়টি صيغة الغيبة দ্বারা সর্বসাধারণের জন্য অবারিত করেছেন।

কবি যদি خطاب -এর ধারা অব্যাহত রাখতেন তাহলে এমন ধারণা হতে পারতো যে, মামদূহের গুণের কথা জনসমক্ষে প্রচার করতে তিনি উৎসুক নন।

و ما ءَاتَيْتُم مِنْ زَكٰوةٍ تُرِيدون وجهَ اللهِ فأولئك هم المُضْعِفُونَ *

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে 'যাকাত' তোমরা দান করবে ওরাই দ্বিগুণ প্রাপ্ত হবে।

এখানে مقتضى ظاهر الحال ছিলো خطاب -এর ধারা অক্ষুণ্ন রেখে فأنتم المضعفون বলা। কিন্তু ظاهر الحال এর মুকতাযাকে উপেক্ষা করে এখানে أولئك ব্যবহার করা হয়েছে যা ضمير الغائب -এর সমতুল্য। এই التفات এর বিশেষ বালাগাতী উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদার উচ্চতা প্রকাশ করা। কেননা اسم الإشارة দ্বারা স্থূল ও স্থানগত দূরত্ব যেমন বোঝানো হয় তেমনি মর্যাদাগত দূরত্ব ও উচ্চতাও প্রকাশ করা হয়।

এ পর্যন্ত যে কটি উদাহরণ বিশ্লেষণ করা হলো আশা করি তাতে التفات -এর বিষয়টি তুমি পুরোপুরি বুঝতে পেরেছো।

প্রতিটি التفات -এর স্থানগত বৈশিষ্ট্য ও নিজস্ব সৌন্দর্যও রয়েছে। যেমন, আকস্মিক ধারা পরিবর্তন দ্বারা বৈচিত্র সৃষ্টি হয়, ফলে শ্রোতা সচকিত হয়ে বিষয়বস্তুর প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়। সেই সাথে কালাম ইজাযপূর্ণ ও সুসংক্ষিপ্ত হয়। তাছাড়া التفات দ্বারা উদ্দিষ্ট ভাব ও মর্মটি ইংগিতে প্রকাশ করা হয়। আর ইংগিতময়তা প্রত্যক্ষ ভাষণের চেয়ে আকর্ষণীয় হয়ে থাকে।

৫. যে ক'টি ক্ষেত্রে কালামকে ظاهر الحال -এর مقتضى -এর বিপরীত রূপে উপস্থাপন করা হয় তার **পঞ্চম** ক্ষেত্রটি এবার আমরা আলোচনা করবো। বিখ্যাত আরব বাগ্মী কাবাছারা এবং ইরাকের প্রতাপশালী প্রশাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফের মাঝে যে চিত্তাকর্ষক সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিলো তা পর্যালোচনা করে দেখো।

মৌলিক আরবী সাহিত্য গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত আছে যে, কাব্য ও সাহিত্য সেবী সমমনা কতিপয় সহচর একবার আংগুর বাগানে এক পান মজলিসে 'কাব্য-চর্বন' ও 'মদ্য সেবনে' নিয়োজিত ছিলেন। কাবাছারা ছিলেন তাদের একজন। তিনি ঝুলে থাকা একটি আংগুর গুচ্ছ নিয়ে খেলা করছিলেন। ইত্যবসরে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আলোচনা উঠলো। কাবাছারা তখন ডালসহ আংগুর গুচ্ছ ধরা অবস্থায় বলে উঠলেন–

قَطَعَ اللّٰهُ عُنُقَه و سَقَانِي دَمَه

আল্লাহ যদি এর ঘাড় মটকে দেন এবং এর রক্তে আমার গলা ভিজিয়ে দেন তাহলে প্রাণ জুড়ায়।

উপস্থিত কোন এক 'কর্ণসেবী' এ মন্তব্য হাজ্জাজের 'কর্ণগোচর' করলো। তিনি তাকে ধরিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করলেন–

أَ أنتَ الذي قلتَ : قَطعَ اللّٰهُ عُنُقَه و سَقانِيْ دَمَه

তুমি নাকি বলেছো, আল্লাহ তার গলা কাটুন এবং আমাকে তার রক্ত পান করান।

কাবাছারা কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বললেন–

نعم .. و قد قصدتُ عُنْقُودَ العِنَبِ الذي كانَ بِيَدِي

জ্বি, বলেছি, তবে আমার উদ্দেশ্য ছিলো হাতে ধরে রাখা আংগুর গুচ্ছ (এবং তা থেকে প্রস্তুত লাল সুরা)।

হাজ্জাজ সবই বুঝলেন, তাই তিনি চোখ রাংগিয়ে বললেন–

لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الأَدْهَمِ (أي : لَأُقَيِّدَنَّكَ بِالحَدِيدِ)

দাঁড়াও, তোমাকে লোহার শেকলে চড়াবো। (অর্থাৎ শেকলে বেঁধে শায়েস্তা করবো। أدهم অর্থ লোহার শেকল।)

কাবাছারা মোটেও ঘাবড়ালেন না, বরং পরম সন্তোষ প্রকাশ করে বললেন–

مِثْلُ الأَمِيرِ يَحْمِلُ عَلَى الأَدْهَمِ وَ الأَشْهَبِ

আপনার মত মহানুভব শাসক أشهب، أدهم যে কোন ঘোড়ায় চড়াতে পারেন। (أدهم অর্থ কালো ঘোড়া এবং أشهب অর্থ সাদাকালো মিশ্রবর্ণের ঘোড়া।)

এমন একটা জবাবের জন্য হাজ্জাজ প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ধমক দিয়ে বললেন, قصدتُ الحديدَ (ব্যাটা, তোর ঘোড়া নয়) আমি তো حديد বোঝাতে চেয়েছি। (حديد অর্থ লোহা।)

কাবাছারা এবার দুই ঠোঁটে কৃতার্থের হাসি ফুটিয়ে বললেন–

জ্বি, بليد না হয়ে حديد হওয়াই উত্তম। (بليد অর্থ নিস্তেজ এবং حديد অর্থ তেজীয়ান।)

কাবাছারার বাকচাতুর্যে হাজ্জাজের রাগ পড়ে গেলো। তিনি বললেন, যা বেটা দূর হ। কাবাছারা বললেন, কিন্তু হুজুর, আমি তো তেজী ঘোড়াটা না নিয়ে যাচ্ছি না। এবার হাজ্জাজ আর হাসি চেপে রাখতে পারলেন না। ঘোড়া একটা দিয়ে তবে আপদ বিদায় করলেন।

দেখো, হাজ্জাজ যে অর্থে কথা বলছিলেন বাহ্যিক অবস্থার দাবী তো ছিলো সে অর্থেই তার কথাকে গ্রহণ করা এবং সেভাবেই জবাব দেয়া। কিন্তু নিজস্ব উদ্দেশ্যসিদ্ধির প্রয়োজনে কাবাছারা তার বাকচাতুর্য ও উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা সেটাকে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করছিলেন। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে إسلوب الحكيم বলে।

এবার কোরআন থেকে একটি উদাহরণ দেখো–

يَقولون لَئِنْ رَجَعْنَا إلى المدينةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ منها الأَذَلَّ وَ لِلّٰهِ العِزَّةُ و لِرَسولِهِ و للمؤمنين و لٰكِنَّ المنافقين لا يَفْقَهون *

তারা (মুনাফিকেরা) বলে, যদি আমরা মদীনায় ফিরে যেতে পারি তাহলে মর্যাদাবানেরা আপদস্থদের সেখান থেকে অবশ্যই বের করে ছাড়বে। অথচ মর্যাদা হলো আল্লাহর জন্য এবং তার রাসূলের জন্য এবং মুমিনদের জন্য।

দেখো, الأعز দ্বারা মুনাফিকেরা নিজেদেরকে এবং الأذل দ্বারা

মুসলমানদেরকে বুঝিয়েছিলো। সুতরাং তাদের কথার অর্থ ছিলো, মর্যাদাবানেরা (মুনাফিকেরা) অপদস্থদেরকে (মুসলমানদেরকে) মদীনা থেকে বিতাড়িত করবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের কথাকে ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করে বললেন, তোমরা ঠিকই বলেছো, তবে মর্যাদাবান যেহেতু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও মুমিনগণ সেহেতু মুমিনরাই তোমাদেরকে মদীনা ছাড়া করবে।

এ প্রসংগে নীচের কবিতা পংক্তিটিও দেখতে পারো।

قال : ثَقَّلْتُ إِذْ أَتيتُ مِرارًا + قلتَ : ثَقَّلْتَ كاهِلي بِالْأَيادِي
قال : طَوَّلْتُ، قلتَ : أَوْلَيْتَ طَوْلًا + قال : أَبْرَمْتُ قلتَ : حَبْلَ وِدادِيْ

তিনি (মেহমান) বললেন, বার বার এসে (আপনাকে) ভারাক্রান্ত করে ফেলেছি। আমি বললাম, (বারংবার শুভাগমনের) অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে ভারাক্রান্ত করেছেন।

তিনি বললেন, (আমি আমার অবস্থান) দীর্ঘ করে ফেলেছি। আমি বললাম, আপনার দান ও দয়া দীর্ঘ করেছেন। তিনি বললেন, আপনাকে إبرام (বা অতিষ্ঠ) করেছি। আমি বললাম, বন্ধুত্ব-বন্ধন ابرام (বা সুদৃঢ়) করেছেন।

এবার নীচের উদাহরণটি দেখ–

يَسْئَلونَك ماذا يُنْفِقون، قُلْ ما أَنفقتُم من خيرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَ الأَقْرَبِين و اليَتْمٰى وَ المساكِينِ وَ ابْنِ السبيلِ * و ما تَفْعلوا من خيرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ به عَليمٌ *

তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে তারা (আল্লাহর রাস্তায়) কি খরচ করবে। আপনি বলুন, যা কিছু সম্পদ তোমরা ব্যয় করবে, তা পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং এতীম মিসকীনের জন্য এবং মুসাফিরের জন্য (খরচ করবে)।

ছাহাবা কেরামের প্রশ্ন ছিলো; তারা কী এবং কী পরিমাণে খরচ করবেন। কিন্তু আল্লাহ সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে, কাদের জন্য খরচ করা হবে তা বললেন। উদ্দেশ্য হলো ছাহাবা কেরামকে এ শিক্ষাদান করা যে, খরচের বস্তু ও পরিমাণ গুরুত্বপূর্ণ নয়; বরং খরচের ক্ষেত্রই হলো আসল গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সঠিক ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ খরচও ছাওয়াবের কারণ। পক্ষান্তরে অক্ষেত্রে বিরাট পরিমাণ খরচও ফলদায়ক নয়। সুতরাং খরচের ক্ষেত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাই ছিলো তোমাদের জন্য অধিক জরুরী। কৃত প্রশ্নের পরিবর্তে ভিন্ন প্রশ্নের উত্তর

প্রদান, এটাকেও বালাগাতের পরিভাষায় أسلوب الحكيم বলে।

পরবর্তীতে যখন ছাহাবা কেরাম একই প্রশ্ন করেছেন তখন কিন্তু ظاهر الحال -এর مقتضى অনুযায়ী কৃত প্রশ্নেরই উত্তর দেয়া হয়েছে। কেননা যে প্রশ্ন অধিকতর জরুরী ছিলো أسلوب الحكيم অনুযায়ী তার উত্তর দেয়া হয়ে গেছে। সুতরাং দ্বিতীয়বার অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির উত্তর দেয়া হয়েছে। দেখ ইরশাদ হয়েছে–

وَ يَسْـئَلُوْنَكَ ماذا يُنْفِقُون، قُـلِ العَفْوَ

তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা জিজ্ঞাসা করে, তারা (আল্লাহর রাস্তায়) কি খরচ করবে। আপনি বলুন, যা কিছু নিজের ও পোষ্য পরিজনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত (তা খরচ করো।)

দ্বিতীয় উদাহরণ হিসাবে নীচের আয়াতটি দেখো–

يَسْـئَلونك عَنِ الأَهِلَّةِ، قلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الحَجِّ

আপনাকে তারা চাঁদের (উদয়াস্ত) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলুন, এটা মানুষের জন্য বিভিন্ন সময় এবং হজ্জের সময় নির্ধারণের মাধ্যম।

ছাহাবা কেরাম নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন–

مَا بالُ الهِـلَالِ يَبْدُو دَقِـيْقًـا ثم يَتَـزَايَدُ حَـتَّى يَصِـيْـرَ بَدْرًا ثم يَتَناقَصُ حَـتَّى يَعودَ كما بَـدَأَ .

কি কারণে নতুন চাঁদ চিক্কন হয়ে দেখা দেয়; এরপর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে 'পূর্ণশশি' হয়। অতঃপর হ্রাস পেতে পেতে প্রথম অবস্থায় ফিরে আসে? অর্থাৎ ছাহাবা কেরামের প্রশ্ন ছিলো চাঁদের বাড়া-কমার মহাজগতিক কারণ সম্পর্কে, কিন্তু এ ধরনের বিষয় বর্ণনা করা যেহেতু দ্বীন ও শরীয়তের মূল উদ্দেশ্য নয়; বরং এ জাতীয় প্রশ্নোত্তরের ধারা শুরু হলে রাসূলের নিকট হতে দ্বীন ও শরীয়তের ইলম হাছিল করার মূল লক্ষ্য ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেহেতু উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ইবাদাত ও মুআমালাতের ক্ষেত্রে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির উপকারিতা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ চাঁদ ও তার হ্রাস-বৃদ্ধি হচ্ছে মানুষের বিভিন্ন কাজের, বিশেষতঃ হজ্জের তারিখ নির্ধারণের মাধ্যম।

মোটকথা, এখানে চাঁদের বাড়া-কমার মহাজাগতিক কারণসম্পর্কিত প্রশ্নকে চাঁদের কল্যাণ ও উপকারিতাসম্পর্কিত প্রশ্নের স্থলে রেখে উত্তর দেয়া হয়েছে। কেননা প্রশ্নকারীদের জন্য এটা অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, أسلوب الحكيم অর্থ বক্তার বক্তব্যের ভিন্ন অর্থ গ্রহণ কিংবা প্রশ্নকারীর কৃত প্রশ্নের পরিবর্তে ভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান।

৫. ظاهر الحال এর দাবী ও مقتضى লংঘন করার **৬ষ্ঠ** ক্ষেত্র হলো–

الإظهار في مقام الإضمار এবং الإضمار في مقام الإظهار

প্রথমে আমরা الإضمار في مقام الإظهار প্রসংগে আলোচনা করছি। নীচের উদাহরণটি দেখ–

أَبَتِ الوِصَالَ مَخَافَةَ الرُّقَبَاءِ + وَ أَتَتْكَ تَحْتَ مَدَارِعِ الظَّلْمَاءِ

'নজরদার'দের নজরদারিতে পড়ার আশংকা রয়েছে, এই অজুহাতে মিলনের মিনতি সে প্রত্যাখ্যান করলো। অথচ তোমার বেলা অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে অভিসার করলো।

তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো, কবি এখানে তার ছলনাময়ী প্রেমাস্পদের আচরণ সম্পর্কে মনোবেদনা প্রকাশ করছেন। সুতরাং أبت -এর ضمير الفاعل দ্বারা তিনি তার প্রেমাস্পদের প্রতিই ইংগিত করেছেন। যেহেতু ضمير -এর কোন مرجع পূর্বে উল্লেখিত নেই সেহেতু ظاهر الحال। مقتضى হচ্ছে এখানে ضمير এর পরিবর্তে المحبوبة বা المعشوقة এই জাতীয় কোন الاسم الظاهر ব্যবহার করা। কিন্তু কবি বোঝাতে চান যে, যে 'প্রেম-প্রতিমার' জন্য এ সর্বনাম নিবেদিত, তিনি আমার মানস পটে সদা বিদ্যমান এবং শ্রোতামাত্রই অবগত যে, দিনরাত আমি কার ধ্যানে মগ্ন থাকি এবং কার কথা বলতে পারি।

দেখো, স্বাভাবিকভাবে কোন ভাব ও মর্ম প্রকাশের জন্য যেখানে শব্দের আশ্রয় গ্রহণ অনিবার্য সেখানে শব্দের পরিবর্তে একটি 'ছায়াশব্দ' বা সর্বনাম ব্যবহার করে অনুপম ভাব ও ভাবময়তার কী সুন্দর প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

মোটকথা, ظاهر الحال -এর দাবী বা مقتضى লংঘন করার একটি ক্ষেত্র হলো الإضمار في مقام الإظهار অর্থাৎ الاسم الظاهر -এর পরিবর্তে ضمير বা সর্বনাম ব্যবহার করা।

উদ্দেশ্য হচ্ছে এদিকে ইংগিত করা যে, ضمير -এর مرجع চিন্তায় সদা জাগরূক রয়েছে, সুতরাং তা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

الإضمار في مقام الإظهار এর আরেকটি উদ্দেশ্য হলো مرجعবিহীন অস্পষ্ট ضمير উল্লেখপূর্বক শ্রোতা অন্তরে বিষয়টি জানবার কৌতুহল সৃষ্টি করা। অতঃপর একটি বাক্যযোগে উদ্দিষ্ট বিষয়টি তুলে ধরা, যাতে শ্রোতার কৌতুহলী অন্তরে বিষয়টি সহজে রেখাপাত করে, সেই সাথে বিষয়টির গুরুত্ব, বড়ত্ব বা গুরুন্তরতার প্রতি ইংগিত করাও উদ্দেশ্য। ضمير الشأن বা ضمير القصة ১-এর ক্ষেত্রে এটা হয়ে থাকে। উদাহরণ দেখো–

إِنَّه مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللّٰهَ لا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

যে আল্লাহকে ভয় করবে এবং ধৈর্যধারণ করবে সে সফল হবে। কেননা আল্লাহ পুণ্যবানদের প্রতিফল নষ্ট করেন না।

দেখো, إنه বলা মাত্র শ্রোতা চিত্ত কৌতহলী হয়ে জানতে চাইবে যে, এই مرجعবিহীন যমীর দ্বারা متكلم এর উদ্দেশ্য কি? এরপর যখন ব্যাখ্যা হিসাবে من يتق و يصبر বলা হবে তখান শ্রোতার কৌতুহল নিবৃত্ত হবে এবং সে বুঝতে পারবে যে, متكلم এর তাকওয়া ও ছবর অবলম্বনকারীর সফলতার কথা বলতে চাচ্ছেন। এভাবে বিষয়টি অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করবে।

নীচের আয়াতটি সম্পর্কে একই কথা।

فَإِنَّها لاَ تَعْمَى الأَبْصارُ وَ لٰكِنْ تَعْمَى القُلوبُ التى في الصُّدورِ

ঘটনা এই যে, চক্ষুস্থ দৃষ্টিসমূহ অন্ধ হয় না তবে বক্ষস্থ হৃদয়সমূহ অন্ধ হয়।

---

[১] অর্থাৎ مرجعবিহীন ضمير الغائب যার পরে একটি বাক্য রয়েছে এবং তা উক্ত যমীরের উদ্দেশ্য পরিষ্কার করছে। যমীর مذكر হলে তাকে ضمير الشأن এবং مؤنث হলে তাকে ضمير القصة বলে। পরবর্তী বাক্যের مسند إليه হিসাবে ضمير টি مذكر বা مؤنث হয়ে থাকে। এই যমীর মূলতঃ الشأن বা القصة শব্দের স্থলে ব্যবহৃত। সুতরাং هو الله أحد অর্থ হলো الشأنُ العظيمُ الذي يَجِبُ أن يَهْتَمَّ به كلُّ ذي فِكْرٍ هو الله أحد

তদ্রূপ هِيَ النَّفْسُ ما حَمَّلْتَها تَتَحَمَّلُ অর্থ হলো–

القِصةُ العظيمةُ التى يَجِبُ أن يَعْرِفَها كلُّ عاقلٍ هي النفسُ ما حَمَّلْتَها تَتَحَمَّلُ

ضمير الشأن ও ضمير القصة-এর ন্যায় بئس ও نعم-এর মাঝে বিদ্যমান ضمير الفاعلও একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ مرجعবিহীন যমীর ব্যবহার করে প্রথমে শ্রোতা অন্তরে কৌতুহল সৃষ্টি করা হয়। অতঃপর একটি নাকেরাহ শব্দ দ্বারা শ্রোতার অন্তরের কৌতুহল কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত করা হয়। কিন্তু ফলশ্রুতিতে ضمير দ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটির পূর্ণ পরিচয় লাভের আগ্রহ শ্রোতা অন্তরে আরো তীব্র হয়। অতঃপর مخصوص بالمدح বা مخصوص بالذم উচ্চারণ করা হয়। এভাবে শ্রোতা অন্তরে সহজেই তা বদ্ধমূল হয়। উপরের ব্যাখ্যার আলোকে نعم خلقا الصدق ও بئس خلقا الكذب উদাহরণ দুটি চিন্তা করো।

এরপর الإظهار في مقام الإضمار প্রসংগ। এটা যমীরের পরিবর্তে اسم الإشارة ব্যবহার দ্বারা হতে পারে। আবার সাধারণ الاسم الظاهر ব্যবহার দ্বারা হতে পারে। উদাহরণ দেখো–

كم عاقـلٍ عاقـلٍ أعيَتْ مَذاهِبُه + وَ جاهلٍ جاهلٍ تَلْقَاه مَرْزُوقَا
هٰذا الذي تَرَكَ الأَوْهامَ حائِـرةً + وَ صَيَّرَ العالِمَ النِّحْرِيرَ زِنْدِيقَا

এখানে ظاهر الحال এর مقتضى হিসাবে هو الذي হওয়ার কথা। কিন্তু যেহেতু পরবর্তী বিষয়টি অদ্ভূত ও বিস্ময়কর সেহেতু বিষয়টির প্রতি শ্রোতার অধিক মনোসংযোগ ঘটানোর জন্য اسم الإشارة ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা ضمير এর তুলনায় اسم الإشـارة -এর আবেদন অতি প্রত্যক্ষ।

মনে করো, পরিষ্কার আকাশে ঈদের নতুন চাঁদ সকলেই দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু এক বেচারা ক্ষীণ দৃষ্টির কারণে চাঁদ খুঁজে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলো– أين الهلال – তুমি বললে هو فوقَ المئذنَةِ بِالضَّبْطِ তা মসজিদের আযানখানার ঠিক উপরে।

অন্য একজন স্বাভাবিক দৃষ্টি শক্তির অধিকারী একই প্রশ্ন করলো, أين الهلال এখন তুমি বললে– هٰـذا الهلال فوقَ المئذنَةِ يا أَعْمىٰ

আরে অন্ধ! এই যে চাঁদ ঠিক আযানখানার উপরে দেখা যাচ্ছে।

এখানে তুমি ضمير -এর পরিবর্তে هذا এই الاسم الظاهر কেন ব্যবহার করলে? উদ্দেশ্য হলো তার দৃষ্টিশক্তিকে কটাক্ষ করা এবং তাকে চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া; কেননা সকলে যা দেখতে পাচ্ছে সে কেন সুস্থ চোখেও তা দেখতে পাচ্ছে না। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত ব্যক্তি মাযূর হওয়ার কারণে তার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়মেই هو যমীর ব্যবহার করা হয়েছে।

এবার নীচের কবিতা পংক্তিটি দেখ–

تَعَالَلْتِ كَيْ أَشْجٰى وَمَا بِكِ عِلَّةٌ + تُريدين قَتْلِي قَدْ ظَفِرْتِ بِذٰلِكِ

অসুস্থতার ভান ধরেছো যাতে আমি বিষণ্নতায় মুষড়ে পড়ি। আসলে (যন্ত্রণা দগ্ধ করে) আমাকে খুন করতে চাচ্ছো। শোন, তোমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

এখানে স্বাভাবিক নিয়মে قد ظفرت به বলা দরকার ছিলো। কিন্তু কবি বোঝাতে চান যে, তার প্রেমিকা (কিংবা তিনি) এতই সচেতন ও তীক্ষ্ণধী যে, অস্থূল ও বিমূর্ত বিষয় ও তার নিকট স্থূল ও মূর্ত রূপে প্রকাশ পায়, ফলে তা ইশরায় দেখিয়ে দেয়া যায়।

মোটকথা, مقتضى ظاهر الحال লংঘন করে إسم الإشارة যোগে الإظهار في مقام الإضمار করার উদ্দেশ্য হলো কোন অদ্ভূত বিষয়ের প্রতি শ্রোতার অধিক মনোসংযোগ ঘটানো কিংবা শ্রোতার প্রতি কটাক্ষ করা কিংবা শ্রোতার (বা নিজের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বোঝানো। কিংবা শ্রোতার গবেটতা ও বুদ্ধির স্থূলতা বোঝানো।

এবার সাধারণ الاسم الظاهر দ্বারা الإظهار مكان الإضمار এর উদাহরণ দেখ–

قل هو الله أحد ۰ الله الصمد

এখানে দ্বিতীয় পর্যায়ে هو الصمد বলাই ছিলো ظاهر الحال -এর দাবী ও مقتضى কিন্তু যমীরের পরিবর্তে الاسم الظاهر ব্যবহার করার উদ্দেশ্য এই যে, الله এর দিকে উপরোক্ত ছিফাতের ইসনাদ যেন শ্রোতার চিন্তায় বদ্ধমূল হয়ে যায়।

الحاقة ما الحاقة সম্পর্কেও একই কথা।

আরেকটি উদ্দেশ্য হলো আপন দীনতা প্রকাশ করে مخاطِب এর অনুগ্রহ আকর্ষণের চেষ্টা করা। উদাহরণ দেখো–

اِلٰهِىْ عَبْدُكَ العَاصِيْ أَتَاكَ + مُقِرًّا بِالذُّنوبِ وَ قَدْ دَعَاكَ

এখানে متقضى الظاهر হিসাবে أنا العاصي اتيتك বলাই ছিলো স্বাভাবিক কিন্তু তুমি নিজেই চিন্তা করে দেখো أنا العاصي এর পরিবর্তে عبدك العاصي দ্বারা আপন আবদিয়াত ও দীনতার যে সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে তার পর কি আল্লাহর রহমতের দরিয়ায় জোশ না এসে পারে! আর সে আশায় উদ্দীপ্ত হয়েই হযরত ছীদ্দীকে আকবার (রাঃ) إضمار -এর পরিবর্তে إظهار করেছেন।

এবার নীচের আয়াতটি দেখো (কাফিরদের আলোচনা প্রসংগে আল্লাহ ইরশাদ করেন)–

ص * وَ الْقُرْآنِ ذِيْ الذِّكْرِ * بَلِ الذين كَفَروا فِي عِزَّةٍ وَ شِقَاقٍ كَمْ اَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قرنٍ فَنَادَوْا وَ لاَتَ حِيْنَ مَناصٍ * وَ عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ منهم وَ قالَ الكٰفِرون هٰذا سٰحِرٌ كَذَّابٌ .

ছোয়াদ, শপথ উপদেশপূর্ণ কোরআনের। বরং যারা কুফুরি করেছে তারা অহংকার ও বিরোধিতায় লিপ্ত। তাদের পূর্বে কত জনগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি। তখন তারা আর্তনাদ করতে শুরু করেছে, কিন্তু তখন রেহাই পাওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। আর তারা অবাক হয় যে, তাদের কাছে তাদেরই মধ্য হতে একজন সতর্ককারী আগমন করেছেন। আর কাফিররা বলে, এ-তো মিথ্যাচারী যাদুকর।

দেখো, যেহেতু সূরার শুরুতে الذين كفروا এর উল্লেখ রয়েছে সেহেতু عجبوا এর অনুসরণে قالوا বলাই ছিলো ظاهر الحال -এর দাবী ও مقتضى কিন্তু যমীরের পরিবর্তে الكافرون ইসমটি ব্যবহার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এরূপ মন্তব্যকারীদের ঔদ্ধতের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করা এবং শ্রোতার চিন্তায় এ কথা তুলে ধরা যে, সত্যকে অস্বীকার কারার কারণেই এমন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

নীচের উদাহরণটি দেখো–

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ

যদি তোমরা সাহায্য প্রার্থনা করে থাকো তবে সাহায্য তোমাদের কাছে এসে গেছে।

কাফিররা রাসূল ও তাঁর ছাহাবাগণের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্যের আবদার করতো, আবার সে আবদার পুরা হওয়ার দুরাশাও করতো। তাই আল্লাহ তাদের প্রতি কটাক্ষ করে বলছেন। তোমাদের কাছে সাহায্য এসে গেছে, (তবে তা তোমাদের অনুকূলে নয়, মুনিদের অনুকুলে)।

আয়াতের বক্তব্যে কটাক্ষের ভিন্ন মাত্রাটুকু যোগ করার জন্যই শুধু فقد جاءكم না বলে যমীরের পরিবর্তে الفتح শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

এবার নীচের আয়াতটি দেখো–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهم وَ لَوْ كنتَ فَظًّا غليظَ القَلْبِ لَانْفَضُّوا من حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنهم وَ اسْتَغْفِرْ لهم وَ شَاوِرْهم في الأَمْرِ * فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ على اللّٰهِ، إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلِيْنَ

এখানে مقتضى ظاهر الحال হিসাবে فتوكل عليه إنه .... বলা যেতো। কিন্তুর মহান আল্লাহর সত্তাবাচক মহান নামের যে ভাব ও মহিমা তা শ্রোতার অন্তরে জাগ্রত হত না।

মোটকথা, সাধারণ اسم ظاهر দ্বারা إضمار স্থলে إظهار করার উদ্দেশ্য হলো–

শ্রোতার চিন্তায় বিষয়টি দৃঢ়মূল করা, কিংবা দীনতা প্রকাশের মাধ্যমে অনুগ্রহ আকর্ষণ করা, কিংবা বিস্ময়, ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ করা কিংবা, কটাক্ষ করা, কিংবা সমীহ এবং ভাব ও মহিমা প্রকাশ করা।

৭. ظاهر الحال -এর مقتضى লংঘনের আরেকটি ক্ষেত্র হলো صيغة المستقبل এর পরিবর্তে صيغة الماضي ব্যবহার করা। এর উদ্দেশ্য হলো যে ঘটনা ভবিষ্যতের কোন এক সময় ঘটবে সেটাকে বিগত যুগের ঘটে যাওয়া ঘটনা রূপে উপস্থাপন করা এবং শ্রোতার অন্তরে ভবিষ্যত ঘটনাটির সুনিশ্চিয়তার বিশ্বাস বদ্ধমূল করা। উদাহরণ দেখো–

وَ الذين اٰمَنوا وَ عَمِلوا الصّٰلِحٰتِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا * أولئك أَصْحٰبُ الجنةِ، هم فيها خٰلدون * و نَزَعْنَا ما في صُدورِهم مِنْ غِلٍّ تجري من تحتهم الاَنْهٰرُ * وَ قالوا الحمدُ لِلّٰهِ الذي هَدٰنا لِهٰذا وَ مَا كُنا لِنَهْتَدِيَ لَولا اَنْ هَدٰنا اللّٰهُ * لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالحَقِّ، و نُوْدُوا أَنْ تِلْكُم الجَنَّةُ أُوْرِثْتُموها كنتم تَعْمَلُونَ * و نَادَى أَصْحٰبُ الجنةِ أَصْحٰبَ النارِ أَنْ قد وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا، فَهَلْ وَجَدْتُم ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، قالوا نَعَم * فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بينهم أَنْ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ *

যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে, আমি কাওকে তার সামর্থ্যের বেশী 'দায়বদ্ধ' করি না। তারাই জান্নাতের অধিকারী, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আর তাদের অন্তরে (পরস্পরের প্রতি) যে মালিন্য আমি তা নির্মূল

করে দেবো। তাদের তলদেশ দিয়ে বিভিন্ন নহর প্রবাহিত হবে। আর তারা বলবে, আল্লাহর হামদ (প্রশংসা) যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত উপনীত করেছেন। আল্লাহ যদি আমাদেরকে পথপ্রদর্শন না করতেন তাহলে আমরা পথ পাওয়ার মত ছিলাম না। নিঃসন্দেহে আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ আমাদের নিকট সত্যবাণী এনেছিলেন। তখন তাদের সম্বোধন করা হবে যে, এই জান্নাত, যে সৎকর্ম তোমরা করতে তার প্রতিদানে তোমরা এর উত্তরাধিকারী হয়েছে। জান্নাতীরা জাহান্নামীদের ডেকে বলবে, আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালক যে ওয়াদা করেছিলেন তা আমরা সত্য পেয়েছি। তোমরাও কি তোমাদের প্রতিপালক যা ওয়াদা করেছেন তা সত্য পেয়েছো। তারা বলবে, হাঁ। তখন একজন ঘোষক তাদের মাঝে ঘোষণা করবেন, জালিমদের উপর আল্লাহর লানত।

উপরের আয়াতগুলোতে এবং পরবর্তী আয়াতগুলোতে জান্নাতী ও জাহান্নামীদের কিছু অবস্থা ও সংলাপ তুলে ধরা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে ঘটবে। সুতরাং ظاهر الحال এর দাবী ও مقتضى ছিলো সম্পূর্ণ চিত্রটি صيغ المستقبل দ্বারা উপস্থাপন করা। কিন্তু ঘটনাটির সুনিশ্চয়তা বুঝানোর জন্য صيغ الماضي ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টি এতই সুনিশ্চিত যে, ধরে নাও যেন তা ঘটেই গেছে।

اَتَی أمرُ اللّٰهِ فَلا تَسْتَعْجِلو সম্পর্কেও একই কথা।

উপরের ব্যাখ্যার আলোকে নীচের আয়াতটি পর্যালোচনা করো।

يَوْمَ يُنفَخُ في الصُّورِ فَفَزِعَ مَن في السموٰاتِ و من الارض

আশাবাদ প্রকাশের জন্যও مستقبل -এর পরিবর্তে ماضي ব্যবহার করা হয়। যেমন–

إن شَفاكَ اللّٰه تذهَبُ معي غدًا

যেহেতু আরোগ্য লাভ ভবিষ্যতের ব্যাপার সেহেতু ظاهر الحال বিবেচনায় إن يشفك الله বলাই স্বাভাবিক ছিলো। কিন্তু متكلم তার مخاطب -এর আরোগ্য লাভের ব্যাপারে আশাবাদ প্রকাশের জন্য ماضي ব্যবহার করে إن شفاك الله বলেছেন। অর্থাৎ আমি খুবই আশাবাদী যে, আল্লাহ তোমাকে অতি দ্রুত আরোগ্য দান করবেন। ধরে নাও যে, আরোগ্য লাভ হয়েই গিয়েছে।

এবার নীচের আয়াতটি দেখো–

وَ اللّٰهُ الذي أَرْسَـلَ الرِّياحَ فَتثير سَحابًا فَسُقْناه إلى بَلَدٍ مَيِّتٍ

তিনি সেই আল্লাহ যিনি বাতাস প্রেরণ করেছেন। আর তা মেঘমালা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অতঃপর আমি তা (এক বিশুষ্ক) ও মৃত যমীনে উপনীত করলাম।

অতীতে যে দৃশ্য মানুষ বারবার দেখেছে সেটাকেই আল্লাহ আপন কুদরতের প্রকাশ হিসাবে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন এবং প্রথম বার স্বাভাবিক নিয়মে أرسل ব্যবহার করেছেন। কিন্তু দ্বিতীয় বার أثارت এর পরিবর্তে বর্তমানকালবাচক ক্রিয়া تثير ব্যবহার করেছেন। ফলে বাতাসের মেঘমালার ভেসে বেড়ানোর সেই অপূর্ব ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্য শ্রোতার চিন্তায় বিদ্যমান ও বর্তমান রূপে ফুটে উঠেছে, যেন শ্রোতা বর্তমানে ঘটমান রূপেই তা দেখতে পাচ্ছে। আর বিদ্যমান ও ঘটমান দৃশ্য থেকে আল্লাহর কুদরত হৃদয়ংগম করা অতি সহজ। দ্বিতীয় উদাহরণটি দেখো–

وَ لَوْ يُطِيْعُكم في كَثيرٍ مِنَ الأَمْرِ لَعَنِتُّمْ

لو অতীতকালীন শর্ত প্রকাশ করে। সুতরাং يطيع -এর পরিবর্তে أطاع বলাটাই ছিলো مقتضى ظاهر الحال – এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য কি?

তুমি জানো যে, صيغة المضارع ইসতিমরার বা অব্যাহততা বোঝায় সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, اسمترار বা অব্যাহততার অর্থ প্রকাশ করার জন্যই এটা করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হলো لَوِ اسْتَمَرَّ الرسولُ عَلَى إطاعَتِكم অর্থাৎ রাসূল যদি অবাহতভাবে তোমাদের আনুগত্য করে চলতেন।

কিন্তু لو أطاعكم বলা হলে অব্যাহততার অর্থ প্রকাশ পেতো না।

মোটকথা, বিগত দৃশ্যকে ঘটমান ও বর্তমান রূপে তুলে ধরার জন্য কিংবা বিগত কালে ঘটনার অব্যাহততা বোঝানোর জন্য ماضي -এর পরিবর্তে مضارع -এর ফেয়েল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৮. مقتضى ظاهر الحال লংঘন করার আরেকটি ক্ষেত্র হলো إنشاء -এর পরিবর্তে خبر কিংবা خبر -এর পরিবর্তে إنشاء ব্যবহার করা। প্রথমে আমরা وضع الخبر موضع الإنشاء প্রসংগে আলোচনা করছি। এটা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। বালাগাতশাস্ত্র বিশারদগণ প্রামাণ্য আরবী সাহিত্যভাণ্ডার মন্থন করে

সেগুলো একত্র করেছেন। আমরা এখানে তার কয়েকটি তুলে ধরছি।

প্রথমতঃ আশাবাদ প্রকাশ করা, যেমন দু'আর ক্ষেত্রে صيغة الأمر ব্যবহার করাই হলো مقتضى ظاهر الحال – অথচ তুমি اللهم اهده لصالح الأعمال না বলে বলছো, هَداه الله لصالحِ الأعمالِ – এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এই আশাবাদ প্রকাশ করা যে, আল্লাহ পাক অবশ্যই তাকে হেদায়াত দান করবেন। যেন হেদায়াত দান করেই ফেলেছেন। বলাবাহুল্য صيغة الأمر দ্বারা প্রার্থনা ও কামনাই শুধু প্রকাশ পেতো আশাবাদ প্রকাশ পেতো না।

গেফার গোত্রের জন্য মাগফেরাতের দু'আ করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اللهم اغفر لغفار না বলে غِفَارٌ غَفَرَ اللّٰهُ لَهَا বলেছিলেন ঠিক এ উদ্দেশ্যেই। অর্থাৎ প্রার্থনার সাথে আশাবাদ যোগ করার উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয়তঃ কাঙ্ক্ষিত বিষয়টির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা। যেমন, অনেক দিনের অদেখা অন্তরংগ বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে তুমি এভাবে চিঠি লিখলে–

جَمَعَ اللّٰهُ شَمْلَنَا وَ وَصَل مَا انْقَطَعَ مِنْ حِبَالِنا وَ جَعَلَنا كَمَا كُنَّا قَبْلَ أَيَّامِ الفِرَاقِ المَرِيْرَةِ .

তৃতীয়তঃ مخاطب -এর প্রতি আদব রক্ষার্থে সারাসরি صيغة الأمر ব্যবহার না করে صيغة المضارع দ্বারা প্রার্থনা নিবেদন করা। যেমন–

اُنْظُرْ أَيُّها الأَمِيرُ في طَلَبِي وَ تَكَرَّم بالاستجابَةِ

এর পরিবর্তে এরূপ বলা হয়ে থাকে

يَتَكَرَّمُ الأميرُ بِأَنْ ينظُرَ في طَلَبي وَ يَتكَرَّم بالاستجابَةِ

চতুর্থতঃ مخاطب কে উদ্দিষ্ট কর্মে সুকোমলভাবে উদ্বুদ্ধ করা। যেমন, বন্ধুকে তুমি جئ غدا না বলে تجيء غدا বললে। অর্থাৎ তুমি আসবার আদেশ না করে সে যে আগামীকাল আসবে সে খবরটাই যেন তাকে দিচ্ছো। তোমার উদ্দেশ্য হলো এভাবে তাকে উদ্বুদ্ধ করা যে, তোমার প্রতি আমার আস্থা রয়েছে যে, ভবিষ্যত সম্পর্কে আমার কোন সংবাদ প্রদান মিথ্যা প্রমাণিত হোক এটা তুমি কিছুতেই চাইবে না। সুতরাং আগামীকাল তোমার আগমনসম্পর্কিত আমার এ সংবাদকে সত্য প্রমাণিত করার জন্য হলেও তুমি আসবে, এ আস্থা আমার রয়েছে।

এবার আমরা خبر -এর স্থলে إنشاء ব্যবহারের উদ্দেশ্য আলোচনা করবো। নীচের উদাহরণটি দেখো–

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَ اَقِيمُوا وُجُوهَكم عِنْدَ كلِّ مسجِدٍ وَ ادْعُوه مُخْلِصِين له الدينَ كما بَدَأَ كُمْ تَعودون *

আপনি বলুন, আমার প্রতিপালক সুবিচারের আদেশ করেছেন। আর তোমরা প্রত্যেক সিজদার সময় তোমাদের মুখমণ্ডল সোজা রাখো এবং খাঁটি আনুগত্যের সাথে তাকে ডাকো। যেভাবে তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন সেভাবে (পুনর্বার সৃজিত হয়ে) তোমরা (তাঁর সমীপে) প্রত্যাবর্তন করবে।

এখানে আল্লাহ্ দু'টি বিষয়ের আদেশ করেন। তন্মধ্যে প্রথমটি أمر ربي بالقسط এই الجملة الخبرية দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। সে হিসাবে ظاهر الحال -এর مقتضى ও দাবী তো হলো দ্বিতীয় আদিষ্ট বিষয়টিকেও أسلوب الخبر অনুসরণ করে القسط -এর উপর عطف করে উপস্থাপন করা। তখন ইবারত এরূপ হতো।

أَمَرَ رَبِّي بالقسطِ وَ إقامَةِ وُجوهِكم عندَ كلِّ مسجِدٍ

কিন্তু এখানে বর্ণনা ধারায় পরিবর্তন এনে أسلوب الخبر -এর স্থলে أسلوب الإنشاء ব্যবহার করা হয়েছে।

বালাগাতের ইমামগণ বলেছেন, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বিতীয় আদিষ্ট বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা। কেননা প্রথমোক্ত আদেশটিতে আদেশের খবর প্রদান করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বিষয়টি সরাসরি সম্বোধনপূর্বক আদেশ করা হয়েছে। তাছাড়া এই ধারা পরিবর্তনের কারণে শ্রোতার মনোযোগ অধিকমাত্রায় আকৃষ্ট হবে এবং তার অন্তরে বিষয়টির প্রতি অধিকতর গুরুত্ববোধ সৃষ্টি হবে।

অনেক সময় এমন হয়ে থাকে যে, শ্রোতার সামনে দু'টি বিষয় তুমি তুলে ধরতে চাচ্ছো, কিন্তু উভয়ের মর্যাদাগত ও গুরুত্বগত তারতম্য ও ব্যবধানের কারণে দু'টোকে সমান্তরালে ও অভিন্ন ধারায় উপস্থাপন করা তোমার পছন্দ নয়। বরং বর্ণনা ধারায় পরিবর্তন এনে তুমি সূক্ষ্মভাবে উভয়ের মর্যাদাগত ব্যবধানের প্রতি ইংগিত করতে চাও। এ ক্ষেত্রে তুমি أسلوب الخبر -এর স্থলে أسلوب

الإنشاء ব্যবহার করতে পারো। (কোরআনের ভাষায়) আপন কাওমের উদ্দেশ্যে হযরত হুদ (আঃ)-এর বক্তব্য দেখো–

قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللّٰهَ وَ اشْهَدُوا أَنِّي بَرِيْءٌ مِمَّا تُشْرِكُون

তিনি বললেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাকো যে, তোমরা যে শিরক করছো তা থেকে আমি দায়মুক্ত।

তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো যে, এখানে স্বাভাবিক নিয়মের দাবী ছিলো أسلوب الخبر -এর ধারা অক্ষুণ্ন রেখে إني أشهد الله و أشهدكم বলা। কিন্তু হযরত হুদ (আঃ)-এর ঈমানী গায়রত ও সুরুচিবোধ এটা বরদাশত করেনি যে, আল্লাহর সাক্ষ্য ও মুশরিকদের সাক্ষ্য প্রসংগকে সদৃশ ভাষায় প্রকাশ করা হবে। তাই ظاهر الحال -এর দাবী এড়িয়ে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি أسلوب الإنشاء ব্যবহার করেছেন।

৯. এবার নীচের উদাহরণটি দেখো–

أَيا ظَبْيَةَ الوَعْسَاءِ بَيْنَ جَلاجِلَ + وَبَيْنَ النَّقَي أَ أَنْتِ أَمْ أُمُّ سالِمِ

জালাজিল ও নাকীর মধ্যবর্তী ওয়াসা প্রান্তরের হে চঞ্চলা হরিণী, সত্যি কি তুমি হরিণী, না আমার প্রেয়সী উম্মে সালিম!

আচ্ছা বলো দেখি, কবি কি সত্যি সত্যি সন্দেহে পড়ে গেছেন, সত্যি কি তিনি বুঝতে পারছেন না যে, তার সম্মুখ দিয়ে দ্রুত গতিতে পালিয়ে যাওয়া ডাগর ডাগর চোখের প্রাণীটি নিরিহ এক হরিণীমাত্র; তার ভালোবাসার পাত্রী সেই মানবী উম্মে সালিম নয়, যার মিলন ও দর্শন লাভের জন্য তিনি এমন ব্যাকুল হয়েছেন। নাকি আসল বিষয় জেনেও না জানার ভান করছেন এবং নিশ্চিতি সত্ত্বেও সংশয় প্রকাশ করছেন?!

বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে বলে تجاهل العارف – বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এটা করা হয়। যেমন এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে কবি– প্রেয়সীর সৌন্দর্য প্রশংসা। কবি যেন বোঝাতে চান, আমার প্রেয়সী উম্মে সালিম দেখতে যেন বনের চঞ্চলা এক হরিণী। এমনকি অনেক সময় তাকে এবং বনের চঞ্চলা হরিণীকে আলাদা করে চেনা মুশকিল হয়ে যায়।

আবার দেখো, নীচের কবিতা পংক্তিতে কবি যোহায়র তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিছন পরিবারের কাপুরুষতার নিন্দা করেছেন تجاهل العارف -এর أسلوب প্রয়োগের মাধ্যমে।

وَ مَا أَدْرِيْ وَسَوْفَ أَخَالُ أَدْرِي + أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ

বুঝি না হিছন পরিবারের দাড়িওয়ালারা পুরুষ না মেয়ে মানুষ। তবে আশা আছে, সহসাই তা বুঝতে পারবো।

এটা না বোঝার কিছু নেই। কবি শুধু না বোঝার ভান করেছেন। এভাবে তিনি বোঝাতে চান যে, হিছন পরিবারের লোকেরা এমনই ভীরু ও কাপুরুষ যে, তাদেরকে অবলা নারী বলে ভ্রম হয়।

নীচের কবিতাটি দেখো–

أَيَا شَجَرَ الخابورِ مَالَكَ مُوْرِقًا + كَأَنَّكَ لم تَجْزَعْ عَلَى ابْنِ طَرِيفِ

খাবুর নদী তীরের হে বৃক্ষরাজি, কেন তোমরা এমন সবুজ সজীব! ইবনে তারীফের মৃত্যুতে যেন তোমাদের কোন শোকতাপ নেই।

কবি লায়লা বিনতে তারীফ জানেন, মানুষের মৃত্যুতে শোকার্ত হওয়া বৃক্ষের কাজ নয়। সুতরাং তার সবুজ সজীবতায় দোষের কিছু নেই। কিন্তু কবি অজ্ঞতার ভান করেছেন। উদ্দেশ্য হচ্ছে ভাইয়ের মৃত্যুতে গোটা সৃষ্টি জগত তার শোকে শোকার্ত না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করা।

১০. مقتضى ظاهر الحال -এর বিপরীত কালাম ব্যবহারের আরেকটি ক্ষেত্র হলো تغليب । এর আভিধানিক অর্থ হলো প্রাধান্য দান করা। বালাগাতের পরিভাষায় تغليب অর্থ শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের একটিকে অন্যটির উপর অগ্রাধিকার দান করা এবং একটির জন্য ব্যবহৃত শব্দকে অন্যটির জন্যও ব্যবহার করা। যেমন, পিতা ও মাতা উভয়ের জন্য الوالدان ব্যবহার করা। এখানে مذكر কে প্রাধান্য দান করে مذكر -এর জন্য নির্ধারিত الوالد কে مذكر ও مؤنث উভয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ বাহ্যিক অবস্থার দাবী ছিলো الوالد ও الوالدة বলা।

দেখো, মরয়াম (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, وكانت من القانتين – এখানেও একই কারণে القانتات -এর পরিবর্তে القانتين বলা হয়েছে।

আবার সূর্য ও চন্দ্রকে القمران বলা হয়। এখানে যেহেতু قمر শব্দটির উচ্চারণ অধিকতর সহজ সেহেতু এটাকে প্রাধান্য দান করে চন্দ্র ও সূর্য উভয়ের জন্য قمر শব্দটি ব্যবহার করে القمران বলা হয়েছে। একই কারণে আবু বকর ও ওমর

(রাঃ) العمران বলা হয়।

নীচের আয়াতটিও تغليب -এর একটি উদাহরণ।

قـالَ المَلأُ الذِينَ اسْتَكْبَروا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ وَ الذينَ آمَنوا
مَعكَ مِنْ قَرْيَتِنا أَوْ لَتَعودُنَّ في مِلَّتِنا

তার সম্প্রদায়ের যারা অহংকার করেছিলো তারা বললো, হে শোআয়ব, আমরা তোমাকে এবং তোমার সাথে যারা ঈমান গ্রহণ করেছে, তাদেরকে আমাদের বস্তি থেকে অবশ্যই বহিষ্কার করবো অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে প্রত্যাবর্তন করবে।

দেখো, হযরত শোয়াব (আঃ)-এর দাওয়াতে তাঁর সম্প্রদায়ের যারা ঈমান এনেছিলেন তারা তো ইতিপূর্বে আপন সম্প্রদায়ের ধর্মভুক্ত ছিলেন এবং ঐ ধর্ম ত্যাগ করে ঈমান গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু হযরত শোআয়ব (আঃ) কখনই তাদের ধর্মভুক্ত ছিলেন না। সুতরাং হযরত শোআয়ব (আঃ)-এর সাথে ঈমান আনয়নকারীদের ব্যাপারে তো পূর্ব ধর্মে ফিরে আসার দাবী করা যেতে পারে কিন্তু হযরত শোআয়ব (আঃ)-এর ক্ষেত্রে এটা কল্পনা করা যায় না। কেননা তিনি কখনো ঐ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, যাতে ফিরে আসার প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু মুশরিকরা এখানে শোআয়ব (আঃ)-কেও لتعودن -এর অন্তর্ভুক্ত করেছে। এর কারণ হলো مخاطب -কে অন্যদের উপর প্রাধান্য দান করা। যেহেতু مخاطب হচ্ছেন তিনি সেহেতু তাঁকে প্রাধান্য দিয়ে ليعودن -এর পরিবর্তে مخاطب -এর ফেয়েল لتعودن ব্যবহার করা হয়েছে।

আবার দেখো, হযরত মূসা (আঃ)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ বলছেন–

اِذْهَبْ أنتَ و أخوك بِأيٰتِيْ وَ لا تَنِيَا فِيْ ذِكْرِي اذهَبَا إلى فِرْعَوْنَ إنَّه طَغٰى
فَقُولا له قَوْلاً لَيِّناً لعلَّه يَتَذَكَّر أو يَخْشَى

তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনাবলীসহ গমন কর। আর আমাকে স্মরণ করার বিষয়ে শৈথিল্য করো না। তোমরা উভয়ে ফেরাআউনের নিকট গমন করো। হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে কিংবা ভয় গ্রহণ করবে।

এখানে শুধু মূসা (আঃ) হচ্ছেন مخاطب – সুতরাং একবচনের صيغ الخطاب অর্থাৎ اذهب، لا تن، قل ইত্যাদি ব্যবহার করা এবং অতঃপর وليذهب معك أخوك

و ليقل ইত্যাদি صيغ الغائب ব্যবহার কিন্তু এখানে مخاطب কে غائب এর উপর প্রাধান্য দিয়ে উভয়ের জন্য صيغ الخطاب ব্যবহার করা হয়েছে।

এবার নীচের আয়াতটি দেখো–

فَسَجَدَ الْمَلٰئِكَةُ كُلُّهم أَجْمَعون إِلاَّ إِبليسَ، أَبَى وَ اسْتَكْبَرَ و كَانَ مِنَ الْكٰفِرِينَ

ফিরেশতাগণ সকলে সিজদা করল, কিন্তু ইবলিস ব্যতিক্রম হলো। সে (সিজদা করতে) অস্বীকার করল।

এখানে আদম (আঃ)-কে সেজদা করার আদেশ ফিরশতা ও জ্বিন সকলের উপরই ছিলো। ইবলিসকে ব্যতিক্রম ঘোষণা করা থেকে তা প্রমাণিত হয়। কেননা ফিরেশতাদের সাথে যে সকল জ্বিন ছিলো তাদের প্রতি যদি সিজদার আদেশ না হতো তাহলে ইবলিস সিজদার আদেশ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হত না এবং সিজদা করেনি বলে তাকে استثناء করা হতো না।

মোটকথা, ফিরেশতাদের প্রতি যেমন, তেমনি তাদের সাথে বিদ্যমান জ্বিনদের প্রতিও সিজদার আদেশ ছিলো। ফিরেশতাদের সকলে এবং জ্বিনদের মাঝে ইবলিস ছাড়া অন্যরা সিজদা করেছিলো। ইবলিছ ছিলো ব্যতিক্রম। তাই তাকে استثناء করা হয়েছে। সুতরাং স্বাভাবিক নিয়মে فسجد الملئكة و الجن الذين كانوا معهم বলার কথা ছিলো। কিন্তু জ্বিনদের সংখ্যা যেহেতু কম ছিলো সেহেতু অধিক সংখ্যককে প্রাধান্য দিয়ে তাদের জন্যও الملئكة শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

الحمد لله رب العالمين এখানেও العالمين শব্দটিতে تغليب হয়েছে। কেননা عاقل ও غير عاقل সব কিছুকেই এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথচ সকলের জন্য جمع العاقل ব্যবহার করা হয়েছে।

خلاصة الكلام

يَجِبُ إيرادُ الكلامِ على مقتَضَى ظاهِرِ الحَالِ و قد يُعْدَلُ عنه لِأَسْبابٍ بَلاغِيَّة فَعلَى المشتَغِلِ بالبَلاغَةِ أن يَبْحَثَ عن سَبَبِ العُدولِ مُسْتَعِينًا بالقَرائِنِ، منها :

(١) تنزيل العالِمِ بفائِدَةِ الخَبَرِ أو لازِمِها منزلَةَ الجاهِلِ بهما، لِأَنَّه لم يَعْمَلْ بِمُوْجِبِ عِلْمِه، فيُلْقَى إليه الخَبَرُ كما يُلقَى إلى الجاهِلِ .

(٢) تنزيلُ غيرِ المنْكِرِ منزلَةَ المنكِرِ لِظُهورِ عَلامَاتِ الانكارِ فيه، فَيُؤَكَّدُ له الخَبَرُ كما يُؤَكَّد لِلْمُنْكِرِ.

(٣) تنزيلُ المنكِرِ أَوِ الشَّاكِّ منزِلَةَ مَنْ خَلا ذِهْنُه مِنْ أفكارٍ أو شَكٍّ، و ذلك إذا كانَ معه شَاهِدٌ لو تَأَمَّلَه لَزالَ إنكارُه أَوْ شَكُّه .

(٤) الإلتفات، و هو تحويلُ الأُسْلوبِ الكَلامِيِّ مِنَ التكلُّمِ أَوِ الخِطَابِ أَوِ الغَيْبَةِ إلى غَيْرِه و يكون في سِتِّ صُوَرٍ :

(١) من التكلُّم إلى الخِطَابِ

(٢) من التكلم إلى الغَيْبَةِ

(٣) من الخطَابِ إلي التكلُّمِ

(٤) من الخطاب إلى الغيبة

(٥) من الغيبة إلي التكلم

(٩) من الغيبة إلى الخطاب

(٥) أسلوبُ الحكيمِ و هو صَرْفُ كلامِ المتكلِّمِ أو سُؤالِ السائِلِ عَنِ المُرادِ و حَمْلِه على غَيْرِ ما يُريد به

(٦) الإظهارُ في مَقامِ الإضمارِ و الإضمارُ في مَقامِ الإظهارِ .

و أَسبابُ الإظهارِ مقامَ الإضمارِ هي :

(أ) الإشعارُ بِكَمالِ العِنايَةِ بمدلولِ اسْمِ الإشارَةِ .

(بـ) التَّهكُّمُ بالسامِعِ

(جـ) الإشارة إلي كَمالِ فِطْنَتِه، كَأَنَّ غيرَ المحسوسِ عِنْدَه محسوسٌ

(د) إدخالُ الرَّوْعَةِ وَ المَهابَةِ في نَفْسِ السامِعِ .

وَ أسبابُ الإضمَارِ مقامَ الإظهارِ هي :

(أ) إِدّعاءُ أَنَّ مرجِعَ الضميرِ دائمُ الحضورِ في الذهنِ .

(بـ) تَمكينُ ما بعدَ الضميرِ في نَفْسِ السامِعِ .

و ذٰلك في ضميرِ الشَّأْنِ و القصَّةِ، و ضميرُ بابِ نعمَ و بِئْسَ، فَإِنَّ الضميرَ المُبْهَمَ يُشَوِّقُ نَفْسَ السامِعِ إلى المضمونِ الذي يأتي بعدَ الضميرِ فَيَتَمَكَّنُ مِنْ ذِهْنِه .

(٧) وضع الماضي مَوْضِعَ المضارعِ لِلتَّنْبيهِ عَلَى تَحَقُّقِ الحُصولِ أو لِلتَّفاؤلِ.

و أما وَضْعُ المضارِعِ مَوْضِعَ الماضِيْ .

فَلِاسْتِحْضارِ الصُّورَةِ الغريبَةِ في الحَياةِ أَوْ لِإفادَةِ الاستمرارِ في الماضي.

(٨) وضع الخبر موضِعَ الإنشاءِ أَوْ عَكْسَه .

أَمَّا الأَوَّلُ فَلِلتَّفاؤلِ بِتَحقُّق المَطْلوبِ، كالدُّعاءِ بصيغَةِ الخَبَرِ تَفاؤُلاً بالاستجابة .

أَوْ للاحترازِ عن صورَةِ الأَمْرِ تَأَدُّباً .

أوْ لإظهارِ الرَّغبَةِ في حصولِ المطلوب أوْ لِحَمْلِ المخاطَبِ على الفعل بِأسلوبٍ لطيفٍ .

أمَّا الثاني : فلإظهار العناية بالشيء أو لِلتَّفريقِ في أسلوبِ الكَلامِ بينَ أمْرَيْنِ و إظهار الفَرْقِ بينَهما ، وَ للإشارَةِ إلى أنَّه لا يَحْسُنُ الحديثُ عنهما بأسْلوبٍ وَاحدٍ .

(٩) تجاهُلُ العارِفِ : و هو أن يتكلَّمُ العارِفُ بِالأمْرِ مُتَظاهِرًا بِالشَّكِّ أوِ الجَهْلِ . للمبالَغةِ في المدحِ أو للذمِّ أو العَجَبِ أو التوبيخ .

(١٠) التغليب : و هو ترجيحُ أحَدِ الشَّيئَيْنِ عَلَى الآخَرِ وَ إطلاقُ لفظِ الأوَّلِ على الثاني .

و يكون التغليب في أمورٍ كثيرةٍ، منها :

تغليبُ المذكَّرِ عَلَى المؤنَّثِ و تغليبُ الكثيرِ عَلَى القليلِ و تغليبُ المخاطَبِ على الغائبِ و تغليبُ العُقَلاءِ على غيرِهم .

تمت بالخير